ছায়ার আলো

উপন্যাস

প্রথম খণ্ড

শ্রীদিলীপকুমার রায়

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স
২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

প্রকাশক—শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য্য
২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।

সাড়ে তিন টাকা

মুদ্রাকর—শ্রীরামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য
প্রভু প্রেস
৩০, কর্ণওআলিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

উৎসর্গ

৺কুমারী উমা বসুকে

ব্যথারে আড়ালে রাখি' আনন্দ যে বিলাত উচ্ছলি',
সুন্দরের মন্ত্র যার প্রাণে নিত্য তুলিত ঝংকার,
বসন্তের মন্দাকিনী ছিল যার হাসির উৎসার,
সুখ যে বাসে নি ভালো সুধা ভালোবেসেছিল বলি'—
টুটিল বীণার তন্ত্রী কেন তার সুর না বাঁধিতে?
অকালে পড়িল কেন অবিকচ আলোক-কলিকা?
নক্ষত্র-সঙ্গীত যার চিত্তাকাশে জ্বালিত দীপিকা
অবেলায় নিভিল সে কোন্ নব প্রদীপ্তি সাধিতে!

জানি না। কেবল জানি—ক্ষণদ্যুতি ব্যর্থ কভু নয়:
অন্ধকারে অবসান কোথা তার যে শুভ্র, চিন্ময়?

(উন্মেষ…২২.১.১৯২১ (অবসান…২২.১.১৯৪২)

He misses not the count of a single hour,
Nor passes by one fleeting aspiration :
Each moment, lost in quenching flames of passion
He resurrects as Light's unfading Flower.

But why must our timepiece conceal His time ?
And tears of pain seep fruitless in Lif's sands ?
What heart invites the mind misunderstands ?
Is Beauty a mere paradox and mime ?

The alien-intimate welkin rings with the Answer :
(Like stars self-luminous, like song's breast aheave !
Were it less musical would we believe ?)
"The onlooker's rhythm is not that of the Dancer."

পারে না চিহ্নিতে কাল কেন মহাকালের প্রগতি ?
জীবনের বালুচরে অশ্রু ঝরে নিষ্ফল মরণে ?
অন্তরের দিশারিরে মন কেন ভ্রান্তি-নিশা গণে ?
রূপশ্রী কি চিরন্তনী মায়ালীলা—ছায়ার আরতি ?

সুদূর অম্বর গায়…এত কাছে তারে মনে হয় :
(নক্ষত্র-সঙ্গীতে নীড় বাঁধিতে চাহে না কেন প্রাণ ?
বেসুরা যেথায় নাই সে কি শুধু ঝংকার বিতান ?)
"আঁখির বরণছন্দ নটেশচরণছন্দ নয়।"

সংসারবীজং মন এব বিদ্ধি
ন তদ্‌গৃহস্থাশ্রমবর্জনেন।

মমতার বীজ কত না ছলে
রচে সংসার মনের বনে!
হয় কি সে অবলুপ্ত পলে
শুধু গৃহসুখ-বিসর্জনে?

MATTHEW ARNOLD:

Yet still, from time to time, vague and forlorn,
From the soul's subterranean depth upborne
As from an infinitely distant land,
Come airs, and floating echoes, and convey
A melancholy into all our day.

Only ··· but this is rare ···
When a beloved hand is laid in ours,
When jaded with the rush and glare.
Of the interminable hours,

Our eyes can in another's eyes and clear,
When our world-deafened ear
Is by the tones of a loved voice caressed —
A bolt is shot back somewhere in our breast.

ব্যথায়

প্রকাশক .
২০৩/১/
কলিকা

ফের এসেছে অসিত ওদের কাছে বছর তিনেক বাদে। এর মধ্যে অনেক কিছু ঘ'টে গেছে ওর জীবনে। শরীরও অসুস্থ। তাই গুলমার্গ থেকে যখন প্রমীলা তার করল "অসিদা আসা চাই-ই", ও না করতে পারল না। সম্প্রতি নানা কারণে ওকে একটু বেশি পরিশ্রমও করতে হয়েছিল, অসুস্থ শরীরে। একসঙ্গে অনেকগুলো কাজের ভার নিয়েছিল খানিকটা স্বভাব-দোষেই বৈকি: রোখের মাথায়। চোখ ফুটল—যখন শোকের কাঁধে ভর করল রোগ। অবশ্য স্বাস্থ্য ওর অপলকা নয়—মাঝে মাঝে একটু আধটু জ্বর—এতে কি আর ওকে কাবু করতে পারে? তবু দুর্বল বোধ করত বুকের মধ্যে একটা বেদনায়—সেই বাস থেকে প'ড়ে যাওয়া থেকে যার সূত্রপাত। গুরুদেব অনুমতি দিলেন—ঘুরে এসো না একটু, ক্ষতি কী?

কিন্তু গুলমার্গে যেতে আবার ডাক্তারের মানা। ভালোই। একেই ও শীতকাতুরে মানুষ। তার উপর থেকে থেকে বুকে এই বেদনা।

কাজেই রফা হ'ল। ও এল তুমেল থেকে কয়েক হাজার ফুট উপরে উঠে—প্রমীলা-নির্মল এল নেমে গুলমার্গ থেকে কয়েক হাজার ফুট নিচে। মিলন হ'ল কাশ্মীরের বিখ্যাত তান্‌মার্গ গ্রামে—গুলমার্গের ঠিক পাদমূলে। অসিতেরি অনুরোধে নির্মল দুটো রোমাণ্টিক তাঁবু ফেলল পাশাপাশি। একটি ছোট—অসিতের জন্যে। অন্যটি একটু বড় ওদের তিন জনের জন্যে —নির্মল প্রমীলা আর মিনি। কিন্তু মুস্কিল, ওদের চাকর পয়ান কিছুতে রোমাণ্টিক তাঁবতে থাকতে রাজি নয়। দারুণ ভূতের ভয় তার—তাঁবতে

দোর কোথায়? কাজেই ওকে রাখা হ'ল কাছের ডাকবাংলোর বহির্বাটিতে।

* * *

অসিত বলেছিল, প্রমীলাকে ফের গান শিখতে ওর কাছে। সম্প্রতি ও কত নতুন গানই যে বেঁধেছিল—পাখি খোঁজে নীড়, ও খোঁজে কলকণ্ঠীর আশ্রয়। অবশ্য শেখাতে গেলেই মনে পড়ে তাকে যার তুলনা কলকণ্ঠীদের মধ্যেও মেলা ভার, কিন্তু সে-বেদনার মধ্যেও কেমন যেন একটা শান্তি না হোক সান্ত্বনা আছে। সুর যখন হারিয়ে যায় তখনও রেশ থাকে না?—সেই ধরণের সান্ত্বনা······মাধুর্য।······কেবল সান্ত্বনার মধ্যেও হৃদয় হ'য়ে ওঠে অশান্ত যখন ওর মনে পড়ে সেই পরিবারের কথা যারা ওকে প্রমীলাদের মতনই আদরে যত্নে ঘিরে রেখেছিল। কিন্তু কী হ'য়ে গেল তাদের হঠাৎ? আহা! সাজানো বাগান শুকিয়ে-যাওয়া যাকে বলে। ও প্রায়ই একলাটি ব'সে ভাবে তাদের কথা। কখনো পালিয়ে গিয়ে আশ্রয় নেয় তান্মার্গের কোনো বিজন বিপিনে—কখনো বা কোনো চেনার পপলার কুঞ্জে, কখনো কোনো কলনন্দিতা ঝর্ণার সামনে, কখনো বা কোনো কুসুমমালিনী গুহার সামনে। প্রমীলা খোঁজাখুঁজি সুরু ক'রে দেয়—বিশেষ ক'রে সেই বাস থেকে প'ড়ে গিয়ে ওর বুকে যে ব্যথার মতন হয়েছিল তার জন্যে। তাই অসিত থেকে থেকে ঘরছাড়া হ'লে ওর উদ্বিগ্নের সীমা থাকে না। ওকে পই পই ক'রে মানা করে পাহাড়ে ঠাণ্ডা না লাগাতে। কিন্তু নির্মম প্রমীলাকে বলে হেসে: "অতীব সূক্ষ্মং পরমাত্মতত্ত্বং ন স্থূলদৃষ্ট্যা প্রতিপত্তুমর্হতি*—এ শুধু বিবেক-চূড়ামণির বিধান নয় স্বভাবচূড়ামণির বেলায়ও একথা সমান খাটে মিলি।"

* * *

* পরমাত্মার তত্ত্ব অতি সূক্ষ্ম—স্থূল দৃষ্টি দিয়ে তাকে দেখা যায় না।

এম্‌নিই একটি নিকুঞ্জে সেদিন ও ব'সে—একা। বিকেলে হঠাৎ খুব এক পশলা বৃষ্টি হ'য়ে চারিদিক ঝকঝকে হ'য়ে উঠেছিল। অসিত বহু চেষ্টা ক'রেও পারল না ঘরে টিকতে—একটা মোটা শাল আর কম্বল নিয়ে ফের পড়ল বেরিয়ে—অলক্ষ্যে। একটু এগিয়েই চলল আজ, নৈলে সহজেই ধরা পড়বার সম্ভাবনা।

সবুজ পত্রকুঞ্জে যখন পৌঁছল তখন অপরাহ্ণ সায়াহ্নের সীমান্তে পৌঁছেছে ·· কিন্তু কাশ্মীরে নাকি গোধূলির আলো ডুবলেও আভা নিভতে চায় না, তাই চারদিকে সেই নরম সোনার রঙ বিদায় নিয়েও আকাশে বাতাসে হাজিরি দিচ্ছে। সাম্‌নেই গুলমার্গের পাহাড়ের এক টুকরা তুষারের পাড়ে আগুন লেগেছে। তার নিচেকার গাছপালা ঈষৎ কুয়াশার ঘেরাটোপে ঝাপসা দেখাচ্ছে। তবু সেই ছায়াপ্রদোষেও দেখা যাচ্ছে অদূরে গিরিবালার রূপালি পেড়ে নীলাম্বরী। স্বপ্ন দেখছেন দেবী।

স্বপ্ন দেখবারই জায়গা বটে। মাথার উপরে রকমারি রঙের টোপর প'রে মেঘশিশুরা লুকোচুরি খেলছে এখানে ওখানে সেখানে—রকমারি চূড়াদের সঙ্গে। যেই তারা স'রে যাচ্ছে সেই পশ্চিম থেকে কে ঐ ছুড়ল সোনালি আলো মেঘের পিচকিরি দিয়ে? কুয়াশা বুঝি "যায় ভেসে যায়"··· গেল, গেল—না, টাল সাম্‌নে নিস্ত আলোর শেষ রেশটুকুও ঐ মূর্ছা গেল মেঘের বাঁধে মাথা খুঁড়ে। গিরিজায়া এখানে সত্যিই বহুরূপী—বিশেষ ক'রে এই গুলমার্গ অঞ্চলে।

মুগ্ধনেত্রে চেয়ে চেয়ে দেখে অসিত।

হঠাৎ ফের মর্মর জেগে ওঠে দম্‌কা হাওয়ায়। মাথার উপরে পাতার অস্থির চাঁদোয়া আরো অস্থির হ'য়ে ওঠে। শীত শীত করে। তবু উঠতেও মন চায় না যে। কম্বলটা আরো মুড়ি দিয়ে ও চেয়ে থাকে

ঠায়। কত কী মনে প'ড়ে যায় ধ্বনির উদ্দীপনে। সাম্‌নেই সেই নির্ঝরিণীটি যার কাছে ব'সে ও কয়েক বছর আগে বেঁধেছিল ওর প্রিয় গানটি :

নির্ঝরধারা !
শিহরধারা !
কার পূজারিণী আপনহারা
গান গাও কুলু কুলু ধ্বনি' ?
মিলনমণি
অঙ্গে অঙ্গে চমকে তোমার,
আলোপারাবার
ডাকে যে তোমায়, ডাকে যে তারা !
তাই কি উধাও—নির্ঝরধারা ?

মনে পড়ে এই কাশ্মীরেই ও ছায়াকে শিখিয়েছিল এই নৃত্যগীতটি। সে-গান আর শুনবে না কোনোদিন ? ভাবতেও বুকের মধ্যে খালি খালি লাগে। এমন কণ্ঠ আর জাগবে না গানের আলোয়—কোনো দিনো না ? আর কখনো শুনবে কি অমন গান কোনো বালিকার কণ্ঠে ? 'বালিকার কণ্ঠে'ই বা কেন ? বড়দের মধ্যেই বা কোন্ মেয়ে ছিল ওর জুড়ি ? শুধু কণ্ঠেই নয়—গীতি-প্রতিভায় ? আজও বেজে ওঠে ওর কণ্ঠের অনুরণন অসিতের বুকের তারে :

লো চঞ্চলা !
কলোচ্ছলা !
আনন্দ করে সুর-উপলা
নূপুরিকা, হেন দিনরজনী
সাধো সজনী ?

নৃত্যে কার বা উঠিসে তুমি
রূপে কুসুমি'
অলখ বঁধুর বাঁশি-বিভলা!
তাই ধাও বুঝি নীলাঞ্চলা?

ভোলা কি যায় সে-কণ্ঠ? সে সৃষ্টির ইন্দ্রজাল! সুরের প্রতি দোলাকে যে জাগিয়ে তুলত তার প্রাণের নিজস্ব শিহরণে!—যেন টের পেত—কোন্ ভঙ্গিটি কোন্ দোলার আপন, কোন্‌টি পর। এমন সহজবোধ, সহজ সৃষ্টিশক্তি সে আর কোন্ মেয়ের মধ্যে দেখেছে এ চল্লিশ বছর বয়সে? ছায়াকে গান শেখাতে শেখাতে যেন অসিত নিজের সঙ্গীতের এক অজানা মহিমাকে করত আবিষ্কার—বলত দেবদা সগর্বে হেসে। কন্যাগর্ব! তবে মানাত এ গর্ব তাকে—এমন কন্যা যার, যে প্রতি গানে জাগিয়ে তুলতে পারত তার অন্তরের স্বকীয় বাণীটিকে—স্বরিয়ে তুলতে পারত প্রতি সুরের নিভৃত ইঙ্গিতটিকে। এ-ঝর্ণার গান গাইতে গাইতে যে ওর বুকে জেগে উঠত এক ঘুমন্ত ঝর্ণা—এ তো একটুও অত্যুক্তি নয়। গুন্‌গুনিয়ে ওঠে ওর মনে সেই আশ্চর্য কণ্ঠের আশ্চর্য ভঙ্গিটি—বিশেষ যখন ও তানের পর তান লাগাত এই নির্ঝরিণীর গানে। বাংলা গানে তান মানায় না? কে বলে? ছায়ার মুখে এ তান যে শোনেনি সে কী ক'রে জানবে বাংলা গানে তান কত সহজ স্বচ্ছন্দ হ'তে পারে? আর শুধুই কি তান? মিড়, গমক, আশ, কথার সঙ্গে সুরের শুভদৃষ্টি ঘটানো, বাঁশির সঙ্গে নূপুরের বোল মেলানো, এ সবই ওর কাছে ছিল অব্যাহত—যাকে বলে "বয়ানা" চাল" ওস্তাদি পরিভাষায়। অসিতের মনে পড়ে ও যখন গাইত:

নিঝর ধারা!···শিহর ধারা!
শান্তিময়ী!···কান্তিময়ী!
ছন্দে যে তুমি দিগ্বিজয়ী

লক্ষ্যহারা তো নহ গমনে,
চল-চরণে
পুলকে তোমার সাধিলে যারে
বাঁধিলে তারে—
অশ্রুমালারো বরণে অয়ি
দুরভিসারিণী স্বপ্নময়ী!

আহা! কী মধুরই না হ'য়ে উঠত এই "বাঁধিলে তারে"র খোঁচটুকু—কী গাঢ়, নিটোল শোনাত তার পরেই অ—শ্রু-র মিড়ে। অশ্রুময়ী যেন ওর ব্যঞ্জনায় উঠতেন দুলে সশরীরী হ'য়ে। চেষ্টা করে অসিত এখানটায় ঠিক ওর মতন মাধুর্য আনতে, কিন্তু পারে না তো! এক একটা গান আছে বুঝি এক একজনের গলার ছাঁচে তৈরী। "নির্ঝরিণী"র গান, "আধফোটা ছোট তারা"র গান ছিল যেন ওর কাছে এমনি—লাখেরাজ সম্পত্তি, ভোগ করার জন্যে ওকে এক পয়সাও টেক্স দিতে হ'ত না। কিম্বা যখন ও তানের পরে তান লাগিয়ে গাইত:

ওই তারার মালার কুঞ্জে
আমি আধফোটা ছোট তারা—

ঠিক মনে হ'ত না কি যেন একটি ছোট্ট তারা উঁকি দিচ্ছে আর বলছে নানা তালের গতিচ্ছন্দে—

কভু মেঘেতে নিজেরে ঢাকি
তার আলোছায়া মুখে মাখি······

সত্যি আলোছায়া-ভরাই ছিল সে-মুখখানি। না, বর্ণনা হ'ল না যথাযথ। মুখে ওর যা ফুটে উঠত তার নাম "ছায়ার আলো"। তাই ক্ষণে ক্ষণে উজ্জ্বল হ'য়ে উঠত এমন ক'রে। ওকে কি এতটুকু জোরে কিছু বলবার উপায় ছিল? ধমক দেওয়া তো দূরের কথা, একটু নীরস সুরে কথা বলতে পেরেছে কি কখনো? অমনি মেঘমেদুর ছায়ার অপলকা আলোখানি

যাবে ওর মুখে নিভে! ঠাট্টা ক'রেও ওকে বলার উপায় ছিল না "যা—ও!" মাঝে মাঝে ওর আত্মীয়দের কেউ কেউ মজা দেখত—অসিতকে দিয়ে বলাত ওকে "যা—ও"—যেন এম্‌নি আচম্‌কা ব'লে ফেলেছে। আর যাবে কোথা—শরতের কিরণময় মুখখানিতে বাদল ছেয়ে এসেছে। শিশু শিশু—না বলবে কে? কারুর কি ওকে মনে হ'ত সতেরো আঠারো বছরের মেয়ে? অথচ দেহে গড়নে তো শিশু নয়: তন্বী বটে, কিন্তু তাই ব'লে দেখতে তো বালিকা নয় মোটেই। সেইখানেই না ওর মাধুর্য! কবি বলেছেন "It is a happiness to wonder!"—ওকে দেখে যে-সুখ তার মধ্যে একটি প্রধান উপাদান ছিল এই বিস্ময়। শুধু কি দেহের সঙ্গে মনের গরমিলের বিস্ময়! ওর যেন সব কিছুই ছিল অদ্ভুত। মুখে বলবে ও নিজেকে নাস্তিক……এই চারদিকে অবিচার অত্যাচার হানাহানি বিশেষ ক'রে মিথ্যাচারে ওর কিছুতে বিশ্বাস হ'ত না কোনো সত্যসুন্দর এ-হেন জগতের হাল ধ'রে রয়েছেন শেষরক্ষা করতে। কিন্তু যখন গাইবে:

মন! কালীনামে দাও রে বেড়া
ফসলে তছরূপ হবে না
সে যে মুক্তকেশীর শক্ত বেড়া—
তার কাছে তো যম ঘেঁসে না—

তখন কার মনে হবে—এ-মেয়ে আশৈশব কালীমন্দিরের প্রসাদে মানুষ নয়? আজো মনে পড়ে ওর মুখে এই রামপ্রসাদীটি শুনে এক সভায় সেই মহামহোপাধ্যায় সাধক পণ্ডিতের উচ্ছ্বসিত আশীর্বাদ: "বেঁচে থাকো মা, বেঁচে থাকো—এ কতদিনের বৃদ্ধ গানকে তুমি যেন শিশুর মতন নবীন ক'রে তুললে তোমার শিশুকণ্ঠের পুতুল খেলায়!"

কথাটা তো তাঁর অশ্রদ্ধ উচ্ছ্বাস ছিল না। সত্যিই যে প্রতি গান ওর শিশুকণ্ঠের মাতৃস্নেহে আদুরে হ'য়ে উঠত—ঠিক সেই আদরে, যার

দোলায় মাটির পুতুলও হ'য়ে ওঠে জীবন্ত। মনে হয়—ছোঁয়ায় ভারটিও সয় কি না সয়! বিশেষ ক'রে ওর পেলব কণ্ঠ। কোথায় পাবে ও তার উপমা? মনে পড়ে—ওকে অসিত মাঝে মাঝে বলত হেসে: "জানো ছায়া, তোমার কণ্ঠের এই নরম লাজুকতায় আমার মনে জাগে একটি ছবি—সেকালের।"

"কী ছবি অসিদা?" বলত ছায়া চম্‌কে ওর ডাগর চোখ দু'টি মেলে। থেকে থেকে এম্‌নি চম্‌কে ওঠা ছিল ওর আনমনা স্বভাবের একটি ধারা।

"কবি বাণভট্টের আঁকা একটি বর্ণনা—গন্ধর্ববালাদের ফুলের-ঘায়ে-মূর্ছা-যাওয়া সম্বন্ধে। তাঁরা ছিলেন এম্‌নিই সুকুমারী যে, তাঁদের পেলব কানে ফুলের কানবালার 'পরে যদি কখনো বা একটি চঞ্চল মধুকর ব'সে ভুলে একটু ডানা নেড়েছে—অম্‌নি সখীর কাছে মেয়ের ঠোঁট ফুলিয়ে নালিশ:

'কর্ণপূরকমলতরল-মধুকরপক্ষপবনোঽপ্যায়াসকরঃ'

"কী যে সব অদ্ভুত ছবি তোমার মনে আসে"—বলত ও রাগ ক'রে: "খালি ঠাট্টা—যা-ও!"

"ঠাট্টা?"

"নয় তো কী? কেবল ক্ষ্যাপাবে তুমি। আশ্রমে ব'সে যোগ শিখতে কি না সত্যিই সন্দেহ হয় এখন। এত ক্ষ্যাপানোর তীরন্দাজি শিখে সময় থাকত কি?"

ব'লেই হেসে উঠত। রাগের তাপ সঞ্চিত হ'তে না হ'তে ধারা নামত স্নিগ্ধ হাসির ····কোমল চাহনির। রাগের ভানও ও বেশিক্ষণ বজায় রাখতে পারত না যে! সত্যে-নিষ্ঠা ও সহজতা যার সহজাত কবচ-কুণ্ডল সে কি খেলার ছলেও পারে অভিনয় করতে?

হঠাৎ চম্‌কে উঠল পিছনে পায়ের শব্দে। সেই চিরপরিচিত পদধ্বনি, টর্চ ও তার পরেই তীক্ষ্ণকোমল কণ্ঠের সানুযোগ ভৎ'সনা:

"মা গো মা! ফের পালানো? যদি বৃষ্টি নামত—অন্তত ছাতাটাও তো মানুষ নেয়!"

প্রমীলার হাত ধ'রে দশ বছরের মিনি ওপাশে, এপাশে নির্মল। মিনি চেঁচিয়ে ওঠে: "তুমি মামা কী যে!—কালা নাকি? আমরা চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে ডেকে ডেকে সারা!"

"ডাকছিলি না কি? কেন রে?"

"কেন?" বলে মিনি ঠোঁট ফুলিয়ে, "শোনো কথা মা! এ-মানুষকে কী বোঝাবে তুমি?—তুমি কী যে মামা! তবে হয়ত আশ্রমে বনবাসে থেকে থেকে ভুলেই ব'সে আছ যে একটা জলজ্যান্ত মানুষ হঠাৎ হারিয়ে গেলে পাঁচজনে খোঁজ করে।"

"কোত্থেকে এত কথা শিখলি বুড়ি?" ব'লে অসিত ওকে খপ্‌ ক'রে ধ'রেই কোলে টেনে নেয়।

"আঃ! ছাড়ো—ছাড়ো বলছি—" কথা বলতে পারে না হাসির চোটে—"দেখেছ মা, কেবল কাতুকুতু দেবে মামা!"

কিন্তু সেদিন ঘরে—কিনা রোমান্টিক তাঁবুতে ফিরে আসার পরেই অসিতের অঙ্গে যে-তাপ-শিহরণ এল সেটা হ'য়ে দাঁড়াল রোমান্সের চূড়ান্ত।

প্রমীলা হোমিওপ্যাথিক বাক্স নিয়ে মুখ ঘনঘটা ক'রে বসে। জিজ্ঞাসা করে সিম্‌টম্—কবে জ্বর হয়েছিল এর আগে, জ্বরের সঙ্গে কোথায় কোথায় বেদনাবোধ হয়, মাথা ঘোরে কি না ইত্যাদি ইত্যাদি ইত্যাদি। অসিত জবাব দেয় হুঁ হাঁ ক'রে আর মৃদু হাসে। শেষটায় প্রমীলা রেগে উঠে

প্রস্নবাদ রেখে একটা পুরিয়া তৈরি করতে করতে নির্মলের দিকে চেয়ে বলে : "দেখ, অসিতদাকে আর তাঁবুতে রাখা চলবে না—রোমান্সের একটা লিমিট্ আছে। আজই ওকে নিয়ে যাওয়া চাই ডাকবাংলোর কোনো একটা ঘরে। তাঁবুর সাধে আর কাজ নেই, বাড়িই ভালো—পুরোনো চাল ভাতে বাড়ে!"

মিনি হঠাৎ বলে : "বাড়িতেই যদি মামাকে রাখতে হয় তবে ডাক বাংলো কেন মা? রোজ-কটেজ কি রিট্রীটের মতন একটা বাংলোই তো ভালো।"

নির্মল : ভালো তো বাঘের দুধও, কেবল পাওয়া যায় না এই যা।

মিনি (বিজ্ঞভাবে) : বাঘের দুধ পাওয়া না যেতে পারে, কিন্তু রিট্রীট তো এখন খালি—ওরা নিশ্চয় ভাড়া দিবে।

নির্মল (চমকে) : খালি? এই সেদিনই যে সেখানে লোক দেখলাম।

মিনি : কিন্তু কাল যে তাঁরা চ'লে গেলেন পোঁটলা পুঁটলি বেঁধে।

প্রমীলা হোমিওপ্যাথি ভুলে মেয়ের দিকে চেয়ে বলে : "কে বলল?"

মিনি : স্বচক্ষে দেখলাম, তবু বলবে—কে বলল!

ওরা হেসে উঠল একজোটে। হাসি থামলে অসিত বলে : "না, না, রিট্রীট টিট্রীটে কাজ নেই—তাঁবুতে দিব্যি আছি।"

প্রমীলা গ্রাহ্যও না ক'রে নির্মলের দিকে চেয়ে হুকুম দেয় : "কালই তা'হলে খোঁজ নিও রিট্রীটের।"

অসিত : কী যে সব ব্যস্ত হ'য়ে উঠিস তোরা একটুতে—

মিনি (বিজ্ঞভাবে) : না না। সাবধানের মার নেই।

নির্মল : মেয়ে আমাদের ধন্বন্তরীর পিসশাশুড়ি!

প্রমীলা : কিন্তু এখুনি মোটরটা আনো—রুগিকে ডাকবাংলোয় নিয়ে ওয়া দরকার—তাঁবুতে আর এক ঘণ্টাও না। রোমান্স আমার মাথায় থাক।

মোটর আনতে নির্মল প্রস্থান করতেই প্রমীলা একটা শিশি থেকে কয়েকটা সাদা বড়ির পুরিয়া ক'রে অসিতের মুখের কাছে ধ'রে বলে: "নাও, এখন হাঁ করবে কি একটু দয়া ক'রে—তর্কাতর্কি রেখে?"

অসিতের বুকের মধ্যে কেমন ক'রে ওঠে। কলকাতায় ছায়া একবার ওর মুখে কি একটা ওষুধ ঢেলে দিয়েছিল ঠিক কি এমনি হুকুমের সুরেই!

প্রমীলা (সুর চড়িয়ে): ও কী? বললাম না হাঁ করতে? অমনি মন উধাও দেশান্তরে! কী অন্যমনস্ক, বাবা রে বাবা!

অসিত অসহায় ভঙ্গিতে হাঁ করে। ব্যথার সঙ্গে আনন্দও ওঠে জেগে। সেই একই সুর! পর যে-সুরে মুহূর্তে আপন হয়ে ওঠে সেই চিরপরিচিত অধিকারের সুর! এ-ও এক মেয়েরাই পারে—শুশ্রূষার দাবিতে। পুরুষ বড় জোর পারে সেবা করতে: শুশ্রূষার দাবিদাওয়া—ও মেয়েদেরই জন্মস্বত্ব।

* * *

আধঘণ্টার মধ্যেই অসিতকে ডাকবাংলায় স্থানান্তরিত করা হ'ল।

নির্মল তাঁবুতেই রইল মিনিকে নিয়ে। প্রমীলা অসিতের পাশের ঘরেই শুল—যদি রাতে দরকার হয়, কে বলতে পারে? অসিতের না না করা এখন আর কেউ কানেই তোলে না—ও যেন আট বছরের অবুঝ ছেলে যা-তা বায়না না ধ'রে পারে না।

অসিত শেষটায় রেগে হাল ছেড়ে দিয়ে "যা ভালো বুঝিস কর্ তোরা" ব'লে পাশ ফিরে শুল।

প্রমীলা খানিকক্ষণ ওর মাথা টিপে দেয়। এত সকাল সকাল অসিত কবে শুয়েছে কাশ্মীরে! নটাও বাজে নি। কিন্তু নিষ্ফল!—ওকে ঘুমতেই হবে। ও চুপ ক'রে শুয়ে থাকে কৃতজ্ঞচিত্তে। থেকে থেকে শিয়রে

সেবানিরতা স্নেহময়ীর হাতের কয়েকটি চুড়ির টুং টাং বেজে ওঠে। কী সুন্দর শব্দ! ছায়ার হাতেও বাজত প্রায়ই ঠিক এমনি ঠুন্ ঠুন্ ক'রে!—কেন এমন ক'রে মনে হয় তারই কথা ঘুরে ফিরে—সব দৃশ্য, সব ধ্বনি, সব গন্ধ, সব স্পর্শের মাঝেই!

সব মেয়েদের মধ্যে একই মা বোন লুকিয়ে থাকে ব'লে কি? হবে।

ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়েছে অসিত। শেষরাত্রে দেখছে স্বপ্ন:

কাশ্মীরে ছায়াদের সেই সুন্দর বজরাটিতে ও যেন ছায়ার বাঁ পাশে ব'সে তাকে শেখাচ্ছে "কার বাঁশিখানি বাজে বিজনে····· "আর ডান পাশে ব'সে ওর মা প্রতিমা বুনছে একটি গলাবন্ধ অসিতেরই জন্যে। প্রতিমা নাম যে রেখেছিল সে নিশ্চয় ছিল দৈবজ্ঞ। এমন মুখের সৌষ্ঠব—সুন্দরীদের মধ্যেও যার তুলনা মেলা ভার। ক'জন সুন্দরীর চলনে বলনে কথায় হাসিতে এমন সহজ শ্রী ঝ'রে পড়ে যার ফলে তাদের সৌন্দর্যও উছ্‌ থেকে যায় শান্তির প্রকাশে, সুষমার বিন্যাসে? ছায়া মার মতন সুন্দরী হয়নি কিন্তু এই শান্তভাবের ব্যঞ্জনাটুকু পেয়েছিল হুবহু। রঙে প্রতিমা ছিল উজ্জ্বল শ্যামবর্ণা আর ছায়া ছিল নিছক "তন্বী শ্যামা শিখরদশনা" যাকে বলে, তবে ওর সুডৌল মুখের কমনীয়তাটুকুও প্রথম দিকে তেমন নজরে পড়ত না—(যদিও অনেকের কাছে ওর মুখ প্রথম থেকেই অপূর্ব মনে হ'ত এমনো দেখা গেছে)—কিন্তু কী-একটা ছিল ওর মুখে যা ওর মা-র অমন নিখুঁৎ মুখেও মিলত না: কী-একটা আভা যার না আছে নাম, না উপাধি: অথচ এমন ছায়াভরা! এমন অন্তরঙ্গ! সেই চিরপরিচিত আভাটি যেন হঠাৎ জ্যোতি হ'য়ে উঠল। অসিতের মনে ঝিলিক খেলে গেল—ছায়ার সঙ্গে প্রতিমার মুখের প্রভেদ ছিল এইখানেই—এই প্রচ্ছন্ন জ্যোতির বরদানে। সুরে সঙ্গে—ওর মনে হ'ল—যেন ছায়া এসেছে

প্রতিমার কোলে অতিথি হ'য়ে, জ্বলছে সন্ধ্যার বুকে শুকতারাটি। এ-মণি পার্থিব নয়—যার ধন সে গচ্ছিত রেখেছে—এসে নিয়ে যাবে সময় হ'লেই।

বুকের মধ্যে ওর কেমন ক'রে ওঠে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে। ছায়াকে ওর মা র কোলছাড়া করবে? কে? পারবে করতে? আহা! প্রতিমার যে ছায়া-অন্ত প্রাণ!

হঠাৎ বদ্‌লে যায় স্বপ্নের ধারাটা। দেখছে—শিলঙে ওরা একবার বিকেলের দিকে বেড়াতে বেরিয়েছে ছায়া আর ও। অসিত যেন ওকে বলছে যে, গুরুদেবের কাছে সে শুনেছে যে, যারা এ জীবনটাকে সর্বান্তঃকরণে গ্রহণ করতে পারে না—তাদের বাঁচানো অনেক সময় শক্ত হয়। শুনেই ছায়া বলল: "জানো অসিদা, আমার মনে হয় তোমার গুরুদেব আমার কথাই বলেছেন।"

"পাগল বলে আর কাকে?"

"পাগল নয় অসিদা। আচ্ছা—দেখো। তুমি তো থাকবে বেঁচে।"

ঘুম ভেঙে গেল। বুকের মধ্যে ব্যথাটা ফের দেখা দিয়েছে। সেই অনির্দেশ্য চাপা ব্যথা যার কোনো কারণ ডাক্তারেও পায়নি। কিন্তু ব্যথা ছাপিয়ে বড় হ'য়ে ওঠে ছায়ার ভবিষ্যদ্বাণী—"আচ্ছা - দেখো।" সঙ্গে সঙ্গে আজ ওর মনে হয় আর একটা কথা—ছায়া যেন আরো কী একটা কথা বলতে চেয়েছিল কিন্তু বলি-বলি ক'রেও বলেনি! ···· কিম্বা এ শুধু ওর মনের ভুল?

কিন্তু এটা তো ভুল নয় যে ছায়া কিছু একটা অনুভব করেছিল। অথচ কেন? কী কারণে? কারণ যে-সময়ে ও প্রথম বলে—"আচ্ছা দেখো"—সে-সময়ে ও ছিল তো সবারই আদরিণী। তবু কী ক'রে টের পেল যে ও বেশি দিনের জন্যে আসেনি পৃথিবীর কোল জুড়ে থাকতে?

পা টিপে টিপে ঘুমন্ত পরানের পাশ দিয়ে বাইরে বেরিয়ে যায় অসিত বেশ খানিকটা দূরে। সেখানে গিয়ে বসে একটা কম্বল বিছিয়ে।

কাছে একটা বাঁচ গাছের থোপা থোপা পাতা আবছা আলোয় এমন অপূর্ব দেখায়! মনে হয় যেন এ জগতের নয়! আলো-কালোর সন্ধিলগ্নে চেনা দৃশ্যের মধ্যেও অবতীর্ণ হয় যেন এক নতুন চিহ্ন। অসিত এসে বসে গাছটির কাছেই। ভোর পাঁচটা।

আকাশের টুক্‌রো মেঘে এখানে ওখানে সেখানে জ'লে উঠছে নবারুণ শিখা। থেকে থেকে বয় শীতের বাতাস। অসিত শালটা বেশ ক'রে মুড়ি দিয়ে বসে। যদিও জ্বর এখন নেই তবু মনে হয় মিনির বিজ্ঞ কথাটা কাল রাতের: "সাবধানের মার নেই।" শিশুদের মুখে এসব আবৃত্তি কী যে স্নিগ্ধ লাগে! স্নিগ্ধ… …তাই তো……কেন না এসবের মধ্যে কোথায় যেন একটা করুণা আছে আধফোটা ভাষার মধ্যে, আধ-জ্বলা দীপের মধ্যে আধজাগা চাহনির মধ্যে। পূর্ণ বিকাশের আলো যখন একটু ঢাকা থাকে অবিকাশের মেঘে…বড় সুন্দর, না? সামনে লাইলাক ফুলের বেগুনে রঙের ঈষদ্দ্যুতি দেখেও ফের এমনিই মনে হয়: যেন জীবন সর্বত্রই চলেছে ঘোমটা খুলতে……অবিকাশ থেকে বিকাশে উত্তীর্ণ হ'তে। কে জানে এই মিনি বড় হ'লে কি রকম দাঁড়াবে! কয়টা জীবন পায় সেই পরিণতি যাকে বলা যেতে পারে তার স্বভাবের পরিণতি? ছায়া শুনেছিল ডাক এই পরিণতির। শুধু কানে নয়—প্রাণে: সঙ্গীতের দিকে, স্নেহের দিকে, নিটোল পবিত্রতার দিকে। হ'ল না এখানে সে-পরিণতি। কিন্তু তাই বা বলা যায় কেমন ক'রে? কত লোকের মনে ওর স্বরূপটি কি একটা শিখা জ্বালিয়ে রেখে যায় নি? যে আগুন জ্বলে সে কি আর নেভে? সব নিভে-যাওয়া আগুনের বুকেই কি সে সুপ্ত হ'য়ে বিরাজ করে না?

তবু সুষমার শিখা যখন নিভে যায় তখন দীপ কি শোক না ক'রে পারে? বিশেষ ক'রে সেই সব দীপ যারা ছিল সে-শিখার সাথী? উৎসব আনন্দ করে মানুষ কী নিয়ে?—সঙ্গী। বিশ্বের দরবারে প্রকাশের উৎসব তার সঙ্গী না চেয়ে থাকতে পারে কি? দীপালি জ্বলে না একটি দীপের

আলোয়। সঙ্গে চাই সাথী আলো···উৎসবের, বন্দনায় এমন কি বেদনারও একটা আশ্রয় চাই···অন্তত ততদিন—যতদিন না সর্বাশ্রয় সব অভাব ঘুচিয়ে দিয়েছেন তৃতীয় নয়নের দিব্যদৃষ্টি দিয়ে। কিন্তু যতদিন না আসে সেই পরম প্রাপ্তি ততদিন কী ক'রে মানুষ পথ চলে?—সহযাত্রীকে নিয়ে তবেই। পথের পাথেয় কিছু না কিছু দেয়ই তারা—নইলে চিরটা কাল এ জগতে দরদীর নামে বিধুরের চোখে বইত না ধারা। সেই দরদী যখন ছেড়ে যায় অবেলায় ·····ওর মনে গান ওঠে গুন্‌গুনিয়ে—ছায়াকে-শেখানো ওর একটি অতি প্রিয় গান অমর কবির :

আজি আমার কাছে বর্তমান ভেঙে ও ভেসে যায়!
আজি আমার কাছে অতীত হয় নূতন পুনরায়!

হঠাৎ পকেটে হাত ঠেকল সেই মোটা খামের চিঠিটায়—অজয়ের লেখা—যেটি কাল সন্ধ্যায় ও পেয়েছিল। অজয় ওর এক তরুণ বন্ধু—পরম স্নেহাস্পদ। অসামান্য গুণী—গাইয়ে বাজিয়ে একাধারে। কী মধুর চরিত্র যে! সে ছিল ছায়ার কাছে—শেষ সময়ে। তাই অসিত ওকে লিখেছিল নানা কথা জিজ্ঞাসা ক'রে। আবার পড়তে সুরু করল পড়া-চিঠি উষালোকে।

কিন্তু চিঠির প্রথম কয়েক ছত্র পড়তে না পড়তে ওর থিতিয়ে-যাওয়া বুকের রক্তে ফের তুফান উঠল জেগে। অজয় লিখেছিল :

"কী ধৈর্য অসিদা! যখন, শেষাশেষি, ও বুঝেছিল রোগ শিবেরও অসাধ্য, তখনো তোমাকে ডাকল না—কিছুতে ডাকতে দিল না আমাদেরও। তোমাকে ও দুঃখ দিতে চাইত না, জানোই তো। তাই তোমাকে ও শেষ-পত্রে লিখেছিল প্রফুল্লসুরে যে ভালোই আছে। ভালো কোথায়? ও টের পেয়েছিল—জানত সবই। কিন্তু পাছে তুমি ব্যস্ত

হও সেই ভয়ে, এমন কি, আমাদের কাছেও মুখ ফুটে বলেনি কখনো পে
তোমাকে কাছে পেতে ওর কী রকম ইচ্ছা করে। কেবল এক এক সময়ে, হয়ত বা অতর্কিতে, ব'লে ফেলত—"যদি এসময়ে অসিদার মুখে সেই 'দিও দিও ঠাঁই শীতল চরণে দিন মোর যবে ফুরাবে'—কীর্তনটা শুনতে পেতাম!" কিম্বা 'থেকো প্রিয় পাশে সাঁঝছায়া আসে নেমে'। কিন্তু ব'লেই তক্ষনি মানা করত পই পই ক'রে—তোমাকে যেন ডেকে এনে ফের দুঃখ দেওয়া না হয়। দেহের অত যন্ত্রণার মধ্যেও জোর ক'রে মুখে হাসি টেনে এনে বলত: 'ডেকো না এখন অসিদাকে, আমার অসুখ বাড়লে ও যে মুখ অন্ধকার করে তার দুঃখ আমার—না না—থাক্।' ভাবা যায় কি অসিদা! ঐ এক রত্তি মেয়ে?"

"একরত্তি মেয়ে!" অসিত পড়া রেখে চুপ ক'রে ভাবতে থাকে। সত্যি, সকলের কাছেই ওকে মনে হ'ত একরত্তি। এ আর এক আশ্চর্য! কারণ হিন্দুসমাজে "একরত্তি মেয়ে" বলতে যা বোঝায় ও তো তা ছিল না—না বয়সে, না গড়নে। বাংলা দেশে উনিশ কুড়ি বছরে মেয়েরা তো ডাকসাইটে গিন্নি—একটা গোটা সংসার গড়গড়িয়ে চালায় স্বামী পুত্র কন্যা নিয়ে। দ্বিভুজা হয় দশভুজা—বিয়ের জল গায়ে পড়তে না পড়তে। ধরো, যদি ওর বিয়ে দেওয়া হ'ত পনের কি ষোল বছর বয়সে—তা হ'লে? আজ কি ওকে চেনা যেত মার্কামারা গিন্নি ছাড়া আর কোনো অভিজ্ঞানে? অথচ তবু সবারই ওকে দেখলে মনে হ'ত একরত্তি মেয়ে। কেন? ভাবে ও। কত সময়েই ভেবেছে আগেও, আজও ভাবে—কেন। ভাবতে ভাবতে হঠাৎ ফের পড়ে অজয়ের চিঠিটা:

"ছায়ার সম্বন্ধে তোমাকে একটা কথা বলব অসিদা? ও ছিল 'সরল' মেয়ে—কিন্তু 'সরলা' বলতে যা বোঝায় তা নয়, মনে রেখো। কারণ এটা ভুলো না যে, ও ছিল বিষম চাপা মেয়ে। কিছু মনে কোরো না ভাই, নৈলে একথাটা তুমি প্রায়ই ভুলতে কি না, তাই বলতে হ'ল।

এজন্যে ও কত দুঃখ পেয়েছে তার কিছু খবর আমি রাখি ব'লেই একথা বলতে সাহসী হচ্ছি—এতটা খোলাখুলি লেখায় যদি অন্যায় হয় তো ক্ষমা কোরো।……"

ক্ষের মন উড়ে যায় অতীতের স্মৃতিচারণে। মনে হয় কত কথা। সত্যিই তো কত সময়েই ও ছায়াকে ভুল বুঝেছে কষ্ট দিয়েছে ওকে শিশু ভেবে, 'একরত্তি মেয়ে' ভেবে। ওর মধ্যে এই যে গোপনিকতার—reserveএর—একটা ভাব ছিল তার মর্যাদা দিতে তো ওর বারবারই ভুল হ'য়েছে। এ-ভুলও হয় বেশি সেই জাতের স্নেহের যার মধ্যে মমতার উপাদান বেশি। আমরা অনেক সময়েই মমতার মায়ায় যাকে ভাবি 'আমার' তাকে কল্পনা করি এমন ভাবে যাতে ক'রে স্নেহের মন ভরে। এই জন্যেই বুঝি মমতার দৃষ্টি স্নিগ্ধ হ'লেও সত্যকে চিনতে পারে না! তাই কি অসিত ওর গান শুনেও ওকে বুঝতে চিনতে বেগ পেত—কিম্বা, অজয়ের ভাষায়—ভুল বুঝত?

কিন্তু ভুল না বুঝে করে কি? সত্যিই যে ও শিশুই ছিল। বোধশক্তির গভীরতার কথা কি মনে হ'তে পারে কোনো শিশুর সরলতার চাক্ষুষ পরিচয়ে? মনে পড়ে কয়েক বছর আগে এই তানমার্গেই একদিন সকালবেলার কথা। ভোরে উঠেই ছায়া ওকে ডাক দেয়: "দেখ দেখ অসিদা, কী আশ্চর্য!" কোনো কিছু 'আশ্চর্য' হ'লেই ও ডাক দিত সব আগে অসিদাকে ওর বিস্ময়ের সরিক হ'তে। ও তখন লিখছিল একটা চিঠি। "রাখো চিঠি অসিদা—রাখো ওসব—দেখ একবার চোখ চেয়ে" ব'লেই ওর হাত ধ'রে টানতে টানতে নিয়ে আসে বাইরে। সত্যিই দেখে ও স্তম্ভিত হয়েছিল। এদিকে সকালবেলায় সোনার আলো পড়েছে সামনের গুলমার্গের তুষারের পাড়ে। ওদিকে পূর্ণিমার চাঁদ হাসছে তখনো আকাশে আরো শুভ্র হ'য়ে। ও তৎক্ষণাৎ একটা গান বাঁধে ও সুর দিয়ে শেখায় ছায়াকে ধ্রুপদ ধামারে:

উদার গম্ভীর তুষার-মঞ্জীর-শঙ্খে মুক্তিমৃদঙ্গে
দিকে দিগন্তরে ধ্বনিয়া অন্তরে জাগো হে নৃত্যবিভঙ্গে।······

এসো চিরোজ্জ্বল কান্তি!
বিছায়ে তুঙ্গ প্রশান্তি,
বাজাও শঙ্কর, তাল শুভঙ্কর আলোক-ডম্বরু-ভঙ্গে
শিখর-সঙ্গীতে ঝলকি' ভীরু চিতে নীলিমানন্দ অশঙ্কে॥

আজও মনে পড়ে ছায়ার তখনি তখনি গানটি তুলে-নেওয়া বিস্মিত আনন্দের সেই হাততালি দিয়ে।·· মনে পড়ে ওর সেই 'আশ্চর্য' শব্দটায় চ-র পরে সেই আশ্চর্য মিড়। আর সঙ্গে সঙ্গে সেই আনন্দের অপরূপ পূর্ণতার সঙ্গে সঙ্গে বিছিয়ে যায় কী যে শূন্যতা! অমন সুরের দোলা, 'আশ্চ-র্য' ব'লে অমন শিশুসরল উচ্ছ্বাস আর কোনো দিনও শুনবে না কানে! যত শ্লোক যত বেদ যত মন্ত্র তন্ত্র আবৃত্তি করা যাক না কেন এর চেয়ে বড় সত্য তো আর নেই যে-ফুলটি একবার ঝ'রে গেছে সেটি আর ফোটে না। মুক্তিমৃদঙ্গের কথা গানে-গাওয়া ঠিক যতখানি সহজ, প্রাণে পাওয়া কি ঠিক ততখানিই কঠিন নয়? কিসে আমাদের বাঁধে এমন ক'রে? মায়া? মোহ?—শুধু কথা, কথা, কথা! অথচ এমনি জাদু জানে এই কথা, যে মনে সহজেই ঠাঁই পায় ভ্রান্তিবিলাস, না বুঝেও আমরা মনকে বোঝাই যে, সব পরিষ্কার হ'য়ে গেছে। কিন্তু হয় কি সত্যি? ঐ তো শুভ্রোজ্জ্বল তুষার শিখর আজও তেমনিই ডাকছে হাতছানি দিয়ে—আয়রে আয় এখানে, গানে তার বাণী সহজেই তো উঠল বেজে: শিব,

তোমার দুন্দুভি তূর্য
স্বননে ব্যোমে জলে সূর্য
তোমার করুণায় গগন-গরিমায় কুসুম ছন্দিল গন্ধে,
সর্বহারা তুমি, তোমার মণি চুমি' তারকা শোভে ধূলি-অঙ্কে।

কিন্তু তবু সর্বহারা হ'তে কি কেউ চায়—চায় কেউ ব্যোমে নীড় বাঁধতে ?

দীর্ঘনিশ্বাস ঘনায় ফের বুকের মধ্যে। সৃষ্টিলোকে কেনই বা প্রাণের এ অফুরন্ত জনতা—যদি হৃদয়ের প্রতি ব্যথাই আমরণ বাস করবে দ্বীপান্তরে ? দ্বীপান্তর ! তা ছাড়া আর কী নাম দেবে এ-জীবনের ?—যে-রাজ্যে এ ওর খবর পায় কচিৎ, কালেভদ্রে—বড় জোর হাওয়ার মর্মরে, ঢেউয়ের কল্লোলে। ব্যস্, এইটুকু মাত্র ছোঁয়াছুঁয়ি, শুভদৃষ্টি : তারপরে সবাই একলা, কি সম্রাট কি ভিক্ষুক !……

অথচ—প্রশ্ন জাগেই তবু—কেন হৃদয় চায় হৃদয়ের তাপস্পর্শ—যদি সে-স্পর্শলোকে স্থায়ী কোনো আশ্রয়ের আশা হবে দুরাশা ? শুধু নিবিড় স্নেহ সখ্য প্রীতির ক্ষেত্রেই নয়—দৈনন্দিন চলাফেরায়ও কি মানুষ চায় না দরদের সাড়া ? ধরো, এই যে দুটি মানুষের ও আজ অতিথি, তাদের যদিও কোনোদিন বলে ছায়ার কথা, ওরা কি সত্যি বুঝবে ওর দুঃখ ? কল্পনা করতে পারবে কি—ওর জীবনে কতখানি ফাঁক রেখে গেছে একটি "একরত্তি মেয়ে" ? ওর একটি অতি প্রিয় গান গুন্‌গুনিয়ে ওঠে যেন ছায়ার কণ্ঠঝঙ্কারে। অমর সুরকারের কথার সুরের বেদনা যেন-টস টস ক'রে ঝ'রে পড়ত ওর কণ্ঠের মিড়ে দোলায় আশে গমকে—যখন ও গাইত :

সে-মুখ কেন অহরহ মনে পড়ে পড়ে মনে ?
নিখিল ছাড়িয়ে কেন কেন চাহি সে জনে ?
এ নিখিল স্বরমাঝে
তারি স্বর কানে বাজে।
ভাসে সেই মুখ সদা স্বপনে কি জাগরণে !

সত্যি, সারা ভুবনে একটি মাত্র মানুষ কোন্ জাদুতে মুহূর্তে হ'য়ে ওঠে এমন অদ্বিতীয়, অতুলনীয় ! যার কাছে ভালোবাসার এ-অদ্বিতীয়তার

অনুভব স্বতঃসিদ্ধ হ'য়ে ওঠেনি সে এ-পার্থিব জীবনে ভালোবাসার অপার্থিবতার রহস্য কতটুকু আন্দাজ করতে পারে? তাকে কি বোঝানো যায়—কেন সব থাকতেও মাত্র একটি মানুষের অভাবে সব মনে হ'তে পারে শূন্য? কেন সংখ্যা দিয়ে হয় না সংখ্যাতীতের ক্ষতিপূরণ? একরত্তি মেয়ে? একরত্তিই বটে!

একটা গাছের গুঁড়িতে ঠেশ দিয়ে কখন অসিত ঘুমিয়ে পড়েছে! ঘুম ভাঙল অদূরে চেঁচামেচির শব্দে। চোখ চাইতেই দেখে সূর্যদেবের রক্তাভ কান্তি একেবারে ধবধবে শাদা, আর প্রমীলা সমানে ব'কে চলেছে চাকর পরানকে: "আচ্ছা, আমায় শুধু এই কথাটা তুই বুঝিয়ে দে যে কী করতে তোরা আছিস? জানিস সাধুদাদার অসুখ তাই তাঁবু থেকে আসতে হ'ল ডাকবাংলোয়, তবু তাঁকে ভোর রাতে এই পাহাড়ে দিলি বেরিয়ে যেতে? শুধু আমি থ হ'য়ে দাঁড়িয়ে আছি তোদের সব কাণ্ডকারখানা দেখে।"

পরান মাথা চুলকোতে চুলকোতে ক্রমাগতই চেষ্টা করছিল বলতে নিজের তরফে দুটো কথা। কিন্তু প্রমীলার অনর্গল ভৎসনায় এক সেকেণ্ডও বিরতি কোথায় যে বলবে? অবশেষে (বোধ হয় প্রমীলার মেয়েলি অভিধানে ভৎর্সনার সব বিশেষ্য বিশেষণ ফুরিয়ে যাওয়ার দরুনই) একটু সুযোগ পেয়েই বলল:

"কী করব দিদিমণি? সাধুদাদার পায়ে ছেল রবারের জুতো—এতটুকু কি ক্যাঁচ করল? তাছাড়া—"

ফের মাথা চুলকে—"ভোর রাতে আমার ঘুমটা ছেলেবেলা থেকেই একটু ঘোরালো হয় কি না—"

প্রমীলা হাত নেড়ে ফক্কিকারির ইঙ্গিত ক'রে বলে: তবে আর কী আমাদের রাজা করেছ। আর একটু সর্ষের তেল আনিয়ে দিই, কেমন?

ছেলেবেলার অভ্যেস যখন ছাড়লে কি জানি যদি বাছা কুম্ভকর্ণের নাড়ী ছেড়ে যায় ?"

পরান হেসে ফেলল : "আমি কি বলছি দিদিমণি যে কুম্ভকর্ণ হওয়াটা ভালো—তবে কে ভাবতে পারে বলুন জ্বরগায়ে অসুস্থ মানুষটো ভোর রাতে টো টো করতে বেরুবে।"

প্রমীলা : মানুষটো মানুষ হ'লে কি আর বেরুত রে ? অমানুষ ব'লেই যত জ্বালা ! স্বচক্ষে কি দেখিস নি যে মানুষটো শুধু দেহেই অসুস্থ নয়— মনেও—

অসিত (হেসে) : তুই তো বাবুর চমৎকার সার্টিফিকেট বানিয়ে দিচ্ছিস মিলি, মুঠোর মধ্যে পেয়ে ?"

প্রমীলা : এই যে ঘুম ভেঙেছে মহাপ্রভুর ? প্রণাম ! কেবল বলতে আজ্ঞে হবে কি—প্রশ্নটা জ্বরের না বিকারের ?

অসিত : ও স্বচক্ষে কি শুধু আমারই কাণ্ড দেখছে না কি রে ? যদি তোকেও দেখে থাকে তা'হলে যে সার্টিফিকেট তুই আমায় দিচ্ছিস সেটা তোরও প্রাপ্য বলবে না কি ?

প্রমীলা (মুখ ঝামটা দিয়ে) : ঈ-শ। বড় সাধ্যি কি না। দেব না দূর ক'রে ?

অসিত (হো হো ক'রে হেসে) : শুনেছি বি-এ-তে তোর লজিকে অনর্স ছিল মিলি—আজ তার প্রমাণ দিলি বটে। কিন্তু শোন্। কেন অমন করছিস বল্ দেখি ? ওর দোষটা কী ? না, মেয়েলি লজিক মাত্রেই ঝিকে মেরে বৌকে শেখানোর দিকে ঝোঁকে ?

পরাণ : দেখুন দিকি সাধুদাদা, ওরকম করলে আমরা কী ক'রে পেরে উঠি ? এ কি আমাদের বাংলা দেশের শীত গো ? সাক্ষাৎ কৈলেশের বরফি শীত। ওখানে শেষরাতে মনিষ্যি ঘুমবে না তো ঘুমবে কখন শুনি ?

প্রমীলা : আচ্ছা আচ্ছা হয়েছে। যা, দাদা বাবুকে গিয়ে খবর দিগে যে গুরুবলে সাধুদাদাকে জ্যান্তই পাওয়া গেছে এযাত্রা।

পরাণ : দাদাবাবু? তাঁবুতে?"

প্রমীলা : ঐ চোখ দুটো কি মুখ-সাজানো রে? এই খানিক আগে বাবু গেলেন ঐ ঝর্ণার দিকটা খুঁজতে দেখলি নে? যা ওদিকের ঝাউ বনে—গিয়ে হাঁক দে।

পরাণ চম্পট দিল।

প্রমীলা কাছে আসতেই অসিত উঠে দাঁড়াল।

প্রমীলা ভ্রূভঙ্গ ক'রে বলল : "কিন্তু তুমি ভেবেছ কি—শুধু এই কথাটা যদি আমায় বুঝিয়ে দাও—না, আর কথাটি না, চলো এক্ষুনি। ঐ দেখ হঠাৎ মেঘ ক'রে এল। এই জোলো হাওয়ায়—মাগো মা দেখি—কপালে হাত দিয়ে—"না এখন অন্তত জ্বর নেই। সর্বরক্ষে। কিন্তু কী ছেলে তুমি যে···আমি বলি···কাল একশো দুই পয়েন্ট আট জ্বর যে মানুষের তার ওপর কাঁপুনি ..

অসিত এর পরে আর একটি কথা বলারও ফুর্সৎ পায় নি সেদিন—বাংলোয় না পৌঁছনো পর্যন্ত।

নির্মল খবর দিল রিট্রিট পাওয়া গেছে। প্রমীলা বলল আর দেরি না। ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই ওদের মালপত্র নিয়ে গৃহপ্রবেশ।

দেখতে দেখতে রিট্রিটের সামনে একটি সুন্দর ধুতরো ফুলের কুঞ্জে পড়ল সতরঞ্চ। সুরু হ'ল চা খাওয়া—মহাসমারোহে, কেন না অসিত বেশ সুস্থ বোধ করছিল।

কিন্তু খাওয়ার ঘটা দেখে অসিতের চক্ষুস্থির! "করেছিস কী রে

মিলি ? কেক, স্যাণ্ডুইচ তার ওপর সিঙাড়া সন্দেশ মার্মালেড—কী কাণ্ড বল্ তো ?

মিনি (বিজ্ঞস্বরে) : কাল রাতে যে তোমার খাওয়া হয় নি মামা, ভুলে গেলে এরি মধ্যে ? তোমাকে খাইয়ে দাইয়ে চাঙ্গা ক'রে তুলতে হবে তো !

নির্মল (অসিতকে হাসবার ফুরসৎ না দিয়ে) : ঠাট্টা না। তুই আজকাল খেতে চাস না ব'লেই জ্বর তোকে পেয়ে বসেছে এ আমারও মনে হয়। তাই খুব খা দেখি।

অসিত : তোরা কি একজোটে ক্ষেপে গেলি ? জ্বর আবার কি ? কবে কোন্ ত্রেতাযুগে একটু শীত-শীত করেছিল—

প্রমীলা (ঝংকার দিয়ে) : মুখখানি যদি না থাকত। থার্মোমিটারে একশো দুই পটেণ্ট আট ওঠে নি ?

অসিত : হাঁ। একশো দুই না কি আবার জ্বর। তাহ'লে তেলাপোকাও পাখি।

মিনি (টুকে) : একশো দুই কেন বলছ মামা ? পয়েণ্ট আটটা ভুলে গেলে ? আর দুই জুড়লেই যে একশো তিন তার খবর রাখো ?

অসিত : ও আমার শুভঙ্করীর দিদিমা ! দাঁড়া। (ব'লেই ওকে কোলে চেপে ধ'রে কাতুকুতু দেওয়া সুরু করে)।

মিনি (হাসতে হাসতে : ও মাগো ! মা—দেখ না মা—মামা—আঃ ছাড়ো—(বলতে বলতে কোনো মতে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়েই দে)।

সেদিন বিকেল বেলায় ফিকে অসিত বেশ সুস্থ বোধ করে। কিন্তু

পা টিপে টিপে বেরুতে যাবে এমনি সময়ে ধরা প'ড়ে গেল। প্রমীলা রিটা্টের রান্না ঘরে পরটা করছিল কিন্তু গেটের দিকে চোখ রেখে।

অসিত যেই বেরিয়েছে প্রমীলার "ও রে!" ধমক শুনে ফিরেই হেসে ফেলল। নির্মলও সতর্ক ছিল—বেরিয়ে এল তার বারান্দার আরাম-কেদারা ছেড়ে। তারপরে খুব হাসি তিনজনে।

অসিত (হাসি থামলে): হাতে নাতে ধরেছিস বটে মানছি—কিন্তু আমি একটু বেড়িয়েই ফিরতাম, মানে আজ অন্তত গাঢাকা দেওয়ার কোনো মৎলব ছিল না সত্যি বলছি।

প্রমীলা (ওর চোখে চোখ রেখে): কিন্তু কেন এত ঘন ঘন গা-ঢাকা দাও অসিদা? বলবে না কোনোদিনই?

অসিত (চোখ নামিয়ে নিয়ে): বড় দুঃখের কাহিনী ব'লেই কুণ্ঠা আসে দিদি। তোদের আনন্দ দিতে এখন আর পারি নে ব'লেই যে নিজের দুঃখ চাপিয়ে দুঃখ দিতে হবে তেড়ে গিয়ে—

প্রমীলা (অভিমানে): যাও অসিদা—আমি আর কক্ষনো যদি—

অসিত (ওর হাত ধ'রে): শোন্ শোন্—কী হয়েছে?

প্রমীলা "ছাড়ো—লক্ষ্মীটি", ব'লেই হাত ছাড়িয়ে নিয়ে রিটা্টের দিকে চ'লে গেল দ্রুতপদে চোখে আঁচল দিয়ে।

অসিত (নির্মলের দিকে চেয়ে): ব্যাপার কি বল্ তো?

নির্মল (একটু চুপ ক'রে থেকে): কাল রাতে ও তোর জন্যে খুব কেঁদেছে বোধ হয়—তারই জের হবে।

অসিত: কেঁদেছে! কাল রাতে? কেন?

নির্মল (গম্ভীর মুখে): তোর বুকের ঐ ব্যথাটার জন্যে। তখন কত ক'রে লিখলাম তোকে—ভালো ক'রে দেখা—তা ভালো কথা তো তুই ভুলেও কানে তুলবি নে।

"আঃ দূর্। কী একটা সামান্য চোট্—"

"চোট্‌টা সামান্য নয় একটুও। তুই তো দেখতে পাস না তোর পিঠ। এখনো কালো কালো দাগ রয়েছে কালশিরের।"

"হ্যাং, কালশিরের দাগ এতদিন থাকে না কি ?"

"থাকে না ? আমি দেখেছি, বেশি চোট লাগলে অনেক সময় দু-বছরও থাকে। কিন্তু ওর প্রধান ভয় এজন্যে নয়।"

"কী জন্যে তবে ?"

"যেতে দে।"

"বলতে মানা ক'রে দিয়েছে বুঝি ?"

"যদি দিয়েই থাকে ?"

"কিন্তু কেন ?"

নির্মল এক মুখ ধোঁয়া ছেড়ে ওর দিকে তাকিয়ে একটু হাসে : "তুই এক এক সময়ে এমন সব ছেলেমানুষি প্রশ্ন করিস অসিত !—মেয়েরা যাকে খুব স্নেহ করে তার সম্বন্ধে কোনো অমঙ্গলের কথা কি মুখে আনতে চায় কখনো ?

অসিত (হেসে) : কথাটা বলেছিস বটে লাগসৈ ক'রে। কিন্তু কৌতূহলও যে বেড়ে গেল আশঙ্কাটা কী ভাবতে।

নির্মল (ওর মুখের পানে কিছুক্ষণ একদৃষ্টে তাকিয়ে থেকে) : আমরা কি জগতের বার ভাবিস তুই ?—খবর রাখি না কিছুরই ? (একটু চুপ ক'রে থেকে) দেখ অসিত, এ-প্রসঙ্গ আমি অন্তত তুলতাম না—কেবল কাল তোর জ্বর দেখে ও খুব কেঁদেছিল ব'লেই মুখ ফসকে বেরিয়ে গেল কথাটা।

অসিত (ফের ওর চোখের দিকে তাকিয়ে) : ওকে ডাক দে একটা

"তুই যা। আমি ডাকলে আসবে না।"

"না, তু-ই ডেকে আন আমার নাম ক'রে। বল্ যে আমি বলব আজ।"

"কী ?"

"যা ও শুনতে চায়।"

"আজ থাক্ না ভাই। আর একদিন হবে না হয়। তোর শরীর তো এখনো পুরোপুরি সুস্থ হয় নি।"

"তাই তো বলাটা সহজ হবে। সুস্থ অবস্থায় অনেক কিছুই বলতে বাধে যা অসুস্থ অবস্থায় বলা সহজ হয় জানিস নে ? কিছু ভয় নেই—জর আমার আর আসবে না।"

নির্মল আর না করল না, উঠে প্রমীলার শয়নকক্ষের দিকে গেল।

অসিত আর্দ্রচিত্তে একা পায়চারি করে গেটের সামনে।

প্রমীলা স্নেহময়ী ও জানত কিন্তু ওর অসুখের কথা ভেবে কাঁদতে পারে এমন কথা ওর সত্যিই কখনো মনে হয় নি। আজ মনে প'ড়ে যায়—কয়েকদিন আগে ওর একটা কথা—"আমাদের তুমি পর ভাবো অসিদা।" অনুযোগটির যেন একটা নতুন ব্যঞ্জনা আজ ফুটে ওঠে ওর চোখের জলের পরিবেশে। আহা ! কেন ওকে বলে নি ওর ব্যথার কথা ? তাই তো স্নেহময়ী মেয়ে এত দুঃখ পেয়েছে দিনের পর দিন অথচ একটি বারও মুখ ফুটে বলে নি। অনুতাপ আসে। না, বলবেই আজ।

কিন্তু তবু ফের কুণ্ঠা আসে। বলবে ? কিন্তু কী বলবে ? বলা কি যায় কাউকে কোনো গভীর ব্যথার ইতিহাস ? ছায়াকে যে-চোখে ও দেখেছে সে তো শুধু ওর চোখের দেখা ছবি নয়, তার সঙ্গে মিশিয়ে রয়েছে যে কতদিনের মনের চিন্তা, প্রাণের স্পন্দন, আশা নিরাশার মধ্যে দিয়ে গ'ড়ে ওঠা বিচিত্র অনুভব। শুধু কথার ছবি এঁকে বিচিত্র মানুষটিকে ও ফুটিয়ে তুলবে কেমন ক'রে ? তাছাড়া সবচেয়ে মহার্ঘ যে-অনুভব সে নিটোল থাকে শুধু নীরবতারই মাঝে, বলতে গেলেই হয় তার অঙ্গহানি, নয় কি ?

অথচ তবু মানুষ বলতে চায় ! তাই না সে গান গায়, ছবি আঁকে, কাব্য রচে, উপমা খোঁজে—কথার মধ্যে দিয়ে অনির্বচনীয়কে প্রকাশ না

ক'রে কি তার মুক্তি আছে? অথচ ভাষা একা পারে কই এ অসাধ্যসাধন করতে? তাই বুঝি মানুষ আত্মপ্রকাশের নাটমঞ্চে ক্রমশ ভাষা ছেড়ে হাত পাতল ভঙ্গির কাছে?

তাই কি? নয় তো কী? দিন দুনিয়ায়-যে ভাষাভঙ্গির এত আদর সে কি শুধু একটা নিরর্থক খামখেয়ালি? না তো। ভাষা যাকে পারে না ছুঁতে, ভঙ্গি তাকেই লুট ক'রে এনে দেয় যে! প্রকাশে যার পাই না নাগাল, আভাসে তাকে বেশি ক'রে, নতুন ক'রে পাই ব'লেই না রূপায়ণে ইঙ্গিতের জয়জয়কার। একথা যেন অসিত আরো বেশি ক'রে টের পেয়ে। ছায়াকে কাছ থেকে দেখে। ওর বালিকা জীবনে কতটুকুই বা ও প্মোর ছিল প্রকাশ করতে? কিন্তু যে-কথাকে খুলে ব'লে রূপ দিতে প' তাকেই কি ও বেশি ক'রে প্রকাশ করে নি ঢেকে রেখে? মনে পঁ অজয়ের চিঠির কথা: "চাপা মেয়ে"! এই জন্যেই না ওর ব্যঞ্জনার এত মূল্য দিত সবাই। আঁচল আড়াল দিয়ে দীপশিখাটি নিয়ে যাওয়া। শিখা তন্বী ব'লেই না আড়ালে পেল মর্যাদা! সৌন্দর্যের চেয়ে সুষমা যে বড় সেও তো এই জন্যেই। সৌন্দর্য যেন সব হাট ক'রে দিল। সুষমারই আয়ত্তে গৃহিণীপনা। এখানে এটি ওখানে উটি—যেখানকার যা—মানানসই। তাই না সে ডাকে হাতছানি দিয়ে। তৃপ্তির দিক দিয়েও কি এই ডাকেরই দাম বেশি নয়—যার আব্রু আছে?

আনন্দ গভীরতম হ'য়ে ওঠে তো শুধু রচনায় নয়—কল্পনাই আনে স্নিগ্ধতার আবেশ। বিস্ময়ের আড়ালের জয়ধ্বনির মর্মবাণীটি কি এইখানেই লুকিয়ে নেই? যদি প্রকাশই হ'ত সৌন্দর্যের চরম সঙ্কেত তাহ'লে সবচেয়ে সুন্দরী হ'ত বিবসনা। কিন্তু মানুষ সুন্দর দেহকে সুষমা দিল সবটুকু খুলে তো নয়, খানিকটা আড়ালে রেখে। তাই না সম্ভোগেও মিলনের চেয়ে বিরহই বড় হ'য়ে এসেছে রসাস্বাদে, হাসির চেয়ে অশ্রুই হ'য়ে উঠল মধুর। অশ্রুর বেলায়ও কিন্তু ঐ একই কথা। শোকের অসংযমে,

হাহাকারে বড় জোর দয়ার উদ্রেক হয়—সমীহ আসে যখন অশ্রু হয় অন্তঃশীলা। ছায়া তার প্রচ্ছন্নলীলার গভীর ছন্দে যেন এই কথাটি ওকে শিখিয়ে গেছে নতুন ক'রে। কত মেয়েই তো দেখা যায় যারা কান্নাকাটি করতে পেলে যেন হাতে স্বর্গ পায়। ছায়ার স্বভাব এ আহিরিপনার ছায়াও মাড়াত না। চোখে যখন জল ভ'রে আসত তখনো ওর বাঁধ ভেসে যেত কচিৎ। তাই না ওর অশ্রুর মেঘে রামধনু উঠত অমন চিকিয়ে। যার তার কাছে মুখ ফুটে বলবে ও মেয়ে নিজের দুঃখ, ব্যথা, হতাশা? ত সাধ্যসাধনা ক'রে তবে ওর মনের ঈষৎ পরশ পাওয়া যেত—ছোট্ট আয়ার ছুঁয়ে-যাওয়া যেন! অথচ এই যে গোপনিকতা এতেও কি ওর প্রয়াস ছিল এতটুকু? এ যেন ছিল ওর স্বধর্ম—তাই তো ওকে মানাত। পারে.০ন ওর কাছে এমন সুসাধ্য হয়েছিল কেমন করে কেউ বুঝতে পারে নি যা কোনোদিনো। তাই তো ওর সহজ অসামান্যতা এত মন টানত, শুধু অসিতেরই না—দুদিনের জন্যে যারা ওর সংস্পর্শে আসত তাদেরও! আজও মনে পড়ে ও কী অপছন্দ করত "ভালোবাসার" সম্বন্ধে রকমারি উচ্ছ্বাস অঙ্গীকার। বলত "ভালো.যদি কাউকে বাসি অসিদা, তাকে বলতে হবে তবে বুঝবে সে? ছী—!" এই ছী—শব্দটিও ও কী অপরূপ মিড় দিয়েই না বলত একটুখানি টেনে। একরত্তি হাল্‌কা ধিক্কারের ইঙ্গিত. ব্যস্‌। ঘৃণাও প্রকাশ করত ও এমনি ক'রেই। মনে পড়ে অসিতের—একবার প্রবল* ছায়ার সঙ্গে তবলা বাজাতে চেয়েছিল—ছায়া লিখেছিল ওকে "অসিদা, প্রবলবাবু আমার একটি বসন্ত রাগের সঙ্গে টিমা তেতালায় ঠেকা দিতে বসলেন জোর ক'রে। গা ঘুলিয়ে উঠল—সুরে বাজল বেসুর—মৌখিক ভদ্রতা পর্যন্ত বজায় রাখতে পারলাম না—উঠে সটাং চ'লে এলাম—বাপী বকল খুব। কিন্তু যা পারি না তা কি পারি অসিদা!"

* "আশ্চর্য" উপন্যাসে প্রবলের কাহিনী লেখা হয়েছে।

এই-ই ছিল ওর স্বধর্মের ইডিয়ম। যা ও পারত না তা যে ওকে পারতে হবে একথা কোনোদিনই ওর মনে ঠাঁই পেত না। প্রবল অসিতের কুৎসা রটিয়ে ওকে সাবধান করতে এসেছিল, ব্যস্—আর ওর ছায়াও মাড়াতে পারবে না। কুমারী পূজারিণী হৃদয়ের নিঃসংশয় সংকল্পকে ভাঙবে কোন্ ভদ্রতার যুক্তি ?

প্রমীলা আর মানল না নির্মলের ইসারা। অসিত গেটের সামনে একটা পাথরের বেদীতে ব'সে অতীতচারণে এত মশগুল ছিল যে ওরা দুজন কখন ওর পিছনে এসে চুপটি ক'রে দাঁড়িয়ে ছিল, টেরও পায় নি। দুটি কোমল হাত ওর চোখ টিপে ধরতেই চমকে উঠল—ব'লে ওঠে আর কি—"ছায়া !"—ভাগ্যে মুখ ফোটে নি !

দীর্ঘনিশ্বাস চেপে হেসে বলে : "চুড়ির ঠিনি ঠিনি যে বেজে উঠল মিলি, সনাক্ত না করবে কে ?—আয় বোস্।"

প্রমীলা ও নির্মল বসে ওর দু পাশে।

অসিত স্নিগ্ধ হেসে বলে : "একটু কফি আনা মিলি ! কফি বিনা কাহিনী জমে ?

প্রমীলা : আজ থাক না ভাই—তোমার শরীর—

অসিত : না মা আমার শরীর ভাল আছে—আজই না বললে হয়ত বলাই হবে না—কে জানে ?

প্রমীলা : তবে ভিতরে চলো। দেখবে ফায়ারপ্লেসে কেমন আগুন জ্বলেছি।

অসিত : আগুন ? কী দরকার ?

প্রমীলা : গল্প বলতে বলতে পাছে তোমার ঠাণ্ডা লাগে। চলো কফিও রেখেছি অঢেল—ফ্লাস্কে।

কথায়

Paint those eyes, so blue, so kind,
Eager tell-tales of her mind :
Paint, with their impetuous stress
Of inquiring tenderness,

Those frank eyes, where deep doth lie
An angelic gravity.
Ere the parting hour go by,
Quick, thy tablets, Memory !

(Matthew Arnold)

আঁকিব সে-নীল সুকোমল আঁখি দুটি
মনের উৎসুক ছবি উঠে যেথা ফুটি'।
আঁকিব চাহনি তার আবেগ-উচ্ছল
গভীরের প্রশ্নভরা ছায়া-ছলছল।
বিস্মৃত-বিলীন হবে ? তার আগে স্মৃতি
রাখিব উৎকীর্ণ করি' তোমারে অতিথি !

অসিত বলল : "একেবারে গোড়া থেকেই সুরু করি। বলতে হ'লে যথাপর্যায়েই হওয়া ভালো।

"সেবার প্রথম কলকাতায় ফিরেছি একাদিক্রমে আট বছর আশ্রম-বাসের পরে। কাজেই এখানে ওখানে গান বাজনা নিমন্ত্রণ আদর যত্ন আপ্যায়নের সে-ধুম কল্পনা ক'রে নে। প্রথম প্রথম বেশ লাগছিল। কিন্তু ঐ প্রথম দু-চার সপ্তাহ। তার পরই ফের সেই আক্ষেপের মেঘ ঘনিয়ে ওঠে আমোদ প্রমোদের আকাশে। মনে হ'তে থাকে কী বাজে সময় নষ্ট করছি—আদর-যত্নের বাহবা-হাততালির হরির লুট কুড়িয়ে। অনেকদিন নির্জনবাসের পর দৃষ্টিভঙ্গিটার মধ্যে অনেক সময়ে বিপ্লব ঘ'টে যায় ব'লেই এমন হয়। কিন্তু কারণ যাই হোক প্রথম কিছু দিনের পর ফের সব ফাঁকা ফাঁকা মনে হ'তে লাগল। রাসন্তীপুরে শমিতা মূর্ছনাদের ওখানে আদর যত্ন পাওয়ার সময়ে যে ধরণের বৈরাগ্য মন ছেয়ে এসেছিল ততটা না হোক তারই একটা সগোত্র বিতৃষ্ণা ফের যেন মনের কোণে উঁকি দিতে লাগল। মনে ক্রমাগতই গুনগুনিয়ে ওঠে : 'মন ! চলো নিজ-নিকেতনে।'

"ঠিক এই সময়েই আলাপ হ'ল ছায়াদের সঙ্গে। ছায়াদের বলতে মনে পড়ে আমার সব আগে ছায়ার বাবা দেবকুমারের কথা যাকে আমরা ডাকতাম দেবদা ব'লে। তারপর প্রতিমা—ছায়ার মা। তারপর প্রীতি প্রতিমার ছোট বোন। তারপর মনে পড়ে ছায়ার ছোটমামা কান্তির কথা। কিন্তু সেসব যথাস্থানে।

"সম্বন্ধটি হ'ল বড় বিচিত্র ঢঙে। তোরা জানিস, আমি প্রায়ই ব'লে থাকি একটা কথা : যে, সংসারে ভাইবোনের সম্বন্ধই আমার কাছে সব-চেয়ে বিমল মনে হয়—কেন না এই সম্বন্ধের মধ্যেই দাবিদাওয়ার ভাবটা

থাকে সবচেয়ে কম। তাছাড়া সংসারে আরো যে হাজারো রকম সম্বন্ধ কুটুম্বিতা আছে সে সবের মাঝে আমার মন কেমন যেন হাঁপিয়ে ওঠে। তাই দেবদাকে বলতাম—আমি ভাই তোমাদের সবারই ভাই—যেমন মা কালী সবারই মা? কেমন রাজি তো?

"খোলা অট্টহাসি হেসে সরল অথচ তীক্ষ্ণধী মানুষটি আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরল। বলল: 'একেবারে A 1'। আপনির পাট উঠে গেল দুদিনে। সুরু হ'ল তুমির পালা। আজ বুঝতে পারি এটা সম্ভব হয়েছিল বিশেষ ক'রে দেবদার গুণেই। কারণ আরো তো কত ধনী পরিবারে আমার পাসপোর্ট ছিল অবাধ। তারা চাইতও আমাকে খুবই। কিন্তু কই তাদের কারুর সঙ্গে তো দুদিনে এমন হৃদ্যতার সম্বন্ধ গ'ড়ে ওঠে নি! সত্যি, ওরা ছিল দরদী যার দেখা জীবনে এত কম মেলে।

"কিন্তু আগে বলি কী ভাবে দেখা হ'ল ছায়ার সঙ্গে।

"গিয়েছি একটা হোমিওপ্যাথিক হাঁসপাতালের জন্যে টাকা তোলার জলসায় গান গাইতে। অনেক দিন বাদে বাংলা দেশে ফিরে বোধ হয় সেই প্রথম চ্যারিটি—আট বৎসর বাদে।

খুব ভিড়—সভা গম গম করছে। অহঙ্কার স্বভাব-অবুঝ: কাজেই এতে কোনো সত্যিকার গুণপনা প্রমাণ হয় না বুঝেও গর্ব উঠল মাথাচাড়া দিয়ে।

"স্টেজে উঠে যখন সবাই খুব মালা টালা দিচ্ছে—হঠাৎ মনে পড়ল গুরুদেবের অতল নয়ন। কী করছি আমি? মনস্তাপ এল ঘনিয়ে। আমি না নিজেকে বোঝাই—আমার প্রবল বৈরাগ্য?

"দারুণ হাততালি পড়ল আমার কীর্তনে। আশ্চর্য, সব বুঝে ত আনন্দ হ'ল! মনটা আরও যেন নিরানন্দ হ'য়ে গেল নিজের আনন্দ হচে দেখে।

"গান শেষ হ'তেই স্টেজে হুড়োমুড়ি—উঃ সে কী ভিড় ছাত্র ছাত্রীর

রকমারি প্রশ্ন—কোথায় আছি, কী ক'রে দেখা হয়—কোন্ সময়ে... ইত্যাদি। ঘেমে উঠলাম গরমে।

"ভিড় ঠেলে হঠাৎ বলিষ্ঠকায় বাল্যবন্ধু নগেন এসে হাজির—কনুয়ের গুঁতায় জনতাজয়ী। শুনেছি মিলি, আমার বেশির ভাগ বন্ধুই সামনে হাততালি দিয়ে আড়ালে করেন হাসাহাসি। নগেন এ-সংখ্যাগরিষ্ঠদের দলে নাম লেখায় নি। আমার গান, বিশেষ বাংলা গান, ও সত্যি ভালো-বাসত—আমার ঢংটাও খানিকটা আয়ত্ত করেছিল। মিষ্টকণ্ঠ ব'লে ইতিমধ্যে ওর একটু পসারও হয়েছিল। বিশেষ ছাত্রীমহলে। বলল: "ওহে অসিত, আমার একটি ছাত্রী তোমার অটোগ্রাফ চায়।"

"এ এক নতুন যন্ত্রণা! আশ্রম থেকে ফিরে এসে এ-অটোগ্রাফের উপদ্রবে মন আরো পালাই পালাই করত। অথচ অটোগ্রাফ চাইলে না বলবার মতন রূঢ় হওয়ার শক্তি আমার কোনোদিনই নেই। তবু সেদিন ঐ গরমে প্রায় ডজনখানেক অটোগ্রাফ লিখে এতই অতিষ্ঠ হ'য়ে উঠেছিলাম যে বললাম: আরো অটোগ্রাফ! আমি কি রেকারিং ডেসিমেল না কি হে নগেন, ভেবেছ কি বলো তো? দেখছ না ঘামে আমার একেবারে "সদ্যস্নানসিক্তবসনা" অবস্থা?

"নগেন আমাকে চিনত। বলল কাঁধে হাত রেখে: 'আহা স্নানের প্রতিকার তো রয়েইছে turkish towel—না হয় তোমার একটু কষ্টই হ'ল, কিন্তু এরা যে কত আশা ক'রে আসে সেটা তুমি একবার ভেবে দেখেছ কি? অন্তত ছায়াকে কিছুতে তুমি না বলতে পারতে না যদি একবার শুনতে ওর কোকিলকণ্ঠ।

"ছায়া!" নামটি হঠাৎ ভারি মিষ্টি লাগল।

বললাম অগত্যা: 'আচ্ছা ডাকো কোকিলকণ্ঠীকে।'

"নগেন ভিড়ের মধ্যে থেকে একটি নম্রমুখী নতনয়নাকে টেনে এনে ধরল সামনে!"

'আঃ! অটোগ্রাফও চাইবেন অথচ আর্জি পেশ করতে বললেই লজ্জাবতীলতা! কষ্ট না ক'রে কেষ্ট? ধরো খাতাটা শীগ্‌গির খুলে—বেলা ব'য়ে যায়।'

কিন্তু মেয়েটি কোনো কিছুই খুলে ধরল না—ঢিপ ক'রে আমাকে একটি প্রণাম, নগেনের কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে ফিশ ফিশ ফিশ।

আমি হেসে নগেনকে বললাম: 'দরবারে হাজিরি দিয়ে এত কী গোপন কথা?'

'ও পাগলীর কথা আর বলো কেন ভাই। এই দেড়মিনিট আগে কাঁটাল প্রমাণ হঠাৎ চুপসে একেবারে আমসি!

বলছে: আর একদিন হবে না হয়—আজ যখন ওঁর গরমে এত কষ্ট হচ্ছে। ব'লেই ওর দিকে ফিরে বলল: 'কিন্তু আর একদিন কি ওকে পাবে ভেবেছ হাতের কাছে?'

ও যে ভবঘুরে। আরে! Make hay while the sun shines—বলি কত ক'রে—'

সত্যি, বলল ও আরো অনেক কথা। তর্জন গর্জন কাকুতি মিনতি কত কী, কিন্তু ছায়া অচল অটল—কিছুতেই বার করবে না ওর অটোগ্রাফের খাতা: গাইবে কেবলই নানা মিড় দিয়ে একই রাগিণী—'থাক না নগেন বাবু—মানুষকে কষ্ট দিয়ে এভাবে লিখিয়ে নিয়ে কী হবে? পরে হয় তো হবে। না হয়—নেই নেই।'

এরকমটা তখনো চোখে পড়ে নি—বিশেষ ভিড়ে। তাই একটু ঔৎসুক্য জাগল। মেয়েটিকে একটু ভালো ক'রে চেয়ে দেখলাম। হঠাৎ মনে হ'ল মুখখানি বড় কোমল, কিন্তু কী একটা যেন বিষাদ মাখানো। বিশেষ ক'রে ওর ডাগর চোখ দুটির দৃষ্টি। ঠিক গড়পড়তা চাহনিতো নয়! রঙ শ্যামলা—প্রায় কৃষ্ণা বললেই চলে—কিন্তু ঐ চাপা রঙেও কেমন যেন একটা আভা ছিল। তন্বী একহারা গড়ন, কিন্তু বেশ লম্বা, ছোট্টখাট্ট

মেয়েটি নয়। অথচ পূর্ণকায়া হ'লেও কোথায় যেন একটা অপূর্ণতা রয়েছে। বালিকাও নয়, কিশোরী বললে যা বোঝায় তা-ও না। অপরূপ বলা চলে না—অথচ কী একটা অভিনবতা আছেই।

বললাম: 'কী নাম তোমার যেন?'

"ও সোজা তাকালো চোখের দিকে। কিন্তু তারপরেই চোখ নামিয়ে নিয়ে আস্তে বলল: 'ছায়া।'

ওর কণ্ঠস্বরে কী একটা বেজে উঠল। বললাম: 'বেশ নামটি। আচ্ছা, লিখে দিচ্ছি একটা ছড়াজাতীয় কিছু—দাও খাতা।'

'না - গরমে আপনার কষ্ট হয়েছে খুব—পরে হবে।'

"একটু আশ্চর্য হ'তে হ'ল বৈকি। এইমাত্র নগেন বলল ছায়া খুব আগ্রহ ক'রেই এসেছিল অথচ কিছুতেই রাজি নয় মেয়ে আমাকে ভিড়ে কষ্ট দিতে! বললাম ওর পিঠে হাত রেখে: 'দাও তোমার খাতাটা—বাড়ি ফিরে আমি ভালো ক'রে কিন্তু একটা লিখে দেব—নগেন তোমাকে দেবে পরে। কেমন?—কিম্বা তুমিই বরং এসো না কেন আমার ওখানে খাতাটা নিতে—তখন খুব ভাব করা যাবে। কেমন?'

আনন্দে ওর মুখ উজ্জ্বল হ'য়ে উঠল, বলব: 'সেই বেশ। এই নিন।' ব'লেই খাতাটা বের ক'রে আমার হাতে গুঁজে দিয়েই ফের ঢিপ্ ক'রে একটি প্রণাম। তার পরেই নানা অর্থী ধরল চেপে, ভিড় ঠেলে বেরিয়ে আর ওকে দেখতে পেলাম না—নগেনও অদৃশ্য।

বাড়ি ফিরে এসে রাতে যতবার ঘুম ভাঙে মনে পড়ে ওর চোখ দুটি। শুধু চোখ নয়, আচরণও। বালিকাদের মধ্যে ঠিক এমনটি আর কখনো দেখেছি কি? কই, না তো!

"পরদিনই সন্ধ্যাবেলা নগেন এসে হাজির, সঙ্গে ছায়া দেবদা আর আ[illegible] বলেছি বোধ হয় ওর মাসি।"

'আঃ'

প্রমীলা : বলেছ কিন্তু দেববাবু কী করতেন বলোনি।

অসিত : এঞ্জিনিয়র। বেশ নাম-করা। Reinforced concrete এর একজন ওস্তাদ যাকে বলে। চাকরি ছেড়ে দিয়ে বেশ পসার জমিয়ে ছিলেন অল্পদিনেই।"

নির্মল : তারপর ?

অসিত : ছায়াকে দেখে মনের মধ্যে খুসিটা তৃপ্তির কোঠায় উঠল যেন। শুনলাম সেদিন ও গ্রামোফোনে গান দিয়ে আসছে। শুনে ঠাট্টার সুর ধরলাম : 'অ্যাঁ! গ্রামোফোনে গাও! তুমি তো তাহ'লে দেখছি ওস্তাদ!

প্রীতি বলল : 'কেন ওকে লজ্জা দিচ্ছেন ? ও এমনি দুচারটে সাদা-মাটা বাউল ভাটিয়ালি গায়—গান গাইতে বললে মেয়ে ভয়েই সারা!'

"আমি দেবদার দিকে চেয়ে বললাম : 'শুনলাম আপনি একজন তেজস্বী মনস্বী এঞ্জিনিয়র—আপনার মেয়ে কি না ভয়কাতুরে।"

"দেবদা হেসে বললেন : 'দেখুন না গেরো—বাঘের ঘরেই ঘোগের বাসা—বলে না ?'

"আমি বললাম : 'বেশ গায় শুনলাম ?'

নগেন বললে : 'কোকিলকণ্ঠী হে কোকিলকণ্ঠী। তবে হবে না কেন—যে ছেলেবেলা থেকেই রোজ একটা ক'রে কোকিল পুড়িয়ে খেয়ে এসেছে ব্রেকফাস্টে!'

ছায়া কষ্টকণ্ঠে বলল : 'কী যে আপনি নগেনবাবু!—যান

হঠাৎ নজরে পড়ল ওর চোখের দৃপ্ত ভঙ্গি। এ তো ঠিক বালিকা দৃষ্টি নয়। অন্তত তাচ্ছিল্য করা চলবে না একে। মন টানল আবেগে বললাম : আহা, এও জানো না কোকিলকণ্ঠী, যে খোসখবরের ম'লে ভাঁজো ? আমরা সেই কোন মান্ধাতার আমল থেকে গান গেয়ে কিন্তু হায় রে, কোকিল তো কোকিল, দোয়েল, শ্যামা—এমন কি খেতাবও পেলাম না আজ পর্যন্ত।'

দেখেন কয়েকটি ছেলে মার্বেল খেলছে। একটি মার্বেল যেন একটি বেশি চকচকে। তিনি নিয়ে গেলেন এক জহুরির কাছে। সে বলল একেবারে জাত সাপ—সাচ্চা হীরে। দাম ধরল পাঁচশো পাউণ্ড—সাড়ে সাত হাজার টাকা।

ছেলেটি কিন্তু জানত না যে অন্য মার্বেলগুলির সঙ্গে এ মার্বেলটির মিশ নেই। পাড়াপড়শিরাও না। সবাই মনে করেছিল বড় জোর একটা কুলীন মার্বেল।

ছায়ার কণ্ঠ যতই শুনতাম ততই মনে হ'ত আমার এ ইতিহাসটি। ওর আশে পাশে যারা থাকত তাদের মনে হ'ত মেয়েটির বেশ মিষ্টি গলা। বড় জোর খাসা গলা—আর পাঁচটা মেয়ের চেয়ে হয়ত বা একটু ভালো। কিন্তু এ কণ্ঠ নিয়ে যে গড়পড়তা সুরের মার্বেল খেলতে [illegible]ওয়া ভুল—এর মধ্যে দিয়েই সুরের হীরে আবিষ্কার করতে হয়—একথা ওরা কেউ ভাবে নি, এমন কি ওর মাসি প্রীতিও না, যে ছিল বোনঝি বলতে অজ্ঞান। সাম্যবাদের একটা অদ্ভুত থিওরি আমাদের সহজ বুদ্ধিকে এমনি ঘুলিয়ে দিয়েছে—বিশেষ ক'রে হাল আমলে—যে, হাজারটা মার্বেলের চেয়েও যে এক টুকরো হীরে ঢের বেশি দামি এ সহজ কথাটাও জোর দিয়ে বলতে হয় যখন কিনা বিষয়টা আসে ধাতু ছেড়ে মানুষের কোঠায় [illegible] কারণটা অবশ্য দুর্বোধ্য নয়। হীরের বাজার দর এতই প্রত্যক্ষ যে তাকে খাতির না করে উপায় নেই। কিন্তু কণ্ঠস্বরের যাচনদার তো বেশি নেই—বিশেষ ক'রে আমাদের মতন ওস্তাদ-উৎপীড়িত দেশে যেখানে কণ্ঠের দর কষা হয় গলাবাজির অসাধ্যসাধন দিয়ে। তাই একথা আজো আমরা তেমন করে ভাবতে শিখিনি যে একটি সুরের ঠিক দোলাটিতে যে অঘটন ঘটে সে গলাবাজির কসরতের চেয়েও হাজার গুণ অসাধ্যসাধন করে প্রতি মুহূর্তেই। নৈলে অপূর্ব কণ্ঠ শুনেও কি সমজদাররা

দিলাশা দেন—হ্যাঁ, গলাটি বেশ মিষ্টি। ব্যস। Damning with faint praise-এর এর চেয়ে সরেস নমুনা পাওয়া ভার।

"এক সময়ে এজন্যে দুঃখ পেতাম—ছায়ার হ'য়ে। কিন্তু এখন মনে হয় মরুক গে। কারণ হীরে যদি কেউ না চেনে, সে লজ্জা তো হীরের নয়—যাচনদারের। তবে হয় কি, আনন্দের কোঠায় একটু বাজেই বাজে দরদের গরমিলে: তাই বাজত আমাকে যখন ওর কণ্ঠস্বরের যথার্থ মূল্য দিতে অনেককেই নারাজ দেখতাম। অবিশ্যি খতিয়ে এটা অনিচ্ছা নয়—অক্ষমতাই বটে—তবু অনেক সময়েই বাইরে থেকে দেখতে ও দুটো দেখায় প্রায় যমজ। যাই হোক কী বলছিলাম যেন?

প্রমীলা: ও গান গাইল ভয়ে ভয়ে।

অসিত: ঐখানেই একটু ভুল হ'ল। ছায়া গান গাইবার সময়ে ভয় পেত না এতটুকুও ভয়টা ছিল ওর কল্পনার—পাছে ভয় পায় এই ভয়। কেন না সুর যখন ও ধরত তখন ওর কণ্ঠের মধ্যে ছিল না এতটুকু বেপর্দা টলমল করে। এর সব চেয়ে বড় প্রমাণ ওর গ্রামোফোনে গাওয়া। তোদের বলেছি, কী কর্মভোগ গ্রামোফোনে গান দেওয়া। কত পরখ, কত আলো জ্বলা, এখানে তবলচির ঠেকা আস্তে হ'ল কি জোর হ'ল তার খবর নিচ্ছেন কর্মকর্তা, ওখানে ঘড়ি ধরছেন নাকের সামনে আর এক মহাপুরুষ, সামনে জানলার মধ্যে দিয়ে রেকর্ডারের কাটামুণ্ডু ভ্রুকুটি করছে বাজনা জোর হচ্ছে বা কমজোর হচ্ছে—সে কি একটা ক্যা[illegible] বিশ্বাস করিস যে, যে-আমি দশ হাজার লোকের সভায় সমানে গানের পর গান গেয়ে গিয়েছি অকুতোভয়ে, সেই আমি গ্রামোফোনের মাইক্রোফোনের সামনে নিজেকে মনে করি শ্রেফ অবলা। কিন্তু ছায়াকে দেখেছি বার বারই সুরু করতে ও ভয়েই অস্থির। কিন্তু আস্থায়ীর প্রথম চরণ ঘুরতে না ঘুরতে ওর গলা চলেছে অব্যর্থ যেমন অর্জুনের তীর চলত লক্ষ্যের পানে। এ একটুকু বাড়ানো নয় মিলি! সচরাচর আমার একটা গান দিতে গড়পড়তা

একঘণ্টা লাগত। কিন্তু মনে আছে ও শেষ যেদিন গান দেয়—দিলে দুঘণ্টায় ছটা গান—চারটে বাংলা, একটা হিন্দি, ঠুংরি, একটা উর্দু গজল আর সব কয়টাই দাঁড়ালো নিখুঁৎ একটিতেও গলা কাঁপেনি—এতটুকু।

কিন্তু হ'লে হবে কি, দুঃখ হ'ত ওর মাসিমার মুখখানি দেখে। পাছে আদুরে মেয়ের গাওয়ায় ভুলচুক হয় ভেবে সে বেচারি সারা। থেকে থেকে অবলা যা মাথাটা নাড়ত ওকে বল দিতে! বলত: 'ভয় কি রে? বাঃ বেশ হচ্ছে—এমন গলা যার তার আবার ভয়! পেতাম এমন গলা আমরা তো দেখতিস কী কাণ্ডটা করতাম।' ইত্যাদি। আহা ও তো শুধু ওর মায়ের কোল জুড়ে আসে নি—মাসির ছিল ও চক্ষের মণি। আজ না জানি তার দিনরাতগুলো কী ক'রে কাটছে!

গান শেষ হতেই ওকে কাছে টেনে নিয়ে খুব আদর ক'রে বললাম: 'তোমার মাসিমা তো মিথ্যে অভয় দেন নি ছায়া! এমন গলা সে-ও গাইতে ডরাবে?

মুহূর্তে ওর ম্লান মুখখানি উঠল আভাময় হ'য়ে। কিন্তু তবু ও করল না আমাকে সেই প্রশ্নটি যা আমি প্রত্যাশা করছিলাম: 'শেখাবেন তাহ'লে?' ও চুপ ক'রে শুধু ওর মাসিমার দিকে তাকিয়ে হাসল একটুখানি।

বোধ হয় সেইটেই ছিল সিগনাল। কারণ মাসিমা তৎক্ষণাৎ পড়ি কি মরি ক'রে বললেন: 'তাহ'লে ছাত্রী পাশ তো?'

"বললাম হেসে: 'পাশ? ঝাণ্ডা উড়িয়ে যাকে বলে—With flying colours কবে যাব বলো ছায়া—তোমাদের বাড়ি?'

ও চমকে তাকালো সোজা আমার চোখের পানে, যেন প্রথমটা সমঝে উঠতে পারল না কী বলছি। তারপর বলল 'আমাদের বাড়ি? আসবেন। ও মা! মাসিমা! প্রায় হাততালি দিয়ে ফেলে আর কি। শিশু বলে আর কাকে?

তখন ধরলেন প্রীতি দেবী তাঁর ধাবন্তী নিজমূর্তি। এতক্ষণ প্রাণপণে রাশ কষছিলেন তাঁর রসনা-পক্ষিরাজের। বললেন: "আপনি জানেন না অসিতবাবু, ও কী ক'রে গেলে আপনার কথা নগেন বাবুর কাছে—কী করে আপনার গ্রামোফোনের রেকর্ড নিয়ে! আপনি ওকে বাড়ি ব'য়ে গিয়ে গান শেখাবেন এ কি ও বিশ্বাস করতে পারে কখনো? আজ বাড়ি গিয়ে বিছানায় শুয়ে আমাকে কতবার যে জিজ্ঞাসা করবে আপনি ঠিক আসবেন তো—সে আমিই জানি।

ছায়া খুব হাসল শুনে। কিন্তু মুখে কুণ্ঠার বাষ্পও নেই আর। বলল: তুমিই বলো না মাসিমা—বিশ্বাস হয় কি? উনি আসবেন আমাদের বাড়ি—আর কি না আ—মাকে গান শেখাতে !!

আমি হেসে ওর উপরে হাত রেখে বললাম: 'বিশ্বাস হয় না কেন শুনি? আমি কি শামুক, না নবাব খাঞ্জা খাঁ যে তোমাদের বাড়ি যেতে গেলেই পথে গাড়িচাপা পড়ব?

ও তো হেসে কুটি কুটি এ অদ্ভুত উপমা দুটি পাশাপাশি শুনে। বলল 'ও মা! শামুক কেন হ'তে যাবেন? মাসিমা!' ব'লেই হঠাৎ মুখে আঁচল চেপে মেয়ে কাঠ—কেননা দেবদা তাকালেন ওর দিকে এই সময়ে।

"প্রীতি হেসে উঠল খিল খিল করে ওর রকম সকম দেখে। বিশেষ ওর জোর ক'রে গম্ভীর হবার এই চেষ্টায়। বুঝলাম ওর লজ্জা কেটেছে বটে কিন্তু ভয় কাটেনি পুরোপুরি। কাজেই ওকে আর একটু ভয় দেখিয়ে ভয় কাটাবার জন্যে বললাম:

'আচ্ছা আমি শামুক না হই, নেই নেই। কিন্তু ঈ—শ একটা যে মস্ত মুস্কিল রয়ে গেছে, তোমাদের বাড়ি? উহুঃ। কী ক'রে যাই উঃ! সেটা তো ভাবিনি। যাঃ।'

বেচারির প্রভাতী মুখখানিতে যেন নেমে এল সন্ধ্যার কালো ছায়া

প্রীতিও মুখ অন্ধকার ক'রে বলল : 'কী মুস্কিল অসিতবাবু ? আপনাদের আশ্রমের 'কি ছোঁওয়া ছুঁইয়ির কোনো বিচার টিচার আছে না কি ?'

আমি আরো গম্ভীর হ'য়ে বললাম : 'তা নেই—তবে এটা যে আরো সঙিন মকদ্দমা। হয়েছে কিঁ, ছায়াদের বাড়ির ঠিকানা আমি জানি নে।'

প্রীতি বলল : সর্বরক্ষে। আমি ভাবি বুঝি—ব'লে মাসি বোনঝি হেসে গড়িয়ে পড়ে আর কি।

"দেবদা বাধা দিয়ে বললেন হাসিমুখে 'সে ভাবনা করবেন না। কবে আসবেন ফোন ক'রে জানালেই তক্ষনি আমি মোটর পাঠিয়ে দেব।"

এবার নগেনের মুখ ফুটল : 'আমি এসে নিয়ে যাব—কালই। কেমন ? কাল রবিবার—দেবদারও ছুটি, ছায়ারও বিভীষিকাটি আসবেন না।'

'বিভীষিকা ?'

প্রীতি বলল : 'ওর পড়ার মাষ্টার আর কি।'

"আমি বললাম হেসে : 'পড়তে ভালো লাগে না বুঝি ?'

'ও অম্লান বদনে বলল : 'ক্লাসের পড়া যে !'

"আমরা হেসে উঠলাম ফের। হাসি থামতে বললাম : 'বেশ বলেছ খুকু। জানো, ছয় বছর বয়সে আমাকে প্রথম ইস্কুলে ভর্তি করে দিলেন এক মাষ্টার মামা। আমি রোজ লুকিয়ে থাকতাম এক তক্তপোষের নিচে দশটা বাজতে না বাজতে। আর স্বপন ব'লে একটা উড়ে চাকর ছিল সে রোজ আমাকে টেনে বার করত। কাজেই গুরু শিষ্যায় বনবে ভালো, কী বলো ?'

'ও মা ! মাসিমা !' ব'লেই ফের দেবদার সঙ্গে চোখোচোখি। দেবদা এবার হেসে উঠলেন হো হো ক'রে। আমরাও যোগ দিলাম সে সংক্রামক হাসিতে।

'তাহ'লে কালই ঠিক তো ?' বললেন দেবদা, হাসি থাম্‌লে। বেশ। ধন্যবাদ। কটার সময় মোটর পাঠাব তাহ'লে ! দশটা ? অল্‌ রাইট।'

প্রীতি বলল : 'একটা অনুরোধ করতে পারি কি ?'

আমি বললাম : "দুটো করলেও আমি হয়ত রাতারাতি মিইয়ে যাব না।'

ছায়া প্রীতির কানের কাছে মুখ দিয়ে ফিশ ফিশ ক'রে বলল : কী মজার কথা বলেন উনি, না মাসিমা ?'

আমি বললাম : 'শোনা গেল যে পরিষ্কার, ছায়া !'

প্রীতি বলল : 'ও মেয়ের অমনি ধরণ। ও কোনোদিনো কি পারল কোনো কথা চাপা সুরে বলতে! ওর সবই খোলাখুলি কিনা। যাক্, শুনুন, অনুরোধটি আমার এই যে, কাল দুপুরে যদি আমাদের ওখানে দুটি খেয়ে আসেন তো বড্ড খুসি হবে দিদি—মানে, মেয়ের মা।'

বললাম : 'ওহেন দারুণ অনুরোধ রেখে কাউকে খুসি করা কি খুব দুঃসাধ্য কাজ মনে করেন, প্রীতি দেবী !'

'তা করিনে। কিন্তু একটা কাজ নিশ্চয়ই দুঃসাধ্য মনে করি।'

'কী ?'

'প্রীতির পরে দেবীর লেজুড়টি সওয়া। আপনি দেবদার প্রায় সমবয়সী। আমরা যদি আপনাকে দাদা ডাকি অধিকার দেবেন কি ?'

'দিতে পারি যদি আপনারা সবাই আমাকে আপনি ছেড়ে তুমি ডাকেন। কিন্তু সবাইকেই মেনে চলতে হবে এ সর্ত, মনে রাখবেন !'

ছায়া কাঁদো কাঁদো সুরে বলল : 'সে কেমন কথা ? আমি কি ক'রে তুমি বলব ওঁকে ? মাসিমা !'

''দাদা বলবে কেমন ক'রে ?'

'দাদা বলা আর তুমি বলা এক হ'ল ? কী যে বলেন আপনি ?'

দেবদা ওকে দিলাশা দিয়ে বললেন : 'আচ্ছা আচ্ছা সে হবে অখন। আগে আসা যাওয়াটা একটু পাকুকই তো,' তারপর আমার দিকে চেয়ে : 'তাহ'লে ঠিক দশটায় গাড়ি পাঠাব তো ?'

বললাম : 'না পাঠালে আমাকে ব্রজবাবুর জুড়ি ক'রেই যেতে হবে।

'ব্রজবাবু কে মাসিমা ?'

দেবদা বললেন : 'আহা ব্রজবাবুর জুড়ি মানে পদব্রজ এ-ও জানিস নে ? তুই কি রে ?'

ছায়া প্রায় হাততালি দিয়ে ওঠে আর কি :

'উনি কী চমৎকার কথা বলেন মাসিমা !'

'তোমার গানের চেয়েও চমৎকার ?'

'আপনি ভারি—ইয়ে।' ব'লেই হেসে উঠল অকুণ্ঠে।

গুরুশিষ্যার এই-ই হ'ল পরিচয়-পর্ব।

*　　*　　*

অসিত বলল : "সেদিন রাতে ফের নানাকে স্বপ্ন দেখলাম।"

প্রমীলা : লণ্ডনের !

অসিত (প্রীতকণ্ঠে) : তুই ভুলিস নি দেখছি ?

প্রমীলা বলল : ভুলে যেতাম যদি না তোমার অ্যালবামে তার মুখখানি আমার মন টানত।

নির্মল : কিন্তু নানার কথা আমার তো কই মনে পড়ছে না।

অসিত : তুই ছিলি না বজরায় সেদিন সকালবেলা। যাক্ বলছি শোন। নানা একটি ফরাসী মেয়ে। ওদের বাড়ীতে আমি ছিলাম লণ্ডনে। ১৯২০ ও ২১ সালে। ওর মার সঙ্গে ওর বাবার বিয়ে হয় নি। সে অনেক কাণ্ড—সব বলতে গেলে এ হ'য়ে দাঁড়াবে একটা গল্পের মধ্যে গল্প—Wheel within wheels. তাই এইটুকুই এখন জেনে রাখ বিবাহ হয় নি কারণ নানার মার আপত্তি ছিল বিবাহে। বাবা ছিলেন লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে ফরাসী ভাষার অধ্যাপক। ফরাসি ভাষায় আমার হাতে খড়ি ওদেরি বাড়িতে—বিশেষ ক'রে নানার কাছে। আট বছরের মেয়ে আমাকে অনর্গল ব'লে যেত ওর ছোট্ট বিশ্বের অফুরন্ত সুখদুঃখের

কাহিনী ! কী সুন্দর যে লাগত ফরাসি ভাষার ধ্বনি ওর টুকটুকে ঠোঁট দুটির নানা ভঙ্গিমায়—রকমারি রঙের ঝর্ণা ফেটে পড়ত অকারণ আনন্দে যখন তখন। বলতে কি, ফরাসি ভাষা যে আমি ভালবাসতে পেরেছিলাম এত সহজে সে অনেকটা ওর স্বভাব ও কণ্ঠের লাবণ্যের দরুণ। কিন্তু যা বলছিলাম।

এ 'অষ্টবর্ষা ভবেৎ গৌরী'কে যখন বরণ করলাম আমার সনাক্ত-না-করা পিতৃস্নেহ দিয়ে, তখন একটা শোনা কথা এল জানা-র কোঠায় : যে, আমাদের মগ্ন চেতনায় অনেক তৃষ্ণা লুকিয়ে থাকে যাদের আর্জি আমাদের সজাগ চেতনার দরবারে পৌঁছয় অনেক অলিগলি ঘুরে তবে। হৃদয়াবেগের ক্ষেত্রে একথা আরো বেশি খাটে, কেননা তার গতিবিধি স্বভাবতই ডুব জলে বলে উপর-চালাক মনকে সে সহজেই ফস্কে যায়। আমি একজন মস্ত দেশসেবককে জানি যাঁর সম্বন্ধে আমাদের সবারই দৃঢ় ধারণা ছিল যে তাঁর হৃদয়দুয়ার কোনোদিনো খোলা পাবে না কোনো কামিনী। হঠাৎ আমার একটি বিদেশিনী বান্ধবী আমাকে দেখান তাঁর কয়েকটি চিঠি। প'ড়ে তো আমি থ! বন্ধুবরের সে কী আকুলি বিকুলি—'আমাকে তুমি গ্রহণ করবে না মোহিনি! আমি জানতাম না যে তোমা হেন রমণী'—ইত্যাদি ইত্যাদি। দুঃখ হ'ল বান্ধবী তাঁকে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন ব'লে। নারীকে যিনি এত অবজ্ঞা করতেন সেই নারীই কিনা করল তাঁকে প্রত্যাখ্যান। কিন্তু সে অন্য কথা।

যেটা এস্থলে আমি বলতে চেয়েছি সেটা এই যে, শিশুসঙ্গ যে আমাদের কাছে কতটা প্রয়োজনীয় সেটা আমি নানাকে দেখবার আগে তেমন ক'রে উপলব্ধি করি নি। ওকে যখন আমাদের গান শেখাতাম, সিনেমা সার্কাস থিয়েটার প্রদর্শনী প্রভৃতি নানা মেলায় নিয়ে যেতাম, একটু একটু ক'রে বাংলা পড়াতাম,—বিশেষ ক'রে যখন আমাদের দেশের সাধু সন্তদের জীবন চরিত, মুনিঋষিদের কাহিনী, পুরাণ মহাভারতের নানান্ গল্প বলতাম

তখন স্পষ্ট দেখতাম কোন্ অলক্ষ্য লোক থেকে আমার প্রবীণায়মান মনেই শুকনো বালুচরে রসের ঢেউ এসে লাগছে ধীরে ধীরে। শিহরণ জাগত যখন দেখতাম যে, যাতে আমি সাড়া দিই—যেমন গান, কবিতা, ভক্তি, তাতে ও-ও সাড়া দিচ্ছে ওর তৃষিত শিশুমনের অশ্রান্ত কৌতূহল নিয়ে। এক ইংরাজ কবির কবিতা মনে পড়ত :

তরুণ মনের বিকাশে লালনে কী অপরূপ আনন্দ
কিশোর চিন্তা পায় খুঁজে যবে আপন স্বভাব ছন্দ।

"আজও মনে পড়ে মিলি, ঐ মেয়েটিকে ছেড়ে আসার ব্যথা। কেবলই মনে হত—আহা, ওকে যদি দেশে নিয়ে গিয়ে লেখাপড়া শিখিয়ে পারতাম মনের মতনটি ক'রে গ'ড়ে তুলতে—পরে হয়ত বিয়ে দিতাম একটি সুন্দর আদর্শবাদী যুবকের সঙ্গে—সে যে কত রকমের উদ্ভট জল্পনা কল্পনা—কী বলব! তাই ভাবি আজ আমাদের সত্তার কত গূঢ় লোকে যে কত রকমের বিচিত্র সাধ আহ্লাদ বাসা বেঁধে থাকে! ওকে দেখবার আগে কিন্তু মনে হ'ত সন্তান এক নিছক্ কর্মভোগ—ভূতের বোঝা। কিন্তু প্রথম যৌবনের চঞ্চলতায় একটু ঢিমে চাল আসতে না আসতে দেখি যে বাইরের ভূতের বোঝা বইতে ভিতরকার দেবতাও যেন তেমন নারাজ নন। আজও মনে পড়ে আমার হাঁটুতে ব'সে ঐ ফুটফুটে মেয়েটির ঘোড়া ঘোড়া খেলা—সে কত হাসি কান্না অফুরন্ত আবদার : আমাকে পড়া করতে না দেওয়া, পিছন থেকে টু করা, চোখ টিপে ধরা, আমার সব দরকারি জিনিষ লুকিয়ে ফেলা। ওর উর্বর মস্তিষ্কে কত রকম উপদ্রবের নিত্যনতুন ফন্দি যে রোজ গজাতো! কিন্তু সব ছাপিয়ে মনে হ'ত ওর গান শেখা। ছোট ছোট সহজ বাংলা গান ও গাইত এমন সুন্দর। উচ্চারণ ভুল হ'ত কিন্তু সুরে না। অনেক সময়ে এখানে ওখানে চা পার্টিতে, জলশায় ও আমার সঙ্গে ডুয়েট গাইত—কখনও বা কোরাস, গাইত—

ভারত আমার ভারত আমার যেখানে মানব মেলিল নেত্র।
মহিমার তুমি জন্মভূমি মা এশিয়ার তুমি তীর্থক্ষেত্র।

সবাই ভারি মুগ্ধ হ'ত ওর ভুল উচ্চারণে গাওয়া নির্ভুল সুর শুনে।

বেশ মনে আছে—ছায়ার সঙ্গে যখন প্রথম দেখা হয় সেই স্টেজে, বিদ্যুতের মতন মনে প'ড়ে গিয়েছিল নানার কথা। পরের দিন যখন দেবদার সঙ্গে ও এল তখনো ফের নানার কথা মনে হ'ল—বিশেষ দেবদার সঙ্গে ওর সম্বন্ধের মাধুর্য দেখে। ভয়ও করে অথচ ভালোও বাসে—অথচ বেপরোয়া। কী অপরূপ! মনে হ'ল আজ হয়ত নানাও এত বড়টিই হয়েছে। আজ সে বাংলা দেশে থাকলে হয়ত তার সঙ্গেও আমার ঠিক এম্‌নি মধুর সম্বন্ধ গ'ড়ে উঠত পিতাপুত্রীর।

যাই হোক সেদিন রাতে ফের নানারই স্বপ্ন দেখলাম। কিন্তু সে ঠিক স্বপ্ন নয়—একটা ঘোরে দেখা vision বলাই ভালো।

নির্মল: কী দেখলি?

অসিত বলল: দেখলাম যেন একটা স্নেহের বোঁটায় পর পর ফুল হ'য়ে ফুটছে ছায়ার আর নানার মুখ।···কিন্তু তারপরেই হঠাৎ স্বপ্নটা বদলে গেল। তখন দেখছি কি, একটা আবছা মাঠে চলেছি আমি একলা। মাঠটা বিলেতের বেশ স্পষ্ট মনে আছে—এখানে ওখানে ডাফোডিল ফুটেছে, লিলি, ভায়োলেট আরও কত রকমের নাম না-জানা সুন্দর সুন্দর ফুল হাসছে দুপাশে কৃষাণদের কুটীরের আঙিনায়। হঠাৎ দেখি কি—ওয়েস্টমিনিস্টারের পাশ দিয়ে টেম্‌স্ নদী! ভাবছি তাইত, এখন পার হওয়া যায় কী ক'রে? এদিক ওদিক তাকাচ্ছি—কোথাও ফেরি মেলে কি না। ও মা! এম্‌নি সময়ে দেখি টেম্‌স্ তো না—ভরা গঙ্গা!

স্বপ্নে কখনো অবাক লাগে না। কাজেই বেশ খুশি হয়েই হাতছানি দিয়ে ডাকলাম এক মাঝিকে—পরনে তার পেণ্টুলুন আবার ওভারকোট।

সে টুপি খুলে অভিবাদন ক'রে এল কাছে। নৌকায় খানিকদূর গিয়ে যেই পকেটে হাত দিয়েছি দেখি পয়সাকড়ি যা ছিল সব কেটে নিয়েছে এক গাঁটকাটা। ওদেশে ও ফ্যাসাদে আমাকে প্রায়ই পড়তে হ'ত কি না।

কী হবে? নেমে যাব? কিন্তু এখন মাঝি ছাড়বে কেন? অন্তত ছ পেনির একটা চাকতি তো চাই-বেই—অথচ একটা পেনিও নেই আমার কাছে। হঠাৎ দেখি নৌকোর ছাতরির মধ্যে ব'সে নানা! দেখেই সে উল্লাসে চেঁচিয়ে উঠল: 'এসো এসো! কোনো ভয় নেই, আমার কাছে দু দুটো ফ্লোরিন আছে।'

আমিও মহানন্দে তার কাছে গিয়ে তাকে টেনে হাঁটুর ওপর বসালাম:

'কোত্থেকে এলি তুই?'

'ওপার থেকে।'

'হঠাৎ!'

'তুমি মুস্কিলে পড়ো নি?' মুখে ওর সেই চিরকেলে দুষ্টুমিভরা হাসি।'

এম্‌নি সময়ে হঠাৎ দেখি সাহেব মাঝি তখন বেমালুম বাঙাল ব'নে গেছে।

'ভাড়া গ্যান কত্তা!'

নানা একটা শিলিং ফেলে দিল। সে বলল: 'এডা নিয়ে করমু কী? একটা আধুলি দ্যান।'

নানা শুষ্ক মুখে বলল: 'আধুলি আবার কী?'

মাঝি রেগে উঠল: 'জোচ্চুরি! রাংতা মোড়া পয়সা!'

নানা বলল: 'না তো। এ যে ফ্লোরিন—'

'ধ্যেৎ—এ তো রাংতা—'

আমি রেগে উঠলাম: 'রাংতা আবার কি?' এর নাম ফ্লোরিন, জানো না? দু শিলিং-এ একটা ফ্লোরিন হয়।'

মাঝি অগ্নিশর্মা: 'শিলিং আবার কেডা কত্তা? ভালোয় ভালে আধুলি গ্যান তো গ্যান নৈলে—টাইন মাইর‍্যা জলে ক্যাইলা দিমু—ম্যাম্‌-বাচ্চা ঢের গ্যাখচি।'

প্রমাদ গণলাম। কারণ তার সঙ্গে দু দুটো পেল্লায় জোয়ান। উপায় আধুলি না পেলে ওরা তো দেবেই জলে ফেলে। খরস্রোতা ভরা গঙ্গা-দ, রক্ষে আছে—বিশেষ নানাকে নিয়ে। ওকে বাঁচাব কি ক'রে এই স্রোতের টানে? ভাবতে ভাবতে ওরা এসে আমাকে ধরেছে চেপে। হাতের কাছে একটা দাঁড় ছিল আমি তুলে নিয়ে হাঁকড়াতে যাব—এমন সময়ে হঠাৎ দেখি নানা হ'য়ে গেছে ছায়া। ঠিক ছায়া নয়—যেন দুটো মূর্তি দিয়ে গড়া একটা প্রতিমা। বলল: 'এই নে আধুলি আছে আমার কাছে—ছেড়ে দে ওকে—করছিস কী উনি যে সাধু মানুষ।'

মাঝি চমকে বলল: 'তাই তো কত্তা—গেরুয়া দেখি। মাফ করবেন। চলেন, চলেন।'

ভারি আনন্দ হ'ল। ছায়াই হ'ল শেষটায় তারিণী।

ওমা! এমন সময়ে আর এক ফ্যাসাদ উঠল কালবোশেখি! কী ঝড়! চক্ষের নিমেষে নৌকো গেল উল্টে। একটু দূরে দেখলাম ছায়ার এলো চুল—ভেসেই ডুবে গেল। কিন্তু ডুববার আগে একটা ভাসন্ত গাছের গুঁড়ি দিয়ে গেল ঠেলে। আমি চেপে ধরলাম গুঁড়িটা কিন্তু ছায়াকে আর দেখতে পেলাম না। পারানি যে দিল সে-ই হতে পারল না পার!

প্রমীলা ও নির্মল চুপ ক'রে রইল।

একটু পরে অসিত বলল প্রমীলার দিকে চেয়ে গাঢ় কণ্ঠে: "কিম্বা কে জানে মিলি? হয়ত সে-ই পার হ'য়ে গেল আমিই রইলাম প'ড়ে।"

প্রমীলা ওর কাঁধে একটা হাত রেখে বলল: "আজ থাক ভাই এ-গল্প।"

অসিত লজ্জিত হ'য়ে সহজ সুর টেনে বলল: "না না সে কী কথা?

সে ব'লে নির্মলের দিকে চেয়ে ম্লান হেসে বলল: "সময়ে সময়ে এখনো যে পড়ি এমন সেন্টীমেণ্টাল হ'য়ে পড়ি!

গাঁ নির্মল ওর দিকে চেয়ে একটু হাসল, বলল: "জ্বরের আফটার ক্ট!'

*　　　*　　　*

অসিত কল্কিতে চুমুক দিয়ে বলল: "পরদিন সকালে ঠিক পৌনে দশটায় মোটর এল দেবদাদের ওখান থেকে। মধ্যে ছায়া আর প্রীতি। মনটা একটু খারাপ ছিল স্বপ্ন দেখে অবধি কিন্তু ছায়ার আলোভরা মুখখানি দেখবামাত্র কুয়াশা কেটে গেল—মুহূর্তে। ও নেমে প্রণাম ক'রেই আমার হাতে গুঁজে দিল একটি রূপার ধূপদানি ওঁ আর মা লেখা। ভারি সুন্দর দেখতে। একেবারে ঝকঝক করছে।

এ কী ব্যাপার!

প্রীতি বলল: 'আর কি? শাস্ত্রে যার নাম—গুরুদক্ষিণা। মেয়ে কি ছাড়বার পাত্রী? আর কী আদুরে জানেন না তো? বড় মোটরটি তো ওঁরই একচেটে। বাপ বেরুলেন ছোট মোটরে কাজে—মেয়ে বেরুলেন বড় মোটরে—'

আমি জোগালাম: 'অকাজে?'

ছায়া টুকল: 'গুরুদক্ষিণার নাম অকাজ? বা রে!'

"আদর করে বললাম: তা বলতে পারি কখনো? যে ডালে বসেছি তারই গোড়ায় কোপ? কিন্তু এমন সুন্দর জিনিষটি পেলে কোথায় শুনি?"

ছায়া বলল: 'অ-নে-ক দূরে—কলুটোলায় এক দোকানে।. পছন্দ হয়েছে তো আপনার?'

"বললাম: 'ফের আপনার?'

ছায়া হাসল শুধু মাসিমার দিকে তাকিয়ে। মাসিমা এলেন এগিয়ে ব্রীফ ধরতে: 'প্রথম দিনই তুমি বলা যায় কখনো?'

'গেলে প্রথমেই যায়—নৈলে কোনোদিনই না। কী বলো ছায়া!'

ও বলল: 'কী যে বলেন আপনি? আপনাকে—তুমি বলব? প্রাণ গেলেও না।'

বললাম: 'তার মানে পর হ'ল পর—এই তো?

'পর? কক্ষনো—'

'নয়ত কী? তোমার বাবাকে কী বলো?'

'বাপীকে? ওমা—তুমি ছাড়া আর কী বলব?'

'মামাদের?'

'আপনি যেন কী?'

'মাসিমাকে?'

'কী বলিয়ে নিতে চাইছেন?'

'যে, আপনার লোককে মানুষ তুমিই বলে। না ছায়া। ওটি হচ্ছে না। আমাকে "তুমি" না বললে গান শেখাচ্ছি নি—হাজারটা ধূপদানি দিলেও না। এই হ'ল আমার অল্টিমেটাম।'

ও কাতর চোখে তাকালো প্রীতির পানে। সে অগত্যা বলল: 'তা বল্ না—কী হয়েছে? দাদাকে তুমি বললে কী হয়?'

'দাদা সম্বন্ধটা সত্যি হ'য়ে দাঁড়ায়। সেটা ও চায় না যে।'

ও হেসে ফেলল: 'আপনি সত্যি—কী যে!—আচ্ছা আচ্ছা এবার থেকে আপনাকে আর আপনি বলব না।'

'ফেল্। বলো—এখন থেকে তোমাকে আর আপনি বলব না।

'আপনি ভা-রি—ইয়ে।'

'ইয়ে? কী ইয়ে?'

'ও হেসে ফেলল: 'নাছোড়বন্দ।'

'কে?'

'আপনি—না না তুমি।'

'ব্যস্—হাতে হাত দাও—সন্ধি। ওড়াও শাদা নিশান। কী? নিশান নেই? আচ্ছা, রুমাল রুমালই সই—ওড়াও না ছায়া।'

'কী যে ছেলেমানুষ আপনি—না না তুমি!' ব'লেই হেসে উঠল মাসি বোনঝি একজোটে।

নির্মল প্রমীলাও।

* * *

অসিত বলল: "পৌঁছলাম ওদের বাড়ি ঠিক দশটায়। দেবদার হঠাৎ একটু বিশেষ কাজ পড়ায় ভোরেই ছুটতে হয়েছে বারাসত একটা বাড়ির তদারকে। তবে 'এলেন ব'লে'—বলল প্রীতি।

"প্রতিমাকে দেখে মুগ্ধ হ'য়ে গেলাম। প্রতিমাই বলব, যদিও সে-সময়ে বলতাম প্রতিমা দেবী। আমাদের এই সম্ভাষণ সমস্যার সমাধান যে কবে হবে বাংলা ভাষায়! প্রতিমা আমার চেয়ে বয়সে ছোট ছিল তাই একটু সুবিধে হ'য়ে গিয়েছিল 'তুমি' চালাবার। তবে এসব সহজতায় সিদ্ধপুরুষ ছিল দেবদা। পরিচয়ের ঘরোয়া সর্বনামগুলি চালানো এত সহজ হ'ল ওরই গুণে। কিন্তু কী বলছিলাম?

প্রমীলা: প্রতিমা দেবীকে—থুড়ি প্রতিমাকে দেখে তুমি মুগ্ধ হ'য়ে গেলে।

অসিত: হ্যাঁ। তবে ওর মুখখানি ছিল এমন মধুর যে মুগ্ধ না হ'য়ে উপায় ছিল না। কিন্তু ছায়ার সঙ্গে প্রতিমার মুখের একটা পারিবারিক সাদৃশ্য থাকলেও এটা বুঝতে দেরি হয়নি যে দুয়ের রূপের ছিল জাতই আলাদা। বলতে কি, ছায়া ঠিক রূপসী ছিল না—অথচ অপরূপ! প্রতিমাকে বিধাতা ঢালাই করেছিলেন নিখুঁৎ ছাঁচে। চলনে বলনেও ওদের মিল ছিল না। কেবল একটা জায়গায় মিল চোখে পড়ত: মার মুখের একটা দৃঢ়তা এসেছিল মেয়ের চিবুকে। না ঠিক দৃঢ়তা নয় সে—সংযম বলাই ভালো। প্রতিমা ছিল সংযমী মেয়ে। কোনো বিষয়েই তার

ছিল না কোনোরকম উচ্ছলতা। শান্ত স্নিগ্ধ সুন্দরী মিষ্টভাষিনী। ছায়া ছিল সরল খোলা অথচ "গভীর জলের মীন" বলত ওকে ওর মামা কান্তি। তার সঙ্গেও আলাপ হ'ল। প্রিয়দর্শন মানুষটি। ছায়া মামাবাড়ির মধ্যে এই ছোট মামাকেই সবচেয়ে ভালোবাসত—মাসির পরে অবিশ্যি। কান্তি বিলেত গিয়েছিল অ্যাকচুয়ারি পরীক্ষা দিতে। কয়েকটা পরীক্ষা দিয়েছিল সেখানে। দু'একটা বাকি। সেগুলি না কি বাড়ি ব'সেই দেওয়া যায়। ছায়া তো হাতে স্বর্গ পেল। কান্তিও ওকে ছেড়ে থাকতে পারত না। মামা ভাগনির মধ্যে স্নেহের এ ধরণের নিবিড়তা আর দেখি নি আমি। কিন্তু প্রতিমার কথাটা আগে সেরে নিই।

দেবদা প্রায়ই গর্ব করত স্ত্রীর স্পষ্টভাষিতা নিয়ে। যা অসত্য মনে হবে তাতে প্রতিমা ভদ্রতার খাতিরেও সায় দেবে না। সায় দেওয়া কি—সময়ে সময়ে চুপ ক'রেও থাকবে না, বলে দেবে মুখের ওপরই। এইজন্যে প্রতিমা যখন এ পরিবারে বৌ হ'য়ে আসে তখন শ্বশুরবাড়ির লোকে ওকে খুব সুনজরে দেখতে পারেনি।

নির্মল: ওদের কি একান্নবর্তী পরিবার ?

অসিত: ঠিক একান্নবর্তী বলতে যা বোঝায় তা নয়—তবে দেবদা পোষ্য রাখত অনেক। 'বহুজনহিতায় বহুজনসুখায়' ছিল ওর জীবনের একটি মটো। ওর ভাইপো ভাইঝি বোন ভাগনে ভাগনি মাসি পিসি ছিল অগুন্তি। আর তারা থাকত প্রায়ই ওর ওখানে। বাড়ির তিন তলাটা ছিল তাদেরই এজমালি সম্পত্তি। দোতলাটা ছিল দেবদাদের জন্যে—অর্থাৎ দেবদা, প্রতিমা, ছায়া ওদের একটিমাত্র ছেলে রাজু বয়স তখন ১২—আর ছোটো মেয়ে লীনা বয়স তখন নয় কি দশ। হ্যাঁ—আর মাসিকেও এদের মধ্যেই ধরা চাই। বলতে কি প্রীতিও ছিল দু নৌকায় পা। ও বিয়ে করেনি—বলত করবেও না। ওরা ছিল খানিকটা ব্রাহ্ম আবহাওয়ায় মানুষ—কাজেই এতে কেউ কিছু মনে করত না—আরো

এইজন্যে যে প্রীতি ছিল ভাইদের খুব আদরের। মা তখন বেঁচে—যদিও বাপ নাই। তিন ভাই। ওরা থাকত ল্যান্সডাউন রোডে। দেবদারা হরিশ মুখার্জির রোডে। দুই বাড়িতে যাওয়া আসা ছিল বললে কিছুই বলা হয় না। বলতে হয় ল্যান্সডাউন রোড আর হরিশ মুখার্জির রোড ছিল যেন একই বাড়ির এপিঠ ওপিঠ। ছায়ার রোজ অন্ততঃ একটিবার করে যাওয়াই চাই ওর মামার বাড়ি। আর প্রীতির আসা চাই দাদার বাড়ি। দেবদাকেও দাদা ডাকত, দেবদাও ওকে ওর শিরোমণি বোন বলেই সনাক্ত করেছিল, অসঙ্কোচে আদর করত "সোনা' ব'লে—ঠিক যেমন মানুষ আপনার বোনকে করে। প্রীতি তো উজিয়ে উঠত দাদার কথা বলতে। দাদা আমাদের—ওদের নয়—বলত প্রায়ই। অর্থাৎ জামাই ছিল শাশুড়ির ছেলে, সত্যিই ছেলে—জামাই ব'লে কেউ তাকে কোনোদিন ভাবতে পারেনি—বড় ভাই অভিভাবক হর্তা কর্তা বিধাতা এই সবই ছিল তার উপাধি। দেবদা মাথা ছিল দুটি পরিবারের, ওর শ্বশুরবাড়ির আর নিজের বাড়ির। বলিষ্ঠ লোক তাই ভর সইত। আর উদার—তাই পারত মাথা হ'য়েও মাথা ঠিক রাখতে। গৌরবে প্রীতির মাটিতে পা পড়ত না—এ হেন পুরুষরত্নকে নিজেদের ব'লে লুটে নিতে পেরে। 'দাদাকে আমরাই তুলে নিয়েছি—ও পরিবারের দুধ থেকে ছানাটুকু টেনে। ওদের রইল ছানার জল। ওদের করবে দাদা দেখা-শোনা—আমাদের হ'ল আপন জনা।'

"এ ধরণের বিলি ব্যবস্থা আমার কখনো চোখে পড়ে নি মিলি। জামাই যে ঠিক 'আপন জনা' হ'তে পারে এ দেবদাকে না দেখলে আমি পুরো বিশ্বাস করতে পারতাম না। তবে এটা ও পেরেছিল দুটি কারণে! এক ও বড় বংশের ছেলে ব'লে। দুই—মাথার ঘাম পায়ে ফেলে ধীন হয়েছিল ব'লে। কাজেই আভিজাত্যের শাঁসটুকু রেখে আঁশটুকু পেরেছিল বাদ দিতে, জামাই হ'য়েও স্বজন বলতে বাধে নি। তবে

এও বলব যে 'স্বজন' ছিল ও শুধু শ্বশুর পরিবারেরই নয়। পরকে এত সহজে ও আপন ক'রে নিতে পারত যে ওর নাম রটেছিল বহুবান্ধব। সত্যি মিলি, জীবনে অনেক বিচিত্র মানুষই দেখেছি আমি, কত কিছুর মধ্যে দিয়েই তো যেতে হয়েছে এদেশে ওদেশে, কিন্তু তবু এ বললে অত্যুক্তি হবে না যে এরকম বহুবান্ধব বড় বেশি দেখি নি। তার ওপর যেমন উদার তেমনি সরল অথচ তেমনি তীক্ষ্ণবুদ্ধি। কেউ ওকে ঠকিয়ে পার পাবে! 'ঈশ—বড় সাধ্যি!' বলত প্রীতি প্রায়ই মাথা ঝাঁকিয়ে।

কিন্তু আর একটি গুণ ছিল এ মানুষটির সেটি আরো দুর্লভ। কৃতী পুরুষ সংসারে দেখা যায়—বলিষ্ঠ চরিত্রও। কিন্তু যারা নিজের চেষ্টায় বড় হয়েছে তাদের মধ্যে নিজেকে এভাবে আড়াল রাখবার প্রবণতা বড় বেশি চোখে পড়ে না। সব কাজেই দেবদাই ছিল ওদের কর্ণধার তাই হয়ত ঠিক কর্ণধারেরই মতন থাকত পিছনে ঘুপটি মেরে ব'সে। নিজেকে জানান দিত কদাচ নিতান্ত দায়ে না পড়লে নয়। তাই তো দেবদা আমার চোখেই পড়ে নি প্রথম দিকে। বলতে কি, কতদিন ওদের বাড়ি গিয়েছি এসেছি কিন্তু দেবদাই যে এতবড় পরিবারকে ধারণ ক'রে আছে এ মনেও হয়নি, আমি ব্যস্ত থাকতাম প্রধানত ছায়াকে নিয়েই—ঘণ্টার পর ঘণ্টা গান শেখাতে, এখানে ওখানে সেখানে নিয়ে যেতে। সর্বত্রই দেবদা ছেড়ে দিত ওকে—মোটরও হাজির অষ্টপ্রহর। কিন্তু কারুর কি কোনোদিনো মনে হয়েছে যে ওর সায়টা আছে ব'লেই সভাসমিতি জলশা হচ্ছে, খাওয়া দাওয়া মৌসুম চলছে, মোটর ছুটোছুটি করছে আমাদের তাঁবে? দেবদা ছিল কর্তা হয়েও যেন হুকুমবরদার।

কিন্তু তাই বলে কি অবজ্ঞাত? 'ঈ-শ' বলত প্রীতি সগর্বে। 'দাদার আমাদের মুখ একটু গম্ভীর হ'লে রক্ষে আছে? বাড়িশুদ্ধু লোকের চক্ষু চড়কগাছ!

কথাটা অক্ষরে অক্ষরে সত্যি। সবাই ওকে ভয় করত—কিন্তু না। তাকে ভয় বললে হয়ত একটু ভুল হবে, কেন না সে-ভয়ে কোনো ত্রস্তভাব ছিল না। তাই তাকে সমীহ বলাই হয়ত বেশি সঙ্গত। আর এ সমীহ এসেছিল সবার মনে ওর আশ্চর্য চরিত্রেরই গুণে—কর্তা হ'য়েও জুলুম জবরদস্তি করা ওর স্বভাববিরুদ্ধ ছিল ব'লে। সব রকম জাহিরিপনাই যার কাছে অপ্রীতিকর সে নিজেকে জানান দিলেই ক্রমশ লোকে তাকে জানেই।

এই জন্যেই ওর প্রীতি মৈত্রী দরদ এমন কি স্নেহও অনেক সময়েই অগোচর থেকে যেত। বাইরে থেকে দেখলে মনে হ'ত কী বলব··· আমাদের ভাষায় অনুচ্ছ্বাসী ব'লে একটা বিশেষণ আছে না? তাই। কিন্তু তাই ব'লে কি এতটুকু কম সজাগ? ফের বলতে ইচ্ছে হয় 'উ—শ!' শুনেছি আমাদের রক্তে একরকম সাদা বীজাণু আছে। তারা এমনি বেশ গাঢাকা হ'য়ে থাকে। কিন্তু কোনো রোগের বীজাণু রক্তে পদার্পণ করতে না করতে রৈ রৈ ক'রে উঠে প'ড়ে জানিয়ে দেয় 'দুয়ারে জাগিয়া রক্ষী'। দেবদার বন্ধুত্ব প্রীতি সখ্য ছিল এই জাতের। সম্পদে সহজ অবস্থায় সে একেবারে নিরুদ্দেশ না হোক আড়ালে আবডালেই থাকত। কিন্তু ওর কোনো প্রিয় বন্ধুকে কেউ একবার আক্রমণ করুক তো দেখি! অমনি দেখবে খোলা ভেঙে নেপথ্যের মানুষটি এসেছে একেবারে রণাঙ্গনে নিজমূর্তি ধ'রে। আমার নিজের ক্ষেত্রে এটা কীভাবে উপলব্ধি করেছিলাম বলছি যথাস্থানে আগে আলাপ-পরিচয়ের পর্বটার ছবিটা একটু আঁকতে চেষ্টা করি। তাহ'লে ব্যাপারটা বোঝবার একটু সুবিধেও হবে।

* * *

অসিত বলল: "মোটর ওদের গাড়িবারাণ্ডার সামনে দাঁড়াতেই কান্তি এসে ছায়ার হ'য়ে 'স্বাগতম্' জানালো ফুলের মালা দিয়ে গুরু-বরণ ক'রে। ওপরে যেতেই বৈঠকখানা ঘরে প্রতিমা/ নমস্কার ক'রে দাঁড়াল। ওর

মুখে খুশি যেন ঝ'রে পড়ছে। এতদিনে মেয়ের আদর হ'ল—গানের মতন গান শেখার ব্যবস্থা হ'ল। বলেছি ওরা তিন ভাই বোন। কিন্তু বাড়ির আদুরে মেয়ে ছিল ও-ই। ওর ছোট বোন লীনা ওকে ঠাট্টা ক'রে বলত 'আদুরী'। রাজুও দিদি বলতে অজ্ঞান। মাসির তো কথাই নেই। ও তো আসলে ছায়ার মাসি ছিল না, ছিল সখী। মাসিয়ানাটা দাঁড়িয়ে গিয়েছিল ওর সম্পর্কের মুখোষ—অবান্তর। যেটা আসল সেটা ছিল ওর সখিত্ব। আর সে যেমন তেমন সখিত্ব নয়—সইয়েরও বাড়া। মাসিমাকে নইলে 'আদুরী'র একদণ্ডও চলত না। প্রতিমারও না, বিশেষ মেয়ের দেখাশোনার কাজে। কারণ সে ছিল কাজের মানুষ—সমস্ত সংসারটাকে তাকে রাখতে হ'ত মাথায় ক'রে। তাই মেয়ে তার চক্ষের মণি হ'লেও চোখে চোখে রাখতে তো পারত না তাকে। সেইজন্যে আরো ছায়াকে দেখা-শুনোর ভার হাতেরপাঁচ মাসিকেই নিতে হয়েছিল।—ছায়ার পড়াশুনোর ব্যবস্থা কী হবে? মাসিমা এসে দেবে বিধান। গানের মাষ্টার কই? মাসিমাই খুঁজে বার করবে। এখানে ওখানে যাবে কোন্ সাজ প্রসাধন করে? মাসিমাই ঠিক ক'রে দেবে।

মাসিমাও কি ছিল তেমনি! জানিস মিলি, আমাদের অনেক চলতি ধারণাই যে ভুল সেটা আমরা প্রায়ই ভুলে যাই ধারণাগুলি বেশি চলতি হওয়ার দরুণ। একসময়ে আমিও ভাবতাম কোনো শিশুকে তার মা যেমন ভালোবাসে তেমন ভালো বাসতে আর কেউ পারে না—তা সে যত নিকটাত্মীয়ই হোক না কেন। কথাটা বেশির ভাগ ক্ষেত্রে খাটলেও বলব যে এ-ধারণাটার গোড়ায়ই গলদ। মোটামুটি, স্নেহের দুটো দিক: একটা প'ড়ে-পাওয়া আর একটা গ'ড়ে-নেওয়া। সংসারে সচরাচর প্রথমটারই আদর—কেন না সব আগে চোখে পড়ে এইটেই। কিন্তু বিকাশে মানুষ যতই উজ্জ্বল ও বিশিষ্ট হ'য়ে ওঠে ততই সে দাম দেয় দ্বিতীয়টার। যে-স্নেহ প্রকৃতির কাছ থেকে পাওয়া নয় তার পুষ্পিত

পল্লবিত হ'তে হয়ত সময় লাগে, কিন্তু একবার যখন সে সমৃদ্ধ হ'য়ে ওঠে তখন টের পেতে দেরি হয় না যে এই বিকাশই স্নেহের বড় দিকটার প্রতিচ্ছবি। কী বলতে চাইছি! এই ধর না কেন মাতৃস্নেহ। এ-স্নেহের মধ্যে যে স্থূল মমত্ব বোধ আছে তা নিয়ে নাটুকে ভঙ্গিতে বেশ দু'ফোঁটা চোখের জল ফেলা গেলেও এ মমত্ববোধের জন্যে গৌরব করাটা নিশ্চয়ই অগৌরবের—কেন না এ হ'ল আসলে পরাধীন, পরবশ। স্বাধীন আত্মবশ স্নেহ বলব তাকেই যার পথের পাথেয় জোগায় মমতা না—অন্তরের আলো। কিন্তু হ'লে হবে কী, গড়পড়তা মা-দের মাতৃস্নেহে এই 'আমার আমার' ভাবটাই প্রখর হ'য়ে উঠে থাকে—কাজেই স্নেহের শ্রেষ্ঠ রূপ সেখানে প্রায়ই তেমন নিটোল হ'য়ে ফুটে উঠতে পায় না। অন্য ভাষায় শাঁসের ওজন কম পড়ে আঁশের আধিক্যে।

প্রীতির ক্ষেত্রে কিন্তু দেখতাম শাঁসের ভাগটাই বেশি—বিধাতাকে ধন্যবাদ। তবে এ না হয়েই উপায় ছিল না। ছায়াকে ও যে শুধু পাশে পেয়েছিল তাই নয়—কাছে টেনেছিল।

প্রতিমার সঙ্গে প্রীতির স্নেহ—সেও ছিল বড় মধুর। তবে তার ছন্দ ছিল অন্য। হয়েছিল কি, প্রতিমা ছায়ার মতন অসামান্য মেয়ে না হ'লেও গড়পড়তা আদৌ নয়। যেমন ধর্—তার মধ্যে দেখানেপনার একান্ত অভাব। জানত সে যে মেয়ে কিন্নরকণ্ঠী—কিন্তু কোনোদিন কি তাকে ভুলেও এ নিয়ে এতটুকু জাঁক করতে দেখেছি? নিজের ছেলেমেয়ে নিয়ে বড়াই করা ও ভারি অপছন্দ করত। বলত প্রায়ই—'আমার ছেলেমেয়েকে যদি অমিই ক্রমাগত সার্টিফিকেট দেই তবে অপরে আর দেবে কী? তার ওপর ধর্, সেবায় ছিল সে অদ্বিতীয়া। এটা প্রীতি পারত না। কারুর কোনো কঠিন অসুখ হলে ও কেঁদেই অস্থির—সেবা করবে কখন? প্রতিমা ছিল এখানে খুব শক্ত, আঁটসাট। একবার নাকি দেবদার খুব সংকট অসুখ হয়। তখনো প্রতিমার চোখে কেউ জল দেখে নি।

দিনের পর দিন ও সেবা ক'রে গেছে মরণাপন্ন স্বামীর, কিন্তু মুখ দেখে কেউ কি টের পেল কী ঝড় বইছে ওর বুকে ? অথচ দেবদাকে যে ও কী রকম ভালোবাসত জানি তো।

দেবদাকে ভালো না বেসে অবিশ্যি উপায়ও ছিল না। শুধু আত্মীয় বন্ধুরাই নয়, দুদিনের আলাপীও ওকে ভালোবেসেছে। কত লোকের যে ও উপকার করেছিল, কত দান যে ওর ছিল, কত নিরন্নের যে অন্নসংস্থান হয়েছিল ওর করুণায়—তার খবর এমন কি প্রতিমাও রাখত না। বেশ মনে আছে, দেবদার মৃত্যুর পরে এক অপরিচিত ট্যাক্সি ড্রাইভার একবার ছায়া ও আমাকে নিয়ে ট্যাক্সি চালাতে চালাতে পথে ঝরঝর ক'রে কেঁদেই অস্থির: 'এঞ্জিনিয়র বাবুর কৃপায়ই আজ আমার স্ত্রীপুত্র খেতে পাচ্ছে বাবু!' ছায়া ট্যাক্সিভাড়া দিতে যেতে ও হাতজোড় ক'রে বলল: 'আপনারা আমার অন্নদাতা মা, আপনাদের কাছে ভাড়া? যখন দরকার হবে ডাকবেন হাজির থাকব।'

তার উপরে কী সততা! কনট্রাকটরিতে বাড়ি তৈরি করত তো। কিন্তু ওর অতিবড় শত্রুও কখনো বলেনি—কোনোদিন হিসেবে এক পয়সারও ওর গাফিলি হয়েছিল। একবার না কি এক মক্কেল ওকে ভুল ক'রে কয়েক হাজার টাকা বেশি দেয়। দেবদা বাড়তি টাকাটা বাড়ি গিয়ে ফেরৎ দিয়ে আসে। সে তো অবাক্! যে-টাকা বাস্নসাৎ করলে কেউ টেরও পেত না—যে-টাকাকে ও সহজেই মনে করতে পারত নিজের প্রাপ্য ব'লে—সে-টাকাও কি না ও হাতে পেয়ে ফিরিয়ে দিল!

কিন্তু তাই ব'লে ভেবে বসিস নে যেন দেবদার অর্থে বিমুখতা ছিল এতটুকুও। সদুপায়ে টাকা উপায় করতে ওর এতটুকু অরুচি ছিল না। মহাভারতে আছে একদল বৈরাগী ব্রাহ্মণ একবার দল বেঁধে যুধিষ্ঠিরের কাছে গিয়ে তাঁকে বলেছিলেন যে এমন কি ধর্মের জন্যেও অর্থাগমের চেষ্টা

করা ভালো না, কেন না পাঁক মেখে তাকে ধুয়ে ফেলার চেয়ে আরো ভালো পাঁক না ছোঁওয়া। আমার নিজের জীবনে অর্থ সম্বন্ধে এই ধরণের একটা তীব্র বিতৃষ্ণা আছে মিলি। ছেলেবেলা থেকে আমি আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে অর্থের জন্যে এত হীনাচার দেখেছি যে যৌবনে পা দিতে না দিতে আমার ক্রমাগতই মনে হ'ত ব্রাহ্মণদের ঐ শ্লোকটি :



'ধর্মার্থং যস্য বিত্তেহা বরং তস্য নিরীহতা
প্রক্ষালনাদ্ধি পঙ্কস্য শ্রেয়ো ন স্পর্শনং নৃণাম্।'

কিন্তু দেবদার মধ্যে তো এধরণের কোনো ধনে-বিমুখতা ছিল না। ও টাকা ভালোই বাসত বৈকি—যদিও লুব্ধ সঞ্চয়ের জন্যে নয়—ঐ যে বললাম বহুজনহিতায় বহুজনসুখায়। কী ক'রে অত পোষ্য পুষতই বা অর্থাগম না হ'লে? এহেন লোকের মধ্যে যখন দেখি অর্থাকাঙ্ক্ষা সত্ত্বেও উপার্জনে শুদ্ধাচার তখন মনে শ্রদ্ধা আসে। বলতে কি, অর্থে আমার নিজের বিতৃষ্ণা থাকলেও আমি জানি খতিয়ে সমাধান এ-পথে নয়। অর্থ বিনা যখন ভদ্রভাবে জীবনযাত্রা অসম্ভব, তখন মানতেই হবে যে পন্থা অর্থ-বৈরাগ্য নয়—অর্থে অনাসক্তি। বলছি না, দেবদার ছিল এই বিশুদ্ধ অনাসক্তি। কিন্তু অর্থে আসক্তি থাকা সত্ত্বেও যে অর্থসম্বন্ধে ও কোনোদিন হীনাচরণ করেনি এটা তো কম কথা নয়। উদ্যমী পুরুষ-সিংহ ছিল ও স্বভাবে। লক্ষ্মী ওকে করেছিলেনও কৃপা। কিন্তু শনির ও ছায়াও মাড়ায় নি অর্থলোভে। টাকা ও উপায় করত, কিন্তু মাথা খাটিয়ে—ফন্দিবাজি ক'রে না।

ফলে প্রতিমা খুব সুখী হয়েছিল বিবাহে। সতীর পাতিব্রত্যের সুন্দর উপচার পবিত্র হ'য়ে উঠত শ্রদ্ধার সৌরভে। পূর্বজন্মে অনেক শিবপূজো ক'রে দিদি পেয়েছে এমন স্বামী—বলত প্রীতি প্রায়ই সগর্বে। 'এত মেয়ে তো আছে—আর মাথা-গুনতিতে স্বামীও আছে প্রায় ততগুলিই। কিন্তু এমন আর একটি মাথা দেখাও দিদি—ই—শ্।' এই পুরশ্চারণের

প্রায়োক্তি ক'রে ও সময়ে অসময়ে শাস্তিপাঠ করত একটি মেয়েলি প্রবচনে 'শতপুত্রসম কন্যা যদি কন্যা পাত্রে পড়ে।'

কথাটা মিথ্যে না। কারণ বলেছি, দেবদা ছিল প্রীতিদেরও অভিভাবক বলতে কি, ওর পরিবার বলতে ও বুঝত নিজের একান্নবর্তী পরিবারকে নয়—বুঝত শ্বশুর পরিবারকে। তাই বলছিলাম ঠিক এধরণের জামাই আমি আর দেখি নি একটিও। আত্মীয়রা ছিল ওর বহিরঙ্গ, কুটুম্বরাই হ'য়ে উঠল অন্তরঙ্গ। অর্থাৎ নিজের গৃহে দেবদা একটু পরই হয়ে গিয়েছিল পর-রা আপন হ'য়ে ওঠার দরুণ। অবিশ্যি দেবদার আত্মীয়রা—ভাই-বোন ভাইপো ভাইঝিরা—যে ওকে ভালোবাসত না তা নয়। কিন্তু তারা ওকে যেভাবে চাইত সেভাবে পেত না। না-পাওয়ার আরো একটা কারণ ছিল। তারা ছিল—বেশির ভাগই—মামুলি ছাঁচে গড়া। দেবদা ছিল—খানিকটা বিলেতফের্তা হওয়ার জন্যেও বটে খানিকটা শ্বশুরালয়ের ছোঁয়াচেও বটে—ব্রাহ্ম না হোক, ব্রাহ্মভাবাপন্ন। অর্থাৎ ভাগবত ভক্ত ভগবান্ নিয়ে ছিল না তার মাথাব্যথা—সমাজসংস্কার, রাজনীতি কালচার এই সবক্ষেত্রেই ছিল ওর গতিবিধি।

নির্মল বলল: অর্থাৎ যেমন আজকালকার অধিকাংশ উদারপন্থী হিন্দুরা আর কি।

প্রমীলা আপত্তি করল: "কক্ষনো না। হিন্দুরা যতই উদার হোক ব্রাহ্মদের সঙ্গে তাদের একটা প্রভেদ থাকবেই। ও তেল জলে মিশ খায় না।"

নির্মল: তা কী ক'রে বলছ তুমি মিলি? দেবকুমার বাবুর শাশুড়ি শালা শালীরা—

প্রমীলা: ওঁরা তো ব্রাহ্ম ছিলেন না।

হিন্দুই তো ছিলেন। না, মিথ্যে শাসিয়ো না আমাকে। ব্রাহ্ম আচার্যদের ঐ দাড়ি নেড়ে পরমপিতাকে নিয়ে বেদীতে চ'ড়ে বিলিতি

ভঙ্গিতে নাটুকে উপাসনার কথা ভাবতেও আমার গার মধ্যে কেমন করে।

নির্মল : 'বিলেত দেশটা মাটির' হ'লেও 'বিলিতি' ব'লে তোমার এ-কটাক্ষ খুব অন্যায় মিলি! কারণ আজকের দিনে আমাদের মধ্যে কে আছেন হাণ্ড্রেডপার্সেণ্ট হিন্দু? আমাদের সামাজিক চালচলনের গায়ে কতখানি বিলিতি হাওয়া লেগেছে খবর রাখো? না, মামুলি হিঁদুদের সঙ্গে পারো ঘর করতে যে বলছ?

প্রমীলা : তা হয়ত পারলেও পারতে পারি—কিন্তু হাণ্ড্রেডপার্সেণ্ট ব্রাহ্মদেরও যে ছায়াও মাড়াতে পারি নে এ নিশ্চয়—যাও যাও বোলো না ওধরণের উদার কথা—আমার গা জ্বালা করে। যারা প্রিয়-বিয়োগেও সকালে সন্ধ্যায় উপাসনা করে নিরাকার পরম পিতাকে—ব্যথার প্রার্থনা ঘরভরা লোক ডেকে শোনায় সার্মন ঝাঁকিয়ে—কথায় কথায় কেবল পৌত্তলিক ব'লে ঘা দেয় আমাদের—তাদের মুখে উপনিষদের 'ব্রহ্মরূপাহি কেবলম্' শুনলে আমার মনে হয় ঠিক যেন ভূতের মুখে রাম নাম। উপনিষদের উপাসকেরা কি এই ম্লেচ্ছ দেখানেপনা চাইতেন বলতে চাও? আচ্ছা অসিদা, তুমিই বলো তো ভাই নিরপেক্ষ হ'য়ে। ব্রাহ্মদের মধ্যে ভালো লোক নেই এমন কেউ বলছে না, কিন্তু তাই ব'লে গভীরতায় ভাবুকতায় অন্তর্দৃষ্টিতে এরা কি শ্রেষ্ঠ হিন্দুদের কাছাকাছিও আসতে পারে? না—এ আমি কিছুতে মান্‌ব না যে হিন্দু ও ব্রাহ্মরা একেবারে 'ভাইভাই এক ঠাঁই ভেদ নাই ভেদ নাই'। আমার মনে হয় ব্রাহ্মদের মধ্যে এমন একটা কিছু সংকীর্ণতা ছিল যার দরুণ তারা ব্রাহ্ম হ'তে বাধ্য হয়েছে। দুধে এক ফোঁটা টক রস দিলেও যা দাঁড়ায় সে-বস্তু আর দুধের সঙ্গে মিলতে পারে না। ঠিক তেমনি ঘটেছে ব্রাহ্মদের বেলা। তাই একসময়ে ওরা হিন্দুসমাজের মধ্যে ছিল, এই জাতীয় যুক্তি আমার কাছে মেকি মনে হয়। একসময়ে মিল ছিল ব'লেই প্রমাণ হয় না যে আজকের গরমিলটাও সেই মিলেরই নামান্তর।

নির্মল : রোসো মিলি, তোমার তীব্র ভঙ্গিটা—

প্রমীলা : না—আমার মুখ চেপে ধরতে পাবে না তুমি। তীব্র তাই হয়েছে কি?—বলো তো অসিদা—ওঁর এ কি একটা কথা হ'ল যে ব্রাহ্ম আর হিন্দু একই পদার্থ। কক্ষনো না। ওদের মধ্যে এমন কিছু একটা নেই কি যা দেখলে দস্তুর ম'ত গার মধ্যে রি রি ক'রে ওঠে?—যত সব মুখে বড় বড় কথা ব'লে কাজে পুনর্মুষিকের দল! শ্রেষ্ঠ হিন্দুদের মতন আশ্চর্য উদারতা থাকতে পারে ওদের কখনো! সবতাতেই বদহজম—পেটরোগা কোথাকার! একটুকু হাসিঠাট্টা সয় না। কী? না অশ্লীল! আ মরণ! দুর্নীতির ফুলের ঘায়ে দশাসই জোয়ানদের মূর্চ্ছা যেতে লজ্জা করে না? অন্তরে যাদের ময়লা বেশি তারাই কি বেশি তড়্‌পে ওঠে না কি বাইরে ময়লা দেখলে? এমন কি দাদামশায় নাৎনির রসিকতাও ওঁদের কাছে কুরুচি। রাগ হয় না, বলো তো?

অসিত হেসে ওর কাঁধে একটা হাত দিয়ে বলল : অত তেতে উঠতে নেই দিদি। নির্মল একথা নিশ্চয়ই বলতে চায় কি যে ব্রাহ্মরা আসলে হিন্দুদেরেই একটা ধোপদুরস্ত সংস্করণ। না, জাত ওদের খানিকটা গেছে একথা না মানলে সত্যের অপলাপও হবে বৈ কি। সারা জগতের সেরা মনীষীদের একটু কাছ থেকে দেখতে পেয়ে এবিষয়ে আমার আজ আর সন্দেহ নেই যে হিন্দুদের—মানে শ্রেষ্ঠ হিন্দুদের— ভাবুকতা, অন্তর্দৃষ্টি, উদারতা—আরো অনেক কিছু একটা আশ্চর্য জিনিব; ব্রাহ্মদের ছোঁয়াচে এসে এই ভাবুকতায় হয়ত আমাদের একটু ভাঁটা পড়ে এসেছে—কিন্তু উদারতা নিয়েছে অনেকখানি টাল সাম্‌লে। এ আমি যেন নতুন ক'রে উপলব্ধি করেছিলাম দেবদার মতন কয়েকটি মানুষকে কাছ থেকে দেখে—বন্ধুভাবে পেয়ে। অন্তত দেবদা নিজের মেয়ে বা স্ত্রী সম্বন্ধে যেভাবে উদার ছিল কোনো ব্রাহ্ম তার মেয়ে বা স্ত্রী সম্বন্ধে ঠিক সেভাবে উদার হ'তে পারত ব'লে আমার মনে হয় না। আর এই যে-অমিল সেটা

বাইরের অমিল নয়—এখানে মূল নিয়েই টানাটানি। ক্রমওয়েলের যুগে সেই এক ভদ্র মহিলার কথা মনে পড়ে যাঁকে এক ভদ্রমহোদয় একটি মোজা উপহার দিতে তিনি অশ্লীল ব'লে রেগে অস্থির: 'You forget sir, a lady can have no legs'!"

নির্মল হেসে বলল: "এ ঠাট্টা।"

প্রমীলা হেসে গড়িয়ে পড়ে হাততালি দিয়ে: "ঠাট্টা? স্বচক্ষে হাজারো ব্রাহ্মদের শুচিবাই দেখে তবু তুমি বলো এমন কথা? সত্যিই অসিদা ব্রাহ্মদের দেখলে বার বারই মনে হয় এই সব রুচিবাগীশদের কথা। তাই তো শ্রীকৃষ্ণের অশুচি নামগন্ধে ওঁরা আঁৎকে উঠে পরব্রহ্মের নাম নিয়ে আচমনে ব'সে যান শুদ্ধিলাভ করতে।"

নির্মল ফের আপত্তি করে: "তোমার ভাষার মিলি আর যে দোষই থাক শুচিবাই যে নেই, এ নিশ্চয়।"

অসিত মৃদু হেসে বলে: "এখানে ওকে বকলে কিন্তু সইব না কারণ এখানে আমি ওর দিকে পুরোপুরিই। ও কথা কয়েছে যদিও একটু আঁতে ঘা দিয়ে, তবু একথা অস্বীকার করবার উপায় নেই যে হিন্দু ধর্মের একটি শ্রেষ্ঠ বিকাশ তারা বুঝতে পারে না যারা কৃষ্ণের নাম শুনলে দেয় কানে আঙুল। ব্রাহ্মদের সব চেয়ে বড় অন্ধতা—disability—এই খানেই যে কৃষ্ণকে ওরা চিনে নিতে পারল না—কৃষ্ণ যাকে নিয়ে হিন্দুর রসলোকে আনন্দের গৌরবের মহিমার মাধুর্যের যুগান্তর ঘ'টে গেছে কবে থেকে। সত্যি নির্মল, বলে ও নির্মলের দিকে সোজা তাকিয়ে "বলতে কি, আমার সময়ে সময়ে এমন কথাও মনে হয়েছে যে কোনো আধ্যাত্মিকতারই মর্ম-বাণীটি তারা আদৌ ধরতে পারে কিনা যারা কৃষ্ণকে ডিশমিশ করল অশ্লীল ব'লে—যাঁকে ধ্যান ক'রে হিন্দুর রুচিবোধ বদলে গেছে, যাঁর নাম ক'রে হিন্দুর শিখর সঙ্গীত কীর্তনের অখণ্ড রসসিন্ধু যুগ যুগ ধ'রে ব'য়ে চলেছে, যাঁর কীর্তিকলাপ বর্ণনায় বৈষ্ণব পদাবলীর আনন্দ ঝর্নার মতন ঝ'রে-

পড়ল শতলক্ষ ধারায়—যাঁকে স্তব ক'রে মহা-বৈদান্তিককেও জলভরা চোখে হার মানতে হ'ল :

বংশীবিভূষিতকরান্নবনীরদাভাৎ
পীতাম্বরাদরুণবিম্বফলাধরোষ্ঠাৎ
পূর্ণেন্দু সুন্দর মুখাদরবিন্দনেত্রাৎ
কৃষ্ণাৎ পরং কিমপি তত্ত্বমহং ন জানে !

(কীর্তনের সুরে)

বাঁশরী যাহার দোলে করে—তনু-আভা যার নবনীরদ সম,
পীত অম্বর কটিতটে মরি—অধরে অরুণবিম্ব ফলে.
পূর্ণ-ইন্দু নিভ সুন্দর মুখখানি—আঁখি কমলোপম.
হেন কৃষ্ণের পরে কী তত্ত্ব—আমি তো জানিনা অবনীতলে।

ব'লে একটু থেমে অসিত বলল : একটু উচ্ছ্বাস মতন শোনালো হয়ত, কিন্তু বিশ্বাস করিস এ উচ্ছ্বাস নয়। ব্রাহ্মরা যে হিন্দুর রসতত্ত্বের গভীরে পৌঁছতে অক্ষম তার সব চেয়ে সাংঘাতিক প্রমাণ তাদের এই কৃষ্ণ-বিমুখতা। কারণ ভুললে চলবে যে না, এ-বিমুখতার বিষফোড়া একটা মজ্জাগত রোগের ফল—*Symptom*: কাজেই যতদিন ওরা রোগটাকে রক্তে মজ্জায় পুষে রাখবে ততদিন ভাবের গভীরে পৌঁছবার শক্তি বা দৃষ্টি পাবে না হাজার 'অসতো মা সদ্‌গময়' ব'লে হুঙ্কার দিলেও ফল হবে এই যে ওরা বেদ উপনিষদ প'ড়ে বের করবে সে সবের রকমারি মনগড়া অর্থ—অথচ নিজেদের মন ভোলাবে এই ব'লে যে রসের ভাবের গভীরে ওরা কবে পৌঁছে গেছে শুধু মনের জোরালো পাসপোর্টের দৌলতে। ব্রাহ্ম বলতে কিন্তু এখানে আমি জনকয়েক ব্রাহ্ম সমাজীর কথা বলছি না মনে রাখিস—বলছি সেই ভাবের ভাবীদের কথা যারা ব্রাহ্ম সমাজের আওতায় বেড়ে উঠেছে। —কিন্তু" ব'লে অসিত প্রমীলার দিকে তাকিয়ে বলল : "এ হ'ল ওদের অক্ষমতার দিকটার কথা, দৈন্যের নিদানতত্ত্ব। ওদের

বিচার করবার সময় শুধু এই দিকটার পরে জোর দিলে দৃষ্টিভ্রম ঘটবে—ওদের দানের দিকটাও দেখতে হবে।"

প্রমীলার প্রসন্নমুখে ছায়া এল, বলল: "কী আবার এমন দান শুনি?"

অসিত: অনেক দান। মনে রাখিস ব্রাহ্মসমাজ না থাকলে একটা মস্ত শক্তিমন্ত শিক্ষিত দল হিন্দুসমাজ থেকে চিরদিনের জন্যে বেরিয়ে যেত। এ-ও ভুললে চলবে না যে হিন্দুসমাজে ধর্মের গভীর তত্ত্বের দিকে সম্পদ অফুরন্ত হ'লেও বাইরে লোকাচারের কোঠায় এসে জমেছিল যত রাজ্যের হীনতা, শুচিবাই, গতানুগতিকতা, কুসংস্কারের জঞ্জাল। এমন কি অসহিষ্ণু নিষ্ঠুরতাও প্রশ্রয় পাচ্ছিল যা জীবন্ত হিন্দুসমাজে কোনো দিন আশ্রয় পায় নি। ব্রাহ্মরা এদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে অনেক আবর্জনাই ঝেঁটিয়ে সাফ ক'রে দিয়েছিল। মানি ওরা য়ুরোপের অনেক অসার দেখানেপনার ফ্যাশন টেনে এনেছিল সে সময়ে—কিন্তু এটাও সঙ্গে সঙ্গে মানতেই হবে যে শুধু অসারতার ওরা আমদানি করে নি, য়ুরোপের ভালো অনেক কিছুও এনেছিল সেই সঙ্গে। শুধু স্ত্রীশিক্ষাই নয়—স্ত্রী-স্বাধীনতা, পারিবারিক সম্বন্ধে হৃদ্যতা, হিঁদুয়ানির অনেক অন্ধ তামসিকতাকে ঝেঁটিয়ে সাফ করা—আরো কত কী। যতই রাগ করিস ওদের খুঁৎগুলো দেখে, একথা অস্বীকার করার পথ নেই যে একসময়ে বিশেষ ক'রে আমাদের মেয়েরা অনেকখানি হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছিল ওদেরই বলিষ্ঠ সংস্কারে—যে মুক্তিলাভের সরিক আজ সমস্ত হিন্দুসমাজ। আজ যে মেয়েরা কাব্যে শিল্পে সঙ্গীতে বাঙালির গৃহস্থালিতে দীপ জ্বালতে পারছে তার মূলেও রয়েছে ব্রাহ্মদের সংঘবদ্ধ চেষ্টা। কারা সব আগে টের পেয়েছিল যে সমাজের ঘরে ঘরে আলো জ্বলে না যদি মেয়েদের রাখা হয় অন্ধকারের দ্বীপান্তরে?—ব্রাহ্মরা। একথা আজকের দিনে আমরা প্রায় ভুলতে বসেছি বটে—যখন হিন্দু মেয়েরাও জ্বালল তাদের আলো শুধু ঘরে নয়, বাইরেও। কিন্তু সত্য যা

লক্ষ্য তাকে মানতেই হবে কৃতজ্ঞচিত্তে যে এমন কি কয়েক বৎসর আগেও ও-আলো জ্বালানো ছিল একটা দুঃসাহসের কাজ। স্বচক্ষে তো দেখেছি এই সেদিনের যে মেয়েরা পথে ঘাটে বেরুলে লোকে তাদের কী লাঞ্ছনা করত! কিন্তু তবু যে ব্রাহ্ম মেয়েরা পিছপাও হয় নি এজন্যে তাদের সাধুবাদ দেব না তো দেব কাকে? অবিশ্যি এর ফলে নানা অসার ফ্যাশনও এসেছিল মানি। কিন্তু পথ যখন তৈরি হয় নি তখন চলতে গিয়ে হোঁচট না খায় কে—বিপথে কাঁটা কাঁকর না ফোটে কার পায়ে? কিন্তু তাই ব'লে কোনো অচিন্ত পথেই পা বাড়াব না এ-মনোভাবের কী নাম দেব—তামসিকতা ছাড়া? অথচ সে-যুগে এই তামসিকতাই পেয়ে ব'সে ছিল হিন্দুসমাজকে বিশেষ করে স্ত্রীশিক্ষার আর কালাপানি পার হবার বেলায়। এইখানেই ব্রাহ্মরা এসেছিলেন আলোর অগ্রদূত হ'য়ে, নির্ভীকতার ঝাণ্ডা উড়িয়ে।

প্রমীলা: তা বটে, কিন্তু ওরা কি সঙ্গে সঙ্গে একটা দারুণ অসহিষ্ণু মনোভাব টেনে আনে নি যার মূলে ছিল মোহ?

অসিত: একথা খানিকটা সত্যি। কিন্তু এ হ'ল সে যুগের ছবির মাত্র একটা দিক। কোনো একপেশো দৃষ্টি দিয়ে দেখলে কোনো সমাজ-চিত্রকেই যথার্থ দেখা হয় না। দেখতে শেখা চাই সমগ্রভাবে। আমি তো অস্বীকার করি নি ওদের একদেশদর্শিতা, অসহিষ্ণুতা, আরো নানান্ অক্ষমতা—যেমন হিন্দুধর্মের অনেক গভীর ভাবুকতার মর্মগ্রহণ করতে না পারা। কিন্তু এরও কারণ ছিল। হয়েছিল কি, ওরা বিলেত থেকে যে-বস্তুটির আমদানি করেছিল তার নাম morality, নৈতিকতা—আধ্যাত্মিকতা ওরকে spirituality বলতে হিন্দুর আত্মা যা বুঝেছে সে বস্তু নয়। কিন্তু এখানেও মনে রাখতে হবে একটা কথা: যে, হিন্দুর আধ্যাত্মিকতার ব্যভিচার সে-সময়ে ব্যাপক হয়েছিল খুবই বেশি। উপলব্ধির আলো কোথাও ছিল না বলি না—কিন্তু আচারের গতানু-

গতিকতাই উঠেছিল ফেঁপে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে— মন্ত্রে, তন্ত্রে, পূজা পার্বণে। যখন আগাছা খুব বেড়ে ওঠে তখন সময়ে সময়ে সব দিতে হয় পুড়িয়ে, তাতে অনেক সুন্দর লতাপাতা ফুলেরও হয় অকালমরণ। কিন্তু এর তো চারা নেই ভাই। মানুষের সমাজে জঞ্জাল যখন ফেঁপে ওঠে তখন কোন্ ছাইয়ের নিচে একটুখানি শস্য আছে এ নিয়ে ভাবনা সুরু করলে পথ চলাই হয় দায়, নয় কি? তাছাড়া সংস্কার মানেই খানিকটা নিষ্করুণ হওয়া। নৈলে হাত পা গুটিয়ে ঠুঁটো জগন্নাথ হয়েই ব'সে থাকতে হয় চিরকাল্। ব্রাহ্মদের মধ্যে সেসময়ে এসেছিলেন একদল সজ্জন মানুষ। তাঁদের নৈতিকতা একটু বেশি বাতিকগ্রস্ত হ'য়ে পড়েছিল বটে—কিন্তু সে-সময়ে এ না হ'য়েই উপায় ছিল না, কেন না বিদ্রোহ মাত্রই একটু বেশি ঝোঁকালো হ'য়ে থাকে। তাই ওটুকু অগুণ ক্ষমা করতেই হবে সে-সময়কার ব্রাহ্ম বিদ্রোহীদের প্রাণশক্তির গুণের মুখ চেয়ে।

প্রমীলা: কিন্তু এ-প্রাণশক্তি তো হিন্দুদের মধ্যেই ছিল।

অসিত: কিন্তু নিভে আসছিল যে! আর ঠিক সেই জন্যেই তো তাঁদের কাছে আমাদের কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত। কেন না প্রাণশক্তির সবচেয়ে বড় শত্রু হ'ল গতানুগতিকতা, আর সে যুগের ব্রাহ্মরা দাঁড়িয়ে ছিলেন সব রকমের মামুলি আচারের বিরুদ্ধে। হিন্দুসমাজে আলোর হাজারো স্ফুলিঙ্গ জ্ব'লে উঠেছিল এই জন্যেই এই সংঘর্ষে। আর সেই আলোরই প্রভাবে সে-যুগের ব্রাহ্মদের মনপ্রাণ উর্বর হ'য়ে উঠেছিল নানা নৈতিক গুণের ফসলে—তাঁদের ত্যাগে, তাঁদের নিষ্ঠায়, তাঁদের সত্যপরতায়, আদর্শবাদে, স্ত্রীজাতির প্রতি শ্রদ্ধায়—

প্রমীলা: যদি বলি এ-ফসল কালধর্মে আপনিই ফলত?

অসিত: তা হয় না; ধর্মকে ধারণ করতে হ'লেই তার আধার চাই। প্রদীপ নৈলে শিখা জলবে কোথায়? না, শোন্ মিলি, এ সত্যি আমার তর্কের কথা নয়। ব্রাহ্ম সমাজের যে-দুর্দিন আজকের দিনে আমাদের

কাছে এত প্রত্যক্ষ, শুধু তার এজেহারে সে-সমাজের সুবিচার হ'তে পারে না। এইজন্যেই অনেক চিন্তাশীল হিন্দুও আজকের দিনে ব্রাহ্ম সমাজের সম্বন্ধে অবিচার ক'রে বসেন।

প্রমীলা: চিন্তাশীল হিন্দু?

অসিত: যেমন ধর শরৎচন্দ্র। আমি তাঁর কত বড় ভক্ত তা তোরা জানিস। তবু একথা আমাকে সত্যের খাতিরে বলতেই হবে যে তিনি ব্রাহ্ম সমাজের ভাবলোকে প্রবেশ করেন নি—অন্তত অন্তঃপুরে নয়। তাই তাঁর হাতে অচলা বিজয়া ফুটল না তেমনটি হ'য়ে যেমন ফুটল রমা, বিন্দু। এদের উনি ভালোবেসেছিলেন, ওদের করেছিলেন বিচার।

কিন্তু ব্রাহ্ম মেয়েরা অচলাও নয় বিজয়াও নয়। তারা যা তা-ই। তারা হিন্দু মেয়েদেরই মতন মানুষ কেবল একটু বেশি জীবন্ত, কেননা মুক্ত। অন্তত প্রথম দিকে তারা যে হিন্দু মেয়েদের চেয়ে জীবন্ত ছিল সাহসী ছিল এ না মানলে সত্যের অপলাপ হবে। আমরা ছেলেবেলায়ও এটা অনুভব করেছি, স্বচক্ষে দেখেছি হিন্দু মেয়েরা কেমন ক'রে বদলে যেতে লাগল ব্রাহ্ম মেয়েদের দেখাদেখি। আজকের দিনে মিলি তোর সঙ্গে বেথুনের মেয়েদের তফাৎ চুলচেরা হ'তে পারে, কিন্তু সে সময়ে কোনো হিন্দু জমিদার-গিন্নির সঙ্গে কোনো ব্রাহ্ম লেডী ডাক্তারের তফাৎ ছিল আশমান জমীন।

প্রমীলা জবাব দিতে যাবে এমন সময় অসিত বলল: "শোন্ আমার কথাটা এখনো শেষ হয় নি।" ব'লে একটু থেমে ভাবল তার পরে বলল "আমরা মানুষ হয়েছি মিলি, সত্যি সত্যি দুটো ছোঁয়াচের মাঝামাঝি—under two flags যাকে বলে। ফলে শিক্ষিত বাঙালিদের মধ্যে আজকের দিনে মোটামুটি তিনটে প্রভাবের ধারা চোখে পড়ে: হিঁদুয়ানি, ব্রাহ্মিয়ানা আর একটা বলা যায় এ দুয়ের মাঝামাঝি অর্থাৎ ব্রাহ্মভাবাপন্ন মুক্তিয়ানা। অধিকাংশ বাঙালিই অবশ্য পড়েন প্রথম কোঠায়—মুষ্টিমেয়

কয়েকজন এখনো টিম টিম করছেন দ্বিতীয় কোঠায়। কিন্তু তাই ব'লে যেসব ক্রুদ্ধ হিন্দু ব'লে বসেন ব্রাহ্মধর্ম ছিল শুধু একটা হুজুগ কাজেই দেখতে দেখতে লুপ্ত হ'য়ে গেল মৌসুমি ফুলের মতন—তাঁদেরকে পুরোপুরি চক্ষুষ্মান্ বলা চলে না। কারণ মুমূর্ষু যেটা সেটা ব্রাহ্মিয়ানা—ব্রাহ্মদের প্রভাবের বড় দিকটা নয়। তা যদি হ'ত তাহ'লে এই তৃতীয় দল—অর্থাৎ ব্রাহ্মভাবাপন্ন মুন্সিরা আজ নিভে যেতেন। হয়েছে যা তা এই ব্রাহ্মধর্মের ছিল দুটো দিক ; একটাকে বলা যেতে পারে থিয়লজি বা দার্শনিক ভাবধারা, আর একটাকে বলা যেতে পারে রিফর্মিষ্ট বা সংস্কৃতির দিক। থিয়লজির দিকটা ব্রাহ্মদের জোরালো দিক নয়। তাই ঐ দুর্বলতার জলায় ওদের যত রাজ্যের নৈতিক ভয় ভূত হ'য়ে ভয় দেখাতে পারলে হিন্দুধর্মের অনেক কদাচার সত্ত্বেও ছিল একটা আশ্চর্য আত্মসাৎ করবার ক্ষমতা, একটা অদ্ভুত নির্ভীকতা। তাই সে হাজারো অহি-নকুলকে রেখেছে যার মতন আঁচলের ছায়ায়। এইজন্যে আমাদের প্রাণহীন গতানুগতিকতা সত্ত্বেও হিন্দুদের মধ্যে অতিকায় আধ্যাত্মিক মানুষ জন্মাতে পারল যেটা পারল না ব্রাহ্মদের মধ্যে।"

নির্মল : কিন্তু রাজা রামমোহন—

অসিত : নাম টেনে আনিস নি—আমি ওঁদের নমস্য মনে করি বরাবরই। কিন্তু তবু এটা হয়ত তোর চোখে পড়েছে যে ওঁদের মতন বলিষ্ঠ মানুষও আজ শুধু স্মৃতির কুলুজিতেই বন্দী—ওঁদের লেখা কেউ পড়ে না—তরুণ তরুণী কারুর প্রাণেই ওঁদের বাণীর রং লাগে নি যেমন লেগেছে ধর শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ দয়ানন্দ বিজয়কৃষ্ণ আরও কত হিন্দু মহাত্মাদের শিক্ষাদীক্ষার রং। আমাকে ভুল বুঝিস নে। আমি বলছি না বড় বড় ব্রাহ্ম প্রচারকদের দার্শনিক দিকটা আদৌ নাস্তি। অস্তি কিন্তু কেমন যেন ওঁরা গভীরে পৌঁছতে পারেন নি। যেমন ধর হিঁদুয়ানির

নানান অসারতার বিরুদ্ধে যতটুকু তাঁরা বলেছেন ততটুকু মিথ্যা নয়, কিন্তু সেটুকু হিন্দুধর্মের অন্তরাত্মার বাণী নয়—লোকাচারের গ্লানি।

নির্মল: তুই লোকাচারের গ্লানি বলতে ঠিক কী বলতে চাচ্ছিস বুঝতে পারছি নে। ধর প্রতিমা পূজা। তুই বলবি কি, প্রতিমা পূজার পোড়ো বাড়িতে হাজারো নোংরামির বাদুড় বাসা বাঁধে নি?"

অসিত ভেবে বলল: নোংরামি? আচ্ছা না হয় মেনেই নিলাম কথাটা—যদিও আমি হ'লে বলতাম প্রাণহীন গতানুগতিকতা। কিন্তু এখানে তুই এসে পড়লি একটা দারুণ দুর্বলতার জায়গায়—মানে ব্রাহ্মদের। কারণ এ কথা আমি বলবই বলব যে প্রতিমা পূজার মর্মবাণীটি ওরা ধরতে পারে নি। আর এইখানেই বোঝা যায় হিন্দুরা মনের মনস্বিতায়, ভাবের ভাবুকতায় ও জ্ঞানের গভীরতায় কত শ্রেষ্ঠ। ভগবানকে হিন্দুরা 'ইতি' করে নি—পরমহংস-দেবের ভাষায়। এ দুষ্কর্মটি করেছেন ব্রাহ্মরাই। বললেন তাঁরা—ভগবান সাকার রূপ ধরতে পারেন না। কিন্তু কোন সুযুক্তির জোরে এঁরা সাব্যস্ত করলেন শুনি যে, যে-সব ভক্তরাজের চোখে ভগবান্ সাকার রূপে দেখা দিয়েছেন তাঁরা সবাই ভ্রান্ত! গীতায় বলেছে—ভগবান্ ভক্তবৎসল, যে-ভক্ত যে-রূপে তাঁর দর্শন চায় সেই রূপই ধরেন তিনি তার আবদারে। হিন্দুধর্মে মাধুর্যের একটা গভীরতম দিক হ'ল এই আবদার ও রূপের দিক। আর সে কি একটা রূপ রে! কত রূপে যে তারা দেখেছে সেধেছে ভালোবেসেছে ভগবানকে; কুমারীরূপে, শিশুরূপে, বন্ধুরূপে, বংশীধর রূপে রুদ্র রূপে মহাকালী রূপে, লক্ষ্মীরূপে কালীরূপে, জগদ্ধাত্রী রূপে—এমন কি অদ্ভুত নৃসিংহ রূপেও তারা পূজা করেছে তাঁর। বলতে চাস কি এ সবই ভুয়ো আর ব্রাহ্মদের ঐ নিরাকারের শ্রীচরণকমলে শশ্রুল মন্ত্র পাঠই সত্যের অদ্বিতীয় নীতিপাঠ? না। সত্যের অধিষ্ঠান ভগমায় নয়, মনগড়া এ-ও-

তা নীতিতে নয়—সে-নীতি শুনতে যতই নিরাপদ ও সুসংবদ্ধ হোক না কেন। সত্যের পরম জবানবন্দি—অভিজ্ঞতার উপলব্ধির কাঠগড়ায়। সব দেশেই। ভক্তেরা সাধকেরা যুগে যুগে ভগবানের দেখা পেয়েছেন তাঁদের আরাধ্য ইষ্ট মূর্তিতে—ওঁদের মধ্যে অনেকে যে জ্ঞানে চরিত্রবলে প্রতিভায় কারুর চেয়েই কম নন একথা প্রমাণ করা যায়। অথচ প্রতিমা-পূজার মধ্যে প্রাণহীন আচারের জয়জয়কার দেখে ব্রাহ্মরা ব'লে বসলেন যে পৌত্তলিকতা হ'ল জঘন্য। কিন্তু জঘন্য কেমন ক'রে? The proof of the pudding lies in the eating: যদি পৌত্তলিকদের মধ্যে শ্রীচৈতন্য রামপ্রসাদ, শ্রীরামকৃষ্ণ, বিজয়কৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, ব্রহ্মানন্দর মতন মানুষকে প্রত্যক্ষ করি, তবে এ-আশ্চর্য আবির্ভাবকে বাতিল করব কার হুকুমে শুনি! মানি, পৌত্তলিকতার মধ্যে অসার আচারের বহু আবর্জনা এসে জমেছে। কিন্তু তাই ব'লে বলা চলে কি throwing away the baby with the bathwater-ই হ'ল শুদ্ধির শ্রেষ্ঠ পথ?

"কিন্তু তবু বলব," বলল অসিত চিন্তিত সুরে, "যে ব্রাহ্মদের এদিকে প্রতিবাদেরও কিছু দরকার ছিল সে যুগে। আমরা, হিন্দুরা, সবকিছুই মেনে নিতে চাই নির্বিবাদে। এ জীবনের লক্ষণ নয়। ক্ষীণপ্রাণরাই সবচেয়ে ডরিয়ে ওঠে বিদ্রোহের প্রসঙ্গে। এ-ভয় ব্যাপক হয় অবনতির—decadence-এর—তামসরাজ্যে। নমস্য ব্রাহ্মদের মধ্যে এসেছিলেন অনেক প্রাণবন্ত মানুষ যেমন রাজা রামমোহন রায় রাজ-নারায়ণ বসু, রামতনু লাহিড়ি, কেশবচন্দ্র সেন, শিবনাথ শাস্ত্রী। তাঁদের মধ্যে ছিল স্বাধীন চিন্তার ক্ষমতা, মনীষা, চরিত্রবল—সবচেয়ে বেশি, এই বিদ্রোহের শক্তি; এ একটা মস্ত শক্তি, প্রায় বিভূতির কাছাকাছি। আমাদের হিন্দু সমাজে বহু আগাছা ঢুকেছিল আচারের ছদ্মবেশে। এঁরা তাদেরই বিরুদ্ধে ঠুকলেন তাল। তাই এঁরা নিশ্চয়ই আমাদের প্রণম্য। কারণ এ মানতেই হবে যে সেযুগে একটা দুঃসাধ্য সংস্কার সুসাধ্য করে

ছিলেন এঁরা তাঁদের চরিত্রবলের জোরে—যদিও যেভাবে এঁরা সমাজের হিতসাধন করবেন ভেবেছিলেন, হিতটুকু ঠিক সেভাবে সাধিত হয় নি। রূপের ধ্যান উঠে গেল না ভক্তের হৃদয় মন্দিরে—শুধু নিরাকার পরব্রহ্মই যেন হ'লেন একটু অপ্রতিভ। কীর্তনে রাধাকৃষ্ণের অফুরন্ত নাট্যলীলা লোপ পেল না—লোপ পেল শুধু 'গাওরে আনন্দে সবে জয় ব্রহ্ম জয়' ব্রাহ্ম কীর্তন। পাবে না? হাসি পায় না এসব ব্রহ্মকীর্তন শুনে!—

অখিল ব্রহ্মাণ্ডপতি প্রণতি চরণে তব
প্রেমভক্তিভরে শরণ লাগি'
দুর্মতি দূর করি' শুভ মতি দাও হে
এই বরদান ভগবান্ মাগি!"

Holy Bap...

প্রমীলা (খুসি হ'য়ে): আমিও তো ঐ কথাই বলছি অসিদা। ব্রাহ্মদের হাজার গুণ থাকুক না কেন, ডুবল ওরা ঐ এক রসবোধের অভাবে—হিন্দুদের হাজার দোষ থাকুক Sense of humour যাদের আছে তাদের সাত খুন মাফ।

নির্মল: এ মিলির অন্যায় নয় অসিত?—কোনো একটা সম্প্রদায়কে একেবারে রসবোধ নেই ব'লে এই দোষ দেওয়া?

অসিত: মিলে কথাটা বলেছে একটু বেশি ঝাঁঝালো সুরে মানি। কিন্তু কি জানিস ভাই, ব্রাহ্মদের কাছে নানাভাবে ঋণী হওয়া সত্ত্বেও আমার নিজেরও মনে হয়েছে বারবারই এ কথা। আর শুধু রসবোধ না—ঐ যে বলছিলাম, কোনো কিছুরই যেন ওরা গভীরে যেতে পারে না। বোধহয় মনের প্রোটেস্টকে বড় করতে করতে ওদের গভীর বোধের মূল চেতনাই গেছে ঝাপসা হ'য়ে;

নির্মল: কী বলতে চাচ্ছিস তুই!

অসিত: কথাটা বুঝিয়ে বলা ভারি মুস্কিল। তাই একটা দৃষ্টান্ত দিই। এই মাত্র আমি বলছিলাম না যে আমরা অনেকেই ব্রাহ্মসমাজের

প্রভাবে গড়ে উঠেছি—ফলে আমরা না নিতে পারি হিন্দুয়ানির সবটা না পাই ব্রাহ্মিয়ানার গোঁড়ামির মধ্যে সোয়াস্তি। আমি খুব ভুগেছি এক সময়ে এই ব্রাহ্ম ছোঁয়াচে। সামাজিক দিকে লাভও করেছি মানি—কিন্তু গভীর বোধের দিকে লোকসানও হয়েছে বৈকি। কী ভাবে, হঠাৎ একদিন চোখে পড়েছিল। বলি শোন্। "সে বেশিদিনের কথা নয়—কোডাই-কানাল থেকে ফিরবার পথে গিয়েছিলাম দক্ষিণের এক মন্দিরে—পাল্নি শহরে। মন্দিরটি একটি পাহাড়ের চূড়ায়। উঠতে বেশ কষ্ট হয়—প্রায় তিনশো ফিট উঠলে তবে দেবতা দেখা দেন। দেখি কত যাত্রী যে উঠছে —নানাদেশের যাত্রী। কিন্তু তাদের আগ্রহ আমার তেমন চোখে পড়ল না কারণ চারিদিকে এর ওর তার কপালে মোটা চন্দন, চেঁচিয়ে মন্ত্র পাঠ, পশ্চিমা পাণ্ডা—দেখতে দেখতে মনটা হ'য়ে উঠেছিল তিতি-বিরক্ত! টের পেলাম—আমার মনটার মধ্যে যে ব্রাহ্ম ভদ্রলোক ছিলেন লুকিয়ে তিনি বসেছেন বেঁকে। তবু জোর ক'রে শ্রদ্ধা এনে উঠতে লাগলাম—আর এক পাল বাঁদর! ফের সন্ত্রাস্ত ক্রোধের উদয়। দেবস্থানে লিটারল্ বাঁদরামি —যেখানে সেখানে নোংরা করছে তারা অথচ কেউ কিছু বলছে না! তবু কোনমতে মনকে শান্ত ক'রে উঠে দেখলাম 'অভিষেক'। রাশি রাশি জল ঢালছে একপাল ঝুঁটিবাঁধা পাণ্ডা বেচারি সুব্রহ্মণ্য ঠাকুরের মাথায়। দেখে মন ফের বিগড়ে গেল: ভক্তের ভক্তি এখানে কেমন ক'রে আশ্রয় পাবে—এ প্রাণহীন লোকাচারের খাসতালুকে? পাণ্ডারা ডাকল প্রসাদ পেতে। বললাম—দরকার নেই প্রসাদের। একটু অনুতাপ এল—অশ্রদ্ধা হয়ে যাচ্ছে না তো? কিন্তু কোনো দার্শনিক সান্ত্বনা দিয়ে বিতৃষ্ণা জয় করতে পারলাম না। ব'সে লিখলাম একটি কবিতা পকেট বুকে। শোন্।" ব'লেই অসিত পকেট থেকে পকেট বুক বার ক'রে পড়ল।

চারিদিকে শঙ্খ ঘণ্টা পুষ্প ধূপ দীপ স্তব গান?
শুনি—তব 'অভিষেক,' হে লাঞ্ছিত অগতির গতি!

যত শুনি জাগে প্রশ্ন : তাদেরে কি দাও বরদান
পূজা যারা করে তব সাধি' মন্ত্র নিষ্প্রাণ আরতি ?

লীলাময়, লীলা তব বিচিত্র ?—তোমাকে যারা নিতি
করিল অর্চনা হেন মন্দিরে মন্দিরে—যুগে যুগে,
তারা তব কৃপাধন্য—কে বলিবে দেখি' তার রীতি
আচার তাদের ? কে বলিবে—রাজো তাহাদেরো বুকে ?

চারিদিকে তবু মালা-কুঙ্কুম প্রসাদ—ছড়াছড়ি
ললাটে কুরূপ স্থূল চন্দনের চিৎকার ! বিভূতি
সর্ব অঙ্গে ! কেহ করে ভিক্ষা—কেহ দেয় গড়াগড়ি
কর্দমে ধুলায় !—আছে সবি—নাই অন্তর আকুতি !

যুগে যুগে ধীরে ধীরে অবান্তর ম্লান লোকাচারে
কোন্ ম্লানিহীন দীক্ষা দাও বন্ধু ? চাহো কি শিখাতে :
আচারের অভিমান যত গরজায়—অন্ধকারে
ততই লুকাও তুমি গূঢ়তর আলোক চিনাতে ?

"লিখে চুপ ক'রে ব'সে ধ্যান করতে লাগলাম গুরুদেবের শিবকান্তি। মনটা একটু শান্ত হ'তে চোখে চেয়েই দেখি সামনে একটী সুশ্রী মেয়ে—কাঁকে তার একটি চার পাঁচ বছরের শিশু। সঙ্গে একটি বৃদ্ধা দাই মতন। আমাকে দেখে বাংলায় জিজ্ঞাসা করল 'ঠাকুর কোন্‌দিকে জানেন ?'

"তামিল দেশে বাংলা প্রশ্ন শুনে কী যে ভাল লাগল ! সাগ্রহে উঠে বললাম : 'ঐ দিকে, চলুন নিয়ে যাচ্ছি।'

"চলতে চলতে মেয়েটি বলতে লাগল কত কষ্ট ক'রে তার আসা। ভাসুর শ্বশুর কেউ মত দিতে চায় না। কিন্তু মাদুরা থেকে ফিরতি মুখে পালনির ঠাকুর না দেখে ফেরা যায় কি ? আমি চুপ ক'রে রইলাম।

এমন সরল মেয়ে বেশি দেখি নি। সে বলল: 'হয়ত একটু অবাক হয়ে যাচ্ছেন। আমি একাই বেরিয়েছি তীর্থ করতে এই দাইটিকে নিয়ে। সংসারের জেলখানায় হাঁপিয়ে ওঠে না মানুষ? কবে যে ঠাকুর মুক্তি দিবেন!' বলতে বলতে তার চোখে জল ভ'রে এল। বলল: 'আপনাকে দেখে বাঙালি মনে হ'ল তাই কষ্ট দিলাম—বকলামও অনেক কিছু মনে করবেন না। আজ দশদিন বাঙালির মুখ দেখি নি কি না।'

আমি বললাম: 'না না কষ্ট কী? আমারও খুব ভালো লাগল বিদেশে বিভুঁয়ে একটি স্বদেশিনী বোনের পরিচয় পেয়ে।' মেয়েটি খুসি হয়ে বলল: 'আমার নাম কল্যাণী। আমার স্বামী থাকেন বাঙ্গালোরে —কেরাণী। ভাশুর শ্বশুরও সেখানে। কিন্তু বাঙ্গালোর আমার ভালো লাগে না। আমার স্বামীর এক দাড়িওয়ালা ব্রাহ্ম বন্ধু আছেন তিনি রোজ এসে পুতুল পুজোর নিন্দে করেন। আমি প্রার্থনা করি—ঠাকুর বেচারি জানে না কিছু—ওকে তুমি ক্ষ্যামাঘেন্না কোরো—আহা ছেলেমেয়ে নিয়ে তো ঘর করে ছাপোষা মনিষ্যি!' তিনিই আরো বাদ সেধেছিলেন। যাহোক শেষটায় অনেক সাধ্য সাধনা করে তবে মত পেয়েছি গুরুজনের। শুধু দাই নিয়ে এই বিভুঁয়ে তীর্থ করতে বেরুব এ কেমন কথা! কিন্তু পুরুষ মানুষে তো বোঝে না ভাই, মেয়েদের কষ্ট সংসারের অষ্টপাশে। —এই যে ঠাকুর। আহা! ঠাকুর—কী সুন্দর! ঠাকুর ভুলোনা—পায়ে রেখো ঠাকুর, পায়ে রেখো।' ঝর ঝর ক'রে চোখে জল পড়তে লাগল মেয়েটির—ঠায় হাত জোড় ক'রে দাঁড়িয়ে রইল অভিষেক শেষ না হওয়া পর্যন্ত। প্রায় আধ ঘণ্টা হবে। তার মুখের চেহারা ভুলব না। সিঁথিতে সেই চওড়া ক'রে সিঁদুর। পরনে মোটা লালপেড়ে শাড়ী। হাতে শুধু শাঁখা আর নোয়া। দাই ছেলেটিকে নিয়ে একটু দূরে ভোলাতে লাগল একটা স্প্রিঙের লাট্টু দিয়ে, আর মেয়েটি চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে। কেবল ঠোঁট দুখানি তার নড়ছিল। চোখে অবিরল ধারা।

"আমি মিনিট দশেক দাঁড়িয়ে থেকে বসলাম কাছেই একটা থামের

. . . .

একটি কবিতা। এটি যে লিখল সে কিন্তু আমার মধ্যেকার ব্রাহ্ম ভদ্রলোকটি নয়—সে হিন্দু অসিত, পৌত্তলিক অসিত, ব্রাহ্মিয়ানার চাপেও যে আত্মঘাতী হয় নি। শোন্" ব'লেই ও পড়ল :

এ কী অভিনব আলো ? ভাবিয়া না পাই দেবদূত !
দেবতার রূপে তুমি মূর্তি ধরো লক্ষ দেবালয়ে
দেশে দেশে কালে কালে—কভু কান্ত, কভু বা অদ্ভুত !
আসে যাত্রী শ্রান্তিহীন তবুও তো কত না আগ্রহে !

ধরা দাও বুঝি আগে পূর্বরাগে—ওঠে যে দীপিয়া
প্রশস্ত বিধানে মন্ত্রে স্তোত্রে দীপে পুষ্পে উপচারে ?
জীবন-অতীত ছন্দ যেথায় ক্বচিৎ হিল্লোলিয়া
ওঠে ক্ষণজীবা রেশে দেখা দাও সেথা কি আঁধারে ?

পরে বুঝি দেখা দাও আরো অন্তর্গূঢ় গরিমায়
যে-রূপ মিলে না চিত্রে দৈনন্দিন মন্দির-বিহ্বল
জনতার মাঝে ?—যে উচ্ছলে অনির্বচনীয়তায়
শুধু যেথা ভক্তিডাকে সাড়া দেন ভকতবৎসল ?

স্থূল হ'তে সূক্ষ্মে বুঝি চলো নিয়ে বন্ধু হাত ধ'রে
দীক্ষা হ'তে দীক্ষান্তরে ? যারা আজো প্রতীক পশারী
তাদেরো প্রতিমা হ'য়ে কিছু দাও ? তাই কি নির্ভরে
প্রসাদ তোমার কিছু পেয়ে হ'ল তারাও পূজারী ?

* * * *

অসিত নির্মলের দিকে চেয়ে বলল : "আশা করি আমাকে তোরা স্বভাবে অকৃতজ্ঞ মনে করিস নে ? ব্রাহ্ম সমাজের কাছে আমি অনেক

কিছুই পেয়েছি বিশেষ ব্রাহ্ম মেয়েদের কাছে। মনে আছে ছেলেবেলায় একটি ব্রাহ্ম মেয়ের সঙ্গে মিশতাম। তার বুদ্ধি, চরিত্র, প্রফুল্লতা, কথা-বার্তার জৌলুষ—সবচেয়ে বেশি তার স্নিগ্ধ সখিত্ব আমাকে গভীর আনন্দ দিয়েছে। সে সময়ে কোনো অনাত্মীয়া হিন্দু মেয়েই সে রকম সরল উচ্ছল ভাবে আমার সঙ্গে মিশতে সাহস পেত না—মিশতে দিতই না তাদের বাপ মা অভিভাবকেরা। অথচ এ ভাবে মিশে যে চরিত্রের পবিত্রতা বজায় রাখা যায় এটা কৈশোরে প্রত্যক্ষভাবে জেনে আমার বহু লাভ হয়েছে—শুধু আদর্শবাদের দিক থেকে নয়—সত্যকে জানার চেনার আপন ক'রে পাওয়ার দিক থেকেও বটে। সে নির্ভীক মেয়েটির সখিত্বের কথা আমি কখনো ভুলব না। কিন্তু শুধু সে-ই না। এরকম আরো কত ব্রাহ্ম বন্ধু বান্ধবীই আমাকে প্রীতিদানে ধন্য করেছেন যে! কত ব্রাহ্ম আচার্য দেখেছি যাঁরা সত্যিই মহৎচরিত্র। কাজেই বিচার করতে আরো ভয় হয়। কিন্তু তাই ব'লে যাকে মিথ্যা ব'লে জানি তাকে মেনে নেব কী ক'রে বল্? কী ক'রে বলব যে ওঁদের মধ্যে সে-গভীর বোধের বা সে-ধ্যানদৃষ্টির পরিচয় পেয়েছি যা হিন্দুদের মধ্যে আজো বিরল নয়? কেমন ক'রে এতবড় অসত্য উচ্চারণ করব যে ঐ মেয়েটির মতন সহজ সরল ভক্তি ঠাঁই পেতে পারে কোনো শিক্ষিতা ব্রাহ্ম মেয়ের মনে? কী ক'রে উদারতার খাতিরেও এ ধরণের অসার হাল্‌কা platitude মুখে আনব যে, ব্রাহ্ম মনের সঙ্গে হিন্দু মনের কোনো সত্যিকার অমিলই নেই? না নির্মল, বিশ্বাস করিস এ আমার অনেক ঠেকে তবে শেখা যে ব্রাহ্মিয়ানা একটা দীক্ষা। তার ভালো দিক আছে নিশ্চয়ই, কিন্তু সার বস্তু তার মধ্যে দেখতে পাই ব'লেই না হাল্কামিগুলো আরো চোখে পড়ে—দুঃখ পেতে হয় দেখে যে ওরা কিছুতেই পারে না জীবনরহস্যের গভীরে তলাতে। এই জন্যেই বিজয়কৃষ্ণ চিত্তরঞ্জনের মতন মানুষকে ছাড়তে হ'ল ব্রাহ্মধর্মের মন্ত্রদীক্ষা। আরো অনেক অখ্যাত মহৎ মানুষকে জানি

যাঁরা ব্রাহ্মসমাজে আত্মার মুক্তি খুঁজতে গিয়ে ঘা খেয়ে নিরাশ হ'য়ে হিন্দু সমাজেই এসেছেন ফিরে। না এসে উপায় ছিল না কেন না ব্রাহ্মদের আবহাওয়া হ'ল মূলত ইনটেলেক্‌চুয়াল, ডগম্যাটিক, সাম্প্রদায়িক, বুদ্ধিজীবি—মনকে ছাড়িয়ে যেতে ওঁরা নারাজ—তাই প্রকৃত আধ্যাত্মিকতা ওঁদের মধ্যে মেলে না—মেলে বড় জোর মনগড়া নিখুঁৎ মরালিটি।

প্রমীলা খুসি হ'য়ে সায় দিতে যেতেই অসিত বাধা দিল, বলল: "কিন্তু মনে রাখিস যে একথা যখন আমি বলছি তখন আমি নিজেকে বাদ দিয়ে বলছি না। কারণ বলেছি—আমার মধ্যে ব্রাহ্ম ভদ্রলোক বেশ পাকা বাড়ি গেঁথেই বসবাস করছেন এখনো পর্যন্ত। তাই তো পৌত্তলিকতা মন্দির বিগ্রহ গুরুবাদ এ সবের কোনোটাকেই আমি আজ পর্যন্ত ঠিক সর্বান্তঃকরণে গ্রহণ করতে পারি নি।—কিন্তু ঐ আর এক মজা জীবন-দেবতার। দোটানায় ফেলতে তিনি কী যে ভালোবাসেন! তাই মন আমার যতই ব্রাহ্মিয়ানা করুক না কেন, হিন্দুদের প্রতীক মন্ত্র মন্দির দীক্ষা নিয়ে যতই হাসাহাসি করুক না কেন—প্রাণ আমার সাধু দেখলেই চায় শ্রদ্ধা করতে, মন্দির দেখলেই হাত জোড় করতে, গুরু দেখলেই প্রণাম করতে। লীলাময়ীর বিচিত্র 'ভানুমতীকা খেল্', মিলি একটা পুরোনো গান পড়ে (সুর ক'রে):

কখন কী রঙ্গে থাকো মা শ্যামা সুধাতরঙ্গিনি!

দে একটু কফি। গলা শুকিয়ে গেছে রহস্যময়ীর রহস্যের কথা ভাবতে ভাবতে।"

প্রমীলা হেসে ফ্লাস্ক থেকে পেয়ালায় কফি ঢেলে দিল।

* * * *

কফিতে চুমুক দিয়ে অসিত বলল: "কথাটা একটু অবান্তর মনে হ'তে পারে—কিন্তু হয়ত খুব অবান্তর হয় নি। কারণ দেবদাদের

সঙ্গে আমার যে বিচিত্র সম্বন্ধটি গ'ড়ে উঠেছিল তার মর্মগ্রহণ করতে হ'লে ওদের পরিবেশটুকুর ইতিহাস একটু জানা থাকলে পরে মিলিয়ে নেওয়া সহজ হবে। দেবদাদের সম্পর্কে যেটা আর একটু পরিষ্কার ক'রে বলা দরকার সেটা এই যে দেবদা নিজে ছিল অনেকটা আমারই মতন—অর্থাৎ ব্রহ্মভাবাপন্ন মুস্কিয়ানার ক্লাসে, প্রীতিরা ছিল খানিকটা ব্রাহ্মিয়ানার ক্লাসে, আর ওদিকে দেবদার আত্মীয়রা ছিল নিছক হিঁদুয়ানির চৌহদ্দির মধ্যে।

"ছায়ার মধ্যে তাই দ্বিধা এসেছিল ছেলেবেলা থেকেই। মাসি মামাদের সংস্পর্শে এসে পৌত্তলিকতাকে ওর মনে হ'ত অতি বাজে জিনিষ। অথচ ওদিকে দেবদার সাধুসন্তদের প্রতি শ্রদ্ধাও ওর মনে চারিয়ে গিয়েছিল। কাজেই ও-মেয়ের না স্তক আস্তিক গোছের একটা উভচর অবস্থা দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। আমাকে বলত প্রায়ই যে ছেলেবেলা থেকে ভগবান নিয়ে মাথা ঘামাতে কাউকেই দেখেনি আশে পাশে! দেখবে কোত্থেকে? না যেত ও ব্রাহ্ম উপাসনায়, না হিন্দু মন্দিরে। ফল যা হবার: মনটা ওর হয়ে উঠেছিল প্রায় নিরপেক্ষ—neutral."

নির্মল: তাহ'লে দেখা যাচ্ছে যে ও পরিবারের মধ্যে তোর সঙ্গে সবচেয়ে বেশি মিল ছিল দেবদারই?

অসিত: তা বলা যায় না। কারণ মিল বলতে আমি আগে যা বুঝতাম আজকাল তা বুঝি না। মিল বলতে আগে জোর দিতাম একটা ধারণার মিলের ওপর—কিম্বা বলা যেতে পারে আইডিয়ার স্বাজাত্য। কিন্তু বিশেষ ক'রে ছায়ার সঙ্গে মিশে বুঝেছি যে আসল মিলটা থাকে এ সবের অতলে—অর্থাৎ যাকে গরমিল বলি তাতে তত আসে যায় না যদি—" ব'লেই বলল: "কিন্তু না এ ধরণের ধোঁয়াটে কথা থাক। ওর ছবিটা যদি একটু ফুটিয়ে তুলতে পারি তাহ'লেই সবচেয়ে সহজে পরিষ্কার হবে আমি ঠিক কী বলতে চাইছি।

অসিত কফি দিয়ে গলা ভিজিয়ে নিয়ে বলল: "কিন্তু তার আগে দেবদার সম্বন্ধে একটা কথা ব'লে রাখা দরকার—যখন কথাই উঠল। কথাটা এই যে, দেবদার সঙ্গে আমার মিল ছিল যথেষ্ট একথা সত্য হ'লেও বলতেই হবে যে অমিলও কম ছিল না। এটা ওরা তত দেখতে পেত না—খুসি হ'ত আমাদের সৌভ্রাত্র্য দেখে। কিন্তু আমি স্পষ্ট দেখতে পেতাম যে দেবদা আমার সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মেলালেও পা ফেলে আলাদা ছন্দে। এ অবশ্য না হ'য়েই উপায় ছিল না, কারণ সংসারী আর অসংসারীর মধ্যে প্রীতিবন্ধন দৃঢ় হ'তে পারে বটে, কিন্তু দৃষ্টিভঙ্গি এক হয় না, হ'তে পারে না।

"কিন্তু তবু বলব যে দেবদা ঠিক গড়পড়তা সংসারীও ছিল না যেমন ছিল ধর, প্রতিমা। বলত সে প্রায়ই—তার পূজো হ'ল সংসারের সেবা। দেবদা ছিল শুধু জাতে না, স্বভাবেও পুরুষ। কাজেই সংসারের ঠাসবুনুনি বেশি গাঢ় হ'লে দুঃখ পেত। সাধুসঙ্গ ও যে অত চাইত সে অনেকটা এইজন্যেই—তবে একথাটা সম্ভবত প্রতিমা বুঝত না পুরোপুরি।"

প্রমীলা: বুঝত না এমন কথা বলছ কেন?

অসিত: এই জন্যে যে প্রতিমার মধ্যে ব্রাহ্মিয়ানা না হোক ব্রাহ্মভাব একটু প্রবল ছিল। তাই সাধু বলতে ওর মনে আবেগ জাগত না। ও বুঝত কর্মকে। সাধুরা যে নিষ্কর্মা। এ-ধারণাটা ছায়ার মনেও গেঁথে গিয়েছিল মার ছোঁয়াচে।

কাজেই প্রতিমার সঙ্গে দেবদার মিল থাকলেও অমিলও ছিল বৈ কি। দেবদার আত্মীয়দের সঙ্গে প্রতিমার বনত না আরো এইজন্যে:

তারা ছিল একেবারে হিঁদুয়ানির খাসতালুকের প্রজা কি না।

প্রতিমা তাদের দেখাশুনো করত অবশ্য—সেবাও, কিন্তু খানিকটা যাকে বলে আলগোছে। মিশ খেত না। দেবদা নিশ্চয়ই খুসি হ'ত যদি প্রতিমার সঙ্গে ওদের বনত—কিন্তু বলিষ্ঠতা হ'ল স্বভাব-উদার, তাই এ

নিয়ে কখনো সে জোর করত না। প্রতিমা দেবদাকে আরো ভালোবেসেছিল এইজন্যেই। কারণ দেবদা প্রায়ই বলত তার উদার বেপরোয়া সুরে: 'অমিল? সে তো থাকবেই। আস্ত মিলও কোনো কাজের কথা নয়। যা চাই সবই পেলে সত্যিকার পাওয়া হয় না।' দেবদার সঙ্গে প্রতিমার মিলন সুখের হয়েছিলও এই জন্যেই—এর সত্তা ওকে সম্পূর্ণতা দিত—ভেদের মধ্যে দিয়ে ঐক্যের রস আরও উঠত জ'মে। আমার সত্যি ভারি ভালো লাগত দেবদার সঙ্গে প্রতিমার সম্বন্ধটি। বলতে কি, এধরণের সুন্দর দাম্পত্য সম্বন্ধ আমি খুব কমই দেখেছি—অর্থাৎ এমন দাম্পত্য আদান-প্রদান যেখানে এর দেওয়া ওর নেওয়াকে সম্পূর্ণ ক'রে নিজেও হ'য়ে ওঠে সুসম্পূর্ণ।

কিন্তু এ ধরণের সামাজিক আলোচনা আর না। সত্যি বলতে, এ ধরণের আলোচনায় আমার একটা প্রকৃতিগত অরুচি আছে। কারণ মানুষের মধ্যে শ্রেণীর সত্য বা প্রভাবের সত্য কাজ করে একথা স্বীকার্য হ'লেও বলব যে তার ব্যক্তিরূপের—পার্সনালিটির—সত্য আরও বড় জাতের—কেন না শ্রেণীগত বিচারকে সে নামঞ্জুর করতে পারে সহজেই। তাই আমি গোটা মানুষটাকে শ্রেণীর প্রভাব থেকে বিচ্ছিন্ন ক'রে দেখবারই পক্ষপাতী—যদিও সেটা সব সময়ে সহজ নয়। না-ই হ'ল। গভীর সত্যের পথ কবে সুগম হয়েছে? লেবেল মারা সোজা ব'লেই যে সেটা জ্ঞানীর কাজ একথা তো সত্যি নয়। কাজেই এবার ফিরে আসা যাক সমাজ ছেড়ে মানুষের কোঠায়।

—আর একটু কফি ঢাল্।"

অসিত বলল: "ছায়াদের বাড়িতে ওদের বৈঠকখানায় মস্ত কৌচটাতে গদিয়ান হ'তে না হ'তে প্রতিমা দেখা দিয়েছিল বলেছি।

একটু বাদেই সে অদৃশ্য। তারপরেই তার পুনরাবির্ভাব—হাতে মস্ত ট্রে—বিলিতি চা-যোগ।

"বললাম: 'এ কী কাণ্ড? আজ দুপুরে যে আমার এখানেই খাওয়ার কথা। এখন জলযোগ জুগিয়ে রাজভোগের ত্রুটি ঢেকে নেওয়ার ফন্দি না কি?'

"প্রতিমা কথাবার্তায় খুব পটু ছিল না তো, প্রথমেই এ ধরণের সম্ভাষণে অপ্রতিভ হ'য়ে গেল, বলল: 'ও।' যখন কী বলবে ভেবে না পেত তখন এই স্বরবর্ণটিকেই ও তলব করত।

"ছায়া হেসেই অস্থির: 'যাহোক কিছু একটা বলো মা। শুধুই ও বললে কি উনি শুনবেন?'

"প্রতিমা বলল: 'কী বলব? ওর হয়ত এখন খেতে ইচ্ছে করছে না।'

"প্রীতি হেসে বলল: 'দিদি! চমৎকার তোমার আতিথ্য। জানেন অসিতদা—থুড়ি, জানো অসিদা—আমার এ-দিদিটি একটি অদ্ভুত চীজ। কে বলবে যে ও ব্রাহ্মঘরের আবহাওয়ায় মানুষ। দাদা চায় দিদি খুব বাক্যবাগীশ হোক কিন্তু দিদির হ'য়ে উঠল কাজই জীবনের উদ্দেশ্য।'

"প্রতিমা হেসে বলল: "তা বোনটি তো পুষিয়ে নিয়েছে দাদাকে বচন দিয়ে খুসি ক'রে?

"প্রীতি বলল: 'দেখলেন তো—

কী রকম নিলে এক হাত? এত ক'রেও কি না দুর্নাম রটল—আমি শুধু মুখেন মারিতং জগৎ—কাজের বেলায় একেবারে আস্ত ঢেঁকি।'

"ছায়ার ছোট ভাই রাজু ছিল একটি টুলে ব'সে, বলল টপ ক'রে: 'তা মাসিমা, একেই তো বলে division of labour—যে যেটা পারে—কাজেই অত রাগ কেন?'

"ছায়া হেসে উঠল, বলল মাসিকে : 'কেমন হয়েছে ? দাও আস্কারা। বলি পই পই ক'রে—'

"লীনা বলল : 'তুমি থামো দিদি—অত পই পই কোরো না। আস্কারা বুঝি কেবল তোমারই পাবার কথা ?

"আমি বললাম ওকে কাছে ডেকে : 'এসো তো মেয়েটি—কী নাম তোমার ?'

'লীনা !'

'বেশ কথা কও তো।'

'মাসিমার বোনঝি তো।'

"প্রীতি আদর ক'রে ওর কান ম'লে দিয়ে বলল :

'ওমা ! তুইও ?—জামেন—আঃ, জানো. অসিদা ? আমাকে নিয়ে সবাই যেন কী পায়—'

"রাজু বলল : 'ঘোড়া দেখলে কে না খোঁড়া হ'তে চায় বলুন ?'

"প্রতিমা এবার হঠাৎ খুব ব্যস্ত হ'য়ে উঠল, বলল : 'তোরা কি ওঁকে ডেকে এনেছিস এই সব হাবিজাবি কথা শোনাতে ?—না, অতিথিসেবা বলতে এই-ই বুঝিস ?'

"লীনা বলল : 'তা মা, উনি খাবেন না—আমরা করব কী বলো ?'

"রাজু বলল : তাছাড়া মা তুমিই যাঁকে সেধে খাওয়াতে পারলে না তাঁর সঙ্গে আমরা কি পারি এঁটে উঠতে ?'

প্রীতি ধমকে বলল : 'তাই কেবল কথার পর কথার বন্যা নামানো শুরু করেছিস্ ফাজিল ছেলে ?—শোন্—যা. ওঁর চা কই ? ও মা—সব এসেছে—চা-ই নেই। ও দিদি—'

"প্রতিমা ফের অপ্রতিভ হ'য়ে রেগে উঠল : 'তোদের কথার জ্বালায় কি কারুর সুস্থির হ'য়ে কিছু করার জো আছে ? লীনা—যা দৌড়ে যা—ওঁর চাটা—'

"এমন সময়ে দেবদার প্রবেশ : 'কী কী ব্যাপার ! কটা ডাকাত ?'

"আমি উঠে দাঁড়ালাম, বললাম হেসে : 'আপাতত একটা—তবে—'

"দেবদা পাদপূরণ করল : 'একাই একশো হয় কেউ কেউ—এই তো ? হাঃ হাঃ হাঃ। সে যাক। কী ব্যাপার ? জলযোগ হাজির তবু এহেন গোলযোগের হেতু ?'

"প্রীতি বলল : 'তা বাপু দিদির এ অত্যাচার, বলবই আমি। দুপুরে যে-মানুষ খাবে তাকে দশটার সময় এক রাশ জলযোগ করাতে চাইলে গোলযোগ না ক'রে কী করে বেচারি বলো তো দাদা ?"

"দেবদা প্রতিমার দিকে তাকিয়েই হেসে ফেলল, তারপর বলল আমাকে : 'তা যা পারেন খান—অন্তত ঐ মিষ্টিটা—ও নিজে হাতে তৈরি করেছে।"

* * *

অসিত বলল : "হঠাৎ চোখে পড়ল ছায়া উশখুশ উশখুশ করছে। বললাম : 'কী ? গান একটু হবে না কি ?'

"ওর মুখ উঠল উজ্জ্বল হ'য়ে। সুরু হ'ল হাতে খড়ি।

"শেখাতে না শেখাতে মুগ্ধ হ'য়ে গেলাম। ও বাউল ভাটিয়ালি গায় শুনে প্রথম দিন ধরেছিলাম একটা ভাটিয়ালি—'যখন গাহে নীল পরী' যে গানটা ওকে প্রথমে গাওয়াই গ্রামোফোনে। কিন্তু শেখবার সময় ও বলল এ ধরণের ভাটিয়ালি ও কখনো শোনে নি। তাই হয়ত প্রথমে ও ঢঙটা ধরতে পারছিল না। কিন্তু দু একবার আমার সঙ্গে গাইতে গাইতে হঠাৎ ওর মুখের কুণ্ঠিত ভাবটা গেল কেটে। এক জায়গায় একটা মিড় ছিল 'চাঁদের সাথী উদাস রাতি' ব'লে একটি চরণের উদা স কথাটার আকারে। নি থেকে পা মিড়। 'কী চমৎকার !' ব'লে উঠল মেয়ে। আমি খুসি হ'লেও একটু আশ্চর্যও হলাম। কেন না সত্যিই এখানে মিড়টা ছিল ভারি লাগসৈ। তাহ'লে সুরের কান আছে মেয়েটার !

আমি ভুল করি নি। শুধু গলাই নয়—ওস্তাদি পরিভাষায় যাকে বলে 'মেজাজ' তারও অভাব নেই!'

অসিত বলল: "প্রথম প্রথম যেতাম ওদের ওখানে সপ্তাহে দুদিন ক'রে। ক্রমশ হ'ল তিনদিন। কিন্তু ছায়া এত তাড়াতাড়ি শিখতে লাগল যে চারদিন ক'রে যাওয়া সুরু করলাম। প্রীতি বলত: 'যেদিন যেদিন তুমি আসো অসিদা ও যে কী ক'রে পথ চেয়ে থাকে জানো না। কেবলই ঘর বার করবে, বলবে: মোটরটা ঠিক গেছে তো মাসিমা?' দশ মিনিট দেরি হ'লেও বলবে আমায় ফোন করতে--সে কি একটা আবদার মেয়ের!"

"এর পরে যে রোজই যেতে হ'ল সেটা তো দুই আর দুয়ে চার। ছায়ার সে কী গর্ব তখন! 'যে-অসিদাকে লোকে সেধে পায় না—সে কি না বাড়ি ব'য়ে গান শিখিয়ে যায় আমাকে রো—জ্!—মাসিমা!' সব কথার শেষেই মাসিমা ছিল ওর যেন একটা কথার মাত্রা। কারণ মাসিমা ছাড়া ওর রকমারি মনখুশিতে সায় দেবে আর কে? প্রতিমা তো থাকতে পারত না গানের সভায়। থেকে থেকে উঁকি দিয়ে যেত অবিশ্যি চা বা মিষ্টি বা লেমনেড নিয়ে। কিন্তু একটু শুনেই ফের অদৃশ্য। সত্যিই অতবড় সংসারে গৃহস্থালি, চারটিখানি কথা তো নয়—অথচ দেখাশুনো করার লোক কম। প্রতিমা চাইতও না সহায়-সঙ্গিনী। ও ভালোবাসত খাটতেই। সময়ে সময়ে আমাদের মনে যে একটুও অস্বস্তির উদয় না হ ত এমন নয়—কারণ আমার সঙ্গে প্রীতি, নগেন, অজয়, কান্তি আরও অনেকেই তো আড্ডা জমাত ঘণ্টার পর ঘণ্টা—আর হাসি গল্প চা পান জলযোগ গোলযোগ সবই ছিল অফুরন্ত ওদের আনন্দনিলয়ে--কেবল দেখতাম একটা মানুষই বইছে অতিথিসেবার ঝক্কিটুকু—দিনের পর দিন দুবেলা। কারণ শেষাশেষি আমি দিনে দুবেলাই গান শেখাতাম

কিনা। তারপর অনেক সময়েই বেরুতাম দেবদার—থুড়ি ছায়ার—মস্ত মোটরে। কিন্তু সে-মোটরে প্রতিমা বড় একটা আসত না।

বাস্তবিক, মোটর চড়ার সময় কোথায় বেচারির? তাছাড়া, বলেছি, ও ছিল কাজের মানুষ—আড্ডায় কেমন যেন অস্বস্তি বোধ করত। তাই আমরা ওকে বেশি পীড়াপীড়ি করতাম না। কখনো আমি একটু যদি ধরতাম তো ও বলত: 'আমাকে কেন ভাই? ছায়া রয়েছে, প্রীতি রয়েছে, তোমার অদ্বিতীয় দাদা রয়েছেন—এর পরেও বেচারি আমাকে নিয়ে টানাটানি কেন?—তাছাড়া জানোই তো যার কর্ম তারে সাজে—আমি কি পারি তোমাদের সঙ্গে হৈ চৈয়ে পাল্লা দিতে?'

"কথাটা সত্যি। কারণ প্রতিমা পারত না এটা। এজন্যে সে এগিয়ে দিয়েছিল প্রীতিকে। আসর জমানোর কাজে প্রীতির জুড়ি ছিল না। ও ছিল ওর মার আদুরে মেয়ে—কোলের মেয়ে। কাজেই অবসর-বিনোদন করতে ও শিখেছিল বৈ কি। আর, বলাই বেশি, অবসর না থাকলে বিনোদন করবার উদ্ভাবনী শক্তিও জাগে না। কালচারের সেই চিরন্তন দাবি: অন্তত দুচারজনকে একটু আলস্যের অবকাশ না দিলে কোনো বড় কালচার পারে না গ'ড়ে উঠতে। অথচ দুচারজনকেও ও-অবকাশ দিতে হ'লে বাকি সবাইকে বইতে হয় এদের তল্পি—আমি যে খাটুনিটা ফাঁকি দিলাম সেটা আর পাঁচজনকে খেটে পূরণ করে না দিলে অবশ্যম্ভাবী ফল—নৈরাজ্যের বিশৃঙ্খলা। অন্তত এখন পর্যন্ত আমাদের কালচারের পুষ্টি যে অন্য কোনো উপায়ে হয় নি এ নিশ্চয়। তাই প্রতিমাকেই বইতে হ'ত ছায়ার, প্রীতির, অসিতের তল্পি। অথচ মনে রাখিস এই যে আনন্দের পরিবেশ ও গ'ড়ে তুলত তাতে ওর নাড়ীর যোগ ছিল অষ্টপ্রহরই।

"সত্যি," বলে অসিত আনমনা সুরে, "আজও মনে পড়ে ওর অক্লান্ত সেবা যত্ন আদর আতিথ্য। এখনো প্রায়ই স্বপ্নেও শুনি সে স্বল্পবাক্

স্নেহের স্নিগ্ধ সম্ভাষণঃ সান্নিধ্যে যাদের খেয়াল করিনি দূরত্বের থিতিয়ে-যাওয়া আলোয় তারাই হ'য়ে ওঠে অবিস্মরণীয়। মনে পড়ে প্রতিমার মুখে সেই চাপা আনন্দের দ্যুতি যখন সে মাঝে মাঝে এসে দেখে যেত তার নয়নতারা গান শিখছে কী অপরিসীম অভিনিবেশে। গৌরবে সুন্দর মুখখানি তার আরো যেন দীপ্যমান হয়ে উঠত যখন এক একটা দুরূহ তান মেয়ে গলায় তুলত হেসেখেলে অথচ মুখ দিয়ে কি কখনো একটিবারও 'বাঃ' বলবে?"

প্রমীলা: আর তার মাসিমা?

অসিত: প্রীতি ছিল দিদির উল্টো সব বিষয়েই—সব তাতেই উচ্ছল, টগ্‌বগে, ফুটন্ত। ছায়ার গানে ওর প্রচণ্ড মাথা নাচানো যদি দেখতিস। আমি বলতাম প্রায়ই ঠাট্টা ক'রে যে বোনঝির গান বেশি শুনে-শুনেই বোধহয় মাসির ঘাড়টা এত অপলকা হ'য়ে উঠেছে অত্যধিক খাটুনির দরুন। ও বলত অম্‌নি টপ্‌ ক'রে: আর শিষ্যার গান শুনে গুরুর বুকের রক্ত এত বেশি মাথায় উঠল যে চুল বেচারিরা দিল চম্পট সেই দারুণ তাপে।

নির্মল: আর দেবকুমার বাবু?

অসিত: দেবদা প্রথম প্রথম থাকতে পারত না বেশি—মানে গান শেখানোর সময়। কিন্তু ক্রমশ দেখতাম প্রায়ই এসে চুপ ক'রে শুনছে। প্রীতি ঠাট্টা ক'রে বলত: 'দেখেছ অসিদা, দাদা যে দাদা সে-ও ক্রমশ হ'য়ে উঠল মৌতাতী।' দেবদা বলত হেসে: 'তা সত্যি অসিত। গান জিনিসটা এতদিন সখই মনে ক'রে এসেছি—ওটাও যে ভূতে পাওয়া হ'তে পারে—' অম্‌নি রাজু বলত: 'সেটা বাপী শিখল দিদির গান গান ক'রে ক্ষেপে যাওয়া দেখে।'

"কথাটা রাজু মিথ্যে বলে নি। গান শুনলে ছায়া নিজেকে ধ'রে রাখতে পারত না। ঐ সংযমী মেয়ে তো—তবু থেকে থেকে কী যে 'আহা

আহা' ক'রে উঠত! গলায় তুলত এক একটা মিড় তান গমক আর নিজেই ব'লে বসত: 'কী সুন্দর অসিদা!' লীনা যে লীনা, সেও ঠাট্টার সুরে বলত 'দেখছ অসিদা, দিদি কেমন নিজেকেই বাহবা দিতে শিখছে?' ছায়া চম্‌কে বলত 'ও রে মেয়ে, তুমি এবার মাসিমাকে ছেড়ে ধরেছ আমাকে? দাঁড়াও।'

"এইরকম কত আনন্দের দম্‌কা হাওয়া যে বইত মিলি এদিক ওদিক সেদিক থেকে! ফলে ক্রমশ আমি কেমন যেন আবিষ্ট হ'য়ে পড়তে লাগলাম। দুদিন আগেও মনে হ'ত আশ্রমে শীগগির ফেরার কথা। কিন্তু ছায়ার সাহচর্যে কেমন যেন নেশা ধরতে লাগল। বেশ বুঝতে পারতাম ভগবানকে পাওয়ার পথ এ নয়, তবু আনন্দকে ঠেকাতে পারতাম কই? তাই বলছিলাম মিলি, মহামায়া যে কাকে ছলেন কোন্ পথ দিয়ে!

* * *

অসিত বলল: "মায়া বললাম ইচ্ছে ক'রেই। কেন না সব বুঝে তবুও তো ভুলতাম—বন্ধনকে বন্ধন ব'লে চিনেও তো গা করতাম না। ভাবতাম কী হয়েছে? যাবই তো আশ্রমে ফিরে। আর দুদিন বই তো নয়। বড় জোর দেড়মাস দুমাস। অতএব অত ভয় কিসের?

"আর বাস্তবিক ভয় বলতে যা বোঝায় তার তো কিছুই ছিল না। আনন্দ হ'য়ে উঠছিল নেশা—মানি, কিন্তু জালে পড়বার কোনো প্রশ্নই তো ওঠে নি, কাজেই দিলাম গা ভাসিয়ে। আপ্‌সে জো কুছ আয়া উস্‌কো আনে দেও—বলে না ওস্তাদেরা! মন বেশি খারাপ হ'লে বলতাম ছায়াকে গাইতে।

জানি জানি যবে তুমি কাণ্ডারী ডুবিবে না মোর তরণী
ঢেউয়ে যত ফণী গরজে ততই ঝলকায় মণি জননী!

আর যে-ই ও গাইত মনের সব ক্ষোভ অশান্তি বিষাদ যেন গ'লে

হ'য়ে যেত—আঁধার থিতিয়ে ফুটে উঠত কোত্থেকে এক চাপা আলোর দ্যুতি।

"সময়ও যেত হু হু ক'রে কেটে। যেন পাখা উঠত। উঠবে না! ছায়াকে গ'ড়ে তোলা, সে যে আসলে সৃষ্টির আনন্দ। আমার সৃষ্টিশক্তি ওর কণ্ঠে রোজই রকমারি ছন্দে যখন ফুটে উঠত তখন কী যে তোলপাড় ঘটিয়ে দিত ঐ একরত্তি মেয়েটা! .....শুধু রক্তের মধ্যে না—হাড়ের মধ্যে আছে যে মজ্জা বোধহয় সেখানেও ওর সুরের বিদ্যুৎ পেত পাসপোর্ট—কী ক'রে জানি না। মন ভিজে উঠত ওর কোমলতায়, স্নেহে, ভক্তির ঐকান্তিকতায়। এমন আদর ক'রে কে কবে গানের দীক্ষা নিয়েছে আমার কাছে! শিষ্য শিষ্যা পেয়েছি অজস্র এর আগেও। একাধিক প্রতিভাময়ী মেয়েকেও শেখাবার সুযোগ মিলেছিল—কিন্তু এমন অন্তরের বন্ধনের মধ্যে দিয়ে নয়, দান আর গ্রহণের এমন সহজ ভাব ও সাড়ার মধ্যে দিয়ে নয়।—'ওখানটা অসিদা! ঐ শেষের তানটুকু মাঝে-র শেষের নি-টা কী ভাবে ছুঁয়ে এল যেন সা-কে!...'না, হয় নি—তুমি বললেই শুনব! ওখানটায় গলাটা আমার ঠিক দুলল কই?...'তুমি বললেই শুনব—আমি কানে পষ্ট শুনছি আমার গলায় এখনো আসে নি ঐ গমকটা।...'আচ্ছা অসিদা, এই ধা-রা-র তানটা এটা ধা-র পরে না দিয়ে, রা-র পরে দিলে কেমন হয়?'...'না অসিদা, আজ তুমি কেমন যেন অন্যমনস্ক বাঁশিখানি বাজে বিজনে-র আড়ির ছন্দটা কেমন যেন কিছুতে সহজ হচ্ছে না।'...'না অসিদা, শ্যামল শ্যামল শ্যামল—এই তিনবার করো তুমি নিজে গাইবার সময়ে, অথচ শেখাবার বেলায় আমাকে শেখাচ্ছ একটিবার গাইতে। যা—ও, এরকম করলে আর শিখব না তোমার কাছে। আমি প্রশংসা চাই না, ঠিক সুরটি চাই।' ...না, আলো শুভ আলো-র সুরফাঁক তালে বাঁধা তানগুলি এখনো সবার সামনে গাওয়ার মতন হয় নি।'...'রাধার গানটা? সুরটা একরকম এসেছে—কিন্তু

আখরগুলো যে এখনো ফস্কে ফস্কে যায়!...'আচ্ছা অসিদা, এমন স্বচ্ছন্দে কী ক'রে এত আখর বানাও ভাই? তুমি যাই বলো এ আমি পারব না, সাতজন্মেও।'

"এই রকম ক'রে ও আদায় ক'রে নিত, ও ছিল সেই জাতের মানুষ যাদের বলে নাছোড়বন্দ। যাকে শ্রদ্ধা করবে তার কাছে দাবির আর অন্ত থাকবে না। ভক্তি করবে বলেই যে অল্পে সন্তুষ্ট হবে সেটি হবার জো নেই। তাই তো ও আত্মসাৎ ক'রে নিতে পারত এত চট্ ক'রে। ও গান শুনত তো শুধু কান দিয়ে নয়—ওর প্রতি রক্তবিন্দুটি হ'ত নিবিষ্ট। বেশ মনে পড়ে ওর সেই উৎকর্ণ ভঙ্গিটি। বলতাম ওকে প্রায়ই হেসে: 'ঠিক যেন একটি হরিণশিশু কান খাড়া ক'রে বাঁশি শুনছে!' ও খুসি হ'য়ে বলত: 'কিন্তু বাঁশির তান তো সোনার হরিণও পারে না গলায় তুলতে—পারে অসিদা?' হেসে উঠতাম আমরা।

"আর সত্যি কী তোলাই তুলত! একেবারে হুবহু। পরে সুরেশ্বরের কাছে হিন্দুস্থানি গানে শক্ত শক্ত তানও ও এমনি হুবহুই তুলত—শুনত একবার দুবার বড় জোর তিনবার—যেন মনে জটিল তানগুলোর চলাফেরার এক একটা নক্সা ছ'কে নিত—তার পর ওর কণ্ঠের বিদ্যুৎ ঝিলিক খেলে যেত সেই ছকের সর্পিল রেখাপথে। এইখানেই ও জানত কি একটা জাদুবিদ্যা। ওকে দেখে মনে পড়ত আমার প্রায়ই ঋষিদের একটা উপমা—'শরবৎ তন্ময়ো ভবেৎ'। সত্যি, ওর গানের মন ছিল লক্ষ্যমুখী বাণের ম'তই তন্ময়। সুরের মধ্যে লীন হ'য়ে নিজের বিচ্ছিন্ন চেতনাকে হারিয়ে ফেলতে পারার দুর্লভ শক্তি ওর কাছে ছিল অতি সুলভ—যেন সহজাত। ওর গান নানা মনকে নানাভাবে দুলিয়ে তুলত। কেউ শুনে বলত: 'কী কোমল কণ্ঠ! যেন ফুলের পাঁপড়ি!' কেউ বলত: 'কী নমনীয়! ঠিক যেন মাখন!' কেউ বা বলত: 'ঝর্ণা!' কেউ—'বিদ্যুৎ!' কেউ বলত 'কী সুরের কান!' কেউ বলত: 'কী

সুরে স্থিতি!' কেউ বলত: 'গলার কী কসরৎ—এক পর্দা থেকে আর একটা পর্দায় টুপ্ ক'রে লাফিয়ে যায় দেখেছ, যেন কাঠবিড়ালি! কখনো কি পিছনে পড়ে এতটুকু!' সত্যি বীণাপাণি সব ঐশ্বর্যই ঢেলে দিয়েছিলেন ওর কণ্ঠে—ঝঙ্কারের সমস্ত ঐশ্বর্য কম্পনের সবরকম মাদকতাই ব'য়ে এনে দিয়ে গিয়েছিলেন ওর শুভ্র কুমারী কণ্ঠে, প্রাণে, হৃদয়ে। ঠাউরে পেতাম না সময়ে সময়ে—কোন্‌টা ছেড়ে কোন্‌টার তারিফ করি। কিন্তু তবু আমি বলব ওর সবচেয়ে বড় প্রতিভা ছিল এই তন্ময়তার প্রতিভা—গানে নিজেকে এই নিঃশেষে ভুলতে পারা। পুরুষের মধ্যে এতখানি তন্ময়তা আমি দেখেছি আগে—যদিও খুব বেশি নয়। কিন্তু মেয়েদের মধ্যে দেখি নি আর—অন্তত এমন নিখুঁৎ নিটোল রূপে নয়। গানের সময়ে ও সত্যিই ভুলে যেত যে ও মেয়ে—যেটা বোধহয় সবচেয়ে কঠিন মেয়েদের পক্ষে। কিন্তু ওর ছিল না আত্মসচেতনার কোনো বালাই। শুধু গান গাইবার সময়ে নয়—শোনবার কি শিখবার সময়েও ওর যেন বিশ্বভুল হ'য়ে যেত যেমন হ'ত অর্জুনের লক্ষ্যবেধের সময়ে—পড়েছিলাম মহাভারতে সেই কোন্ ছেলেবেলায়।"

থেমে থেমে বলে অসিত স্মৃতিচারণী হর্ষ বিষাদের সুরে:

"মনে পড়ে কত কথাই যে!...এক একটা গান শেখাচ্ছি—কোথাও একটা কোন্ পর্দা ঠিক বাজছে না সুরটায়। অমনি ধরেছে ও। বলল: এখানটা অসিদা? আমি একটু গুনগুন করছি সেখানটা নিয়ে আর ভাবছি সত্যিই তো এখানটা ঠিক তেমন লাগসৈ হয় নি! হঠাৎ ও বলল: 'ঐ ঐ ঐ খোঁচটা—চেপে ধরো অসিদা, দিও না ফস্কে যেতে।' এমনি ছিল ওর শ্রুতিবোধ।..শুধু শ্রুতিই বা বলি কেন? সহজাত গভীর বোধও ছিল কি কম? বেশ মনে আছে এক মস্ত গাইয়ে খুব

গাইলেন কোনো এক জলসায়—আমাদেরই ওখানে। তাঁর গানে ছিল সবই কেবল ছিল না ভাবের আবেগ—ইন্‌স্পিরেশন। কণ্ঠের জৌলুষ, তানের বিদ্যুৎগতি, সুরের ভঙ্গি, সার্গমের নৈপুণ্য সবই ছিল অপর্যাপ্ত, শুধু আন্তরিকতার ভাঁড়ে মা ভবানী।'

কিন্তু শ্রোতারা সচরাচর চায় চমক—আন্তরিকতার জহুরি কম, বিশেষ ক'রে ওস্তাদি গানের রাজসভায়। কাজেই অধিকাংশ শ্রোতাই মসগুল হয়ে উঠেছে এ গুণীর গানে—মাথা নড়ছে অন্তত দু'ডজনের ঘাড়ের বোঁটায়। ও কিন্তু অনড় অচল পাথরের মতন। গুণী যতবার তাকায় ওর দিকে ও চোখ নিচু করে। ব্যস্‌। ভালো লাগলে ওর চোখে আলো উঠত জ্বলে সূর্য্যের আলোয় শিশির বিন্দুর ম'ত, তখন ও উচ্ছ্বাসে দুলে দুলে শুনত—থাকতে পারত না না দুলে। কিন্তু এ গুণীর গানে ও রইল স্তম্ভের মতন স্থির। আমি বুঝলাম সবই। তবু খাওয়ার টেবিলে জিজ্ঞাসা করলাম নটের মতন আবৃত্তির ভঙ্গিতে: 'শুনি রাণীর কী মত?'

"ও বলল কাঁদ কাঁদ সুরে: 'এত কসরৎ ক'রে উনি এ কী গান শিখেছেন অসিদা? কেন শিখলেন?' দেবদা প্রীতি প্রতিমা সবাই তাকালো ওর দিকে অবাক হয়ে। কিন্তু আমি ওকে বললাম আদর ক'রে 'না ছায়া—তোমার বেপরোয়া রায়ের জন্যে কাউকেই দেব না তোমাকে ধমকাতে। তুমি ধরেছ ঠিকই। এ হ'ল কণ্ঠবাদন—গান নয়, সারেগামার কসরৎ এ—সুরের আরাধনা নয়।' দেবদা বলল: 'আমি অবশ্য বুঝি না—কিন্তু অনেক বড় বড় সমজদারই তো দেখলাম উচ্ছ্বসিত?' আমি হেসে বললাম: 'তোমার মনে নেই দেবদা, সেদিন তোমাকে বলছিলাম যে সাড়ে পনের আনা ওস্তাদি গানের কোনো অভাবই নেই কেবল অন্নবস্ত্রের ছাড়া, সমজদাররা তো চান না গান, চান কসরৎ—নৈলে সমজদার হবেন কী ক'রে?'

"প্রীতি বলল: 'কিন্তু কসরৎ ভালো লাগে ব'লেই তো চান?'

"বললাম : 'যার যেমন রুচি প্রীতি, উপায় কি বলো?—ঐ এক জায়গায় এসে মুখে রা থাকে না। রুচি—ব্যস্ খতম—the last word.

"ছায়া বলল তেম্‌নি করুণ সুরেই : 'কিন্তু এমন রুচি মানুষের হয় কোত্থেকে অসিদা? গান গায় কি মানুষ হকচকিয়ে দিতে! না মন ভিজোতে? বলো না ভাই—আমিত বুঝি না গানের কিছুই।'

"এ ওর নম্রতা নয় কিন্তু। ও সত্যিই ছিল স্বভাবে আত্ম-অচেতন। তাই হাজার বললেও ওর মন বিশ্বাস করতে পারত না যে গানে ওর প্রতিভা অনন্যসাধারণ, সহজবোধ আশ্চর্য। তাই তো ওর এত বেশি ভয় করত গান আরম্ভ করার সময়েই—যদিও একবার সুর ধরতে না ধরতে ওর হ'ত আমাতে আর আমি নেই অবস্থা, তখন ও হ'য়ে উঠত একেবারে অন্য মানুষ—না মেয়ে না ছেলে, হ'য়ে দাঁড়াত শুধু মূর্ত গান, শরীরী সুর। ওকে আমি চেষ্টা করতাম নিজের শক্তিতে একটু বিশ্বাসী করাতে—কিন্তু দেবদা টুকত। বলত : 'দেখো অসিত, যেন গুমর ওকে পেয়ে না বসে—তাহ'লে কিন্তু দেব আমি দেয়ালে ওর মাথা ঠুকে—কোনো কথাই শুনব না তোমাদের। আমি হেসে বলতাম : 'সে ভয় কোরো না ভাই—সেজাতের মেয়েই নয় ও। আমার ওর সম্বন্ধে ভয়টা উল্টোদিকে পাছে নিজেকে কিছু না কিছু না করতে করতে ও নিজের 'পরে শ্রদ্ধা হারিয়ে কিছু-না-ই ব'নে যায়।'

"সত্যি নির্মল," বলে অসিত. "এ-হেন প্রথম শ্রেণীর প্রতিভার মধ্যে এ ধরণের আত্ম-অবিশ্বাস আর কখনো আমার চোখে পড়ে নি। সত্যিই যখন ও এইভাবে কাঁদ কাঁদ সুরে অনুযোগ করত, কি জিজ্ঞাসা করত গানের সম্বন্ধে কিছু—মনে রাখা শক্ত হ'ত যে বয়সে ও শিশু নয়। অথচ মজা এই যে এই সব ধারণা ওর উঠত এত গভীর অন্তর থেকে যে টলানো যেত না ওকে—না বুঝিয়ে, না ধমকে, না তুতিয়ে পাতিয়ে। কথা বলত ও হৃদয়ের ছন্দে। কাজেই হৃদয়ের দরবারে যে-যুক্তি মঞ্জুর সে ছাড়া আর

সব যুক্তিই ছিল ওর কাছে অচল টাকার সামিল। একটা উদাহরণ দেই : কনফারেন্সে সেবার এক মস্ত বাই সাহেবা গাইলেন ঠুংরি। মামুলি ঠুংরি আমাকে স্পর্শ করে নি একটুও। সৃষ্টি প্রতিভার কোনো স্ফুরণ আমি দেখতে পাই নি। কিন্তু আজব শহর কলকাতা—একেবারে হুলস্থূল—এরকম ঠুংরি নাকি কেউ গায় নি মৈজুদ্দিনের পর। কোথায় মৈজুদ্দিন আর কোথায় সে বাই সাহেবা—কিন্তু হুজুগের হাউই যখন তারা কাটে তখন হুতুশেরা হাঁকে 'আরো দুর্দান্ত দাপটে যে এরই নাম নক্ষত্র।' কাজেই সবাই উঠল মেতে। কিন্তু ওকে টলাতে পারল না কেউ। ও গান শুনে এসে গুম্ হ'য়ে, ব'সে রইল—প্রীতি অনেক জিজ্ঞাসা করতে বলল : 'এরই নাম যদি ঠুংরি হয় মাসিমা তবে আমাকে অন্তত ঠুংরি শিখতে বোলো না, লক্ষীটি!' ব্যস্। আর একটি কথাও নয়।

"কিন্তু এর পরেই একদিন এক আসরে শোনালাম ওকে অজয়ের গিটার। "কী সুন্দর অসিদা! মাসিমা!' বলতে বলতে মেয়ের চোখ জলে ভ'রে আসে আর কি। অজয় বাজিয়েছিল সাদামাটা কীর্তনের সুর 'যমুনা এই কি তুমি সেই যমুনা প্রবাহিনী'। কিন্তু সত্যি, এই অতি মামুলি ঢঙে ও যেন নতুন প্রাণসঞ্চার করল ওর শিল্পী হৃদয়ের তাপ দিয়ে। প্রতি মিড়ে ওর ঝ'রে পড়ে মধু। বুকের মধ্যে কেমন ক'রে ওঠে ওর এক একটি ঝংকারে। অজয়ের আজো তেমন নামডাক হয়নি। প্রতিষ্ঠার ও কাঙাল নয় কস্মিনকালেও। তাই ছায়ার সঙ্গে ওর ভারি ব'নে গেল—ও একটু ওস্তাদিপন্থী হ'লেও। অবশ্য ভালো চালের ওস্তাদিপন্থী—তবু ওস্তাদি তো। কিন্তু ছায়া ওস্তাদি গানের বিশেষ পক্ষপাতী না হওয়া সত্ত্বেও অজয়ের গুণপনায় মুগ্ধ হ'ল। অজয়ও রীতিমত আকৃষ্ট হ'ল ওর কণ্ঠলাবণ্যে। ক্রমশ অজয়ের তবলার সঙ্গে গাওয়া ছায়ার একটু রপ্ত হ'য়ে আসতে অজয় তবলারও সঙ্গত সুরু করল সানন্দেই। এইখানেই ছিল ওর স্বভাবের মাধুর্য। তবলায় ও সত্যিই একজন প্রথম শ্রেণীর বাজিয়ে।

ওরকম তবলা জীবনে কমই শুনেছি। ছায়া তো উচ্ছ্বসিত : 'কী সুন্দর হাত অজয়বাবুর অসিদা! মাসিমা!' ব'লে একবার ও তাকাবে আমার চোখের পানে আস্তে আমার পাঞ্জাবীর হাতায় টান দেবার সঙ্গে সঙ্গে, একবার তাকাবে মাসিমার দিকে। গানের সময় ও বসবে সর্বদা আমার কাছ ঘেঁষে খুবই কাছাকাছি! কারণ এই পাঞ্জাবিটুকু টানা ওর চাই, নইলে অনেক সময়ে ওর দিকে তাকাতে আমি ভুলে যেতাম কি না। আমার কাছ থেকে একটুখানি সায় না পেলে ওর সংশয় কাটত না - যা ভালো লাগছে তা সত্যিই ভালো কি না। কিন্তু আশ্চর্য এই যে, যা ওর ভলো লাগত না তা যে ভালো নয় এসম্বন্ধে ওর মন ছিল একেবারে নিঃসংশয় মেঘমুক্ত। এই দুটো ভাব ওর মুখে প্রায়ই খেলত পাশাপাশি—কেননা ওস্তাদি গানের আসরে ওকে নিয়ে যেতাম আমি প্রায়ই আর বলাই বেশি সেখানে খারাপ ওস্তাদি গানই হ'ত বেশি। সে সময়ে ও মুখ নিচু ক'রে গুম্ হ'য়ে বসে থাকবে। কিন্তু যেই কোনো প্রাণস্পর্শী গান কি বাজনা হবে ও টানবে ঘন ঘন আমার পাঞ্জাবির হাতা—অতি আস্তে—ওর উদ্দেশ্য তো লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করা নয় ওর দরদী দৃষ্টি আকর্ষণ করা। আমি হেসে ওর দিকে তাকাতেই ওর অচঞ্চল ডাগর চোখ দুটি আমার চোখের 'পরে রেখে কথা ক'য়ে উঠবে নীরব চোখের আলোর সিগনালে। আনন্দ অসহ্য হ'লে আমার কানের কাছে মুখ নিয়ে এসে বলবে 'কী সুন্দর অসিদা! কিন্তু মাসিমা এসব আসরে একটু দূরে থাকত তাই পরের মিড় 'মা-সি-মা'-টা ওর উহ্যই থেকে যেত মাসি বোনঝির কেবল চোখোচোখেই হ'ত।

"এই তো গেল ওর শোনার দিক। কিন্তু শেখা ও শোনার রীতি ওর অনন্যতন্ত্র হ'লেও ওর শ্রেষ্ঠ দিক ছিল নিশ্চয়ই ওর গাওয়ার দিক। সেখানেও ওর বৈচিত্র্য ছিল যথেষ্ট। কারণ ও যার গানই গাইত তার ঢঙ অবিকল ফুটিয়ে তুলতে পারত ওর কণ্ঠের আশ্চর্য প্রকাশ-প্রতিভার গুণে। প্রতি গানের স্বধর্ম ওর কাছে ধরা দিত পরমানন্দে—আপনা

থেকেই। অবিশ্যি যারা ওকে বা ওর গানকে দেখতে পারত না তারা বলত উপহাসের হাসি হেসে—'নকল!' কিন্তু ওর গান নকল ছিল না। ও যে প্রতি গানে করতে পারত প্রাণপ্রতিষ্ঠা—নকলপন্থী হবে কেমন ক'রে? বার্ণার্ডশর একটি জীবনীতে একবার পড়েছিলাম বিখ্যাত ইতালিয়ান অভিনেত্রী এলিওনোরা দুজেকে তিনি সার্টিফিকেট দিয়েছিলেন যে সে যখন পার্ট অভিনয় করে সেই পার্টের ভেতরে ডুবে যায় তখনকার মতন ব'নে যায় সেই মানুষ নিজের সত্তা হারিয়ে। ওর গানের বেলায়ও এই কথা: যখন ও গান করত যেন ও সেই গানই ব'নে যেত। যখন বাউল গাইবে মনে হবে ঠিক একটি বাউল একতারা বাজিয়ে ডেকে আনল মেঠো সুর। ভাটিয়ালি গাইবে তো নদীর সুর তুলবে ছলছলিয়ে। কীর্তন গাইবে তো ভক্তির বন্যা দেবে বইয়ে। আবার আধুনিক ফ্যাশানেবল বাংলা গান গাইবেও তেমনিই হাল ফ্যাশানের অপলকা ঢঙে। বছর দেড়েক পরে যখন সুরেশ্বরের কাছে হিন্দুস্থানি খেয়াল শিখতে সুরু করল তখনও ঠিক এমনিই সহজে আয়ত্ত ক'রে নিত তার দুরূহ চালের। খেয়াল খাস সুরেশ্বরী ঢঙে। অনেকে আমার ওপর সাংঘাতিক রাগ করেন ওকে প্রতিভাময়ী বলার দরুণ। কিন্তু এই বহুমুখী কৃতিত্ব, গীতিনৈপুণ্য, ভাবাবেশ, তন্ময়তাকেও যদি প্রতিভা নাম না দেব তবে প্রতিভা বলব কাকে আমি তো অন্তত ঠাউরে পাই না।"

প্রমীলা: তা তো বুঝলাম। কিন্তু সবচেয়ে ভালো গাইত ও কী ধরণের গান?

অসিত: ভাবের গান। না—ভাব বলতে এখানে আমি শুধু ভক্তিভাবের গান বুঝছি না। যে কোনো গভীর ভাবের, নিবিড় উচ্ছ্বাসের গানও গাইতে পারত নিখুঁত ঢঙে। ভক্তির গান হ'লে তো কথাই নেই, কারণ ভক্তির আলো যখন ওর কণ্ঠের আয়নায় প্রতিফলিত হ'ত তখন এতটুকু আলোর লোকসান হ'ত না—গানের ভক্তিভাবের যোলো

আনাই ও ফুটিয়ে তুলত ওর সুরের ঢেউয়ে ঢেউয়ে। না—তারও বেশি : ওর কুমারী হৃদয়ের নির্মলতার গুণে যেন ভক্তির ভাবটুকু আরও স্বচ্ছ আরও প্রাণস্পর্শী হ'য়ে ফুঠে উঠত। মনে হ'ত তখন—প্রায়ই যেন ওর তন্ময় আরাধনার প্রতি ভাবে বীণাপাণির সাড়া উঠত বেজে। কিন্তু এসব বলছি এমনিই মিলি—বলতে ভালো লাগে ব'লে। ব'লে ফল নেই—জানি।

প্রমীলা : এমন কথা কেন ভাই?

অসিত : কারণ গান হ'ল গান এই জন্যে। অর্থাৎ সে ছবি নয়, কাব্য নয়, ভাস্কর্য নয়—সে স্বভাব-পলাতক—তার ব্যাখ্যা হবে কী ক'রে? গানকে এই দিক দিয়ে বলা যেতে পারে জন্মদুঃখিনী সীতা—কেন না বৈদেহী। বড় জোর—আলো কায়া। কিম্বা বলা যেতে পারে সুধা-সমুদ্রের ঢেউ—যার ধর্ম হ'ল শুকনো চরে ফুল ফোটানো। কিন্তু এ সাক্ষ্য দেয় কে?—কেবল সেই চর যাকে এ-ঢেউ রেখে গেছে উর্বর ক'রে। কিন্তু যে সব চরে পৌঁছায় নি এ ঢেউ তাদের কাছে বলা কি বৃথা নয় যে এমন রস আছে যাতে শুকনো বালিও ফুলে তাজা হ'য়ে ওঠে? গান হ'ল গেয়ে দেখানোর জিনিষ—মন ভিজিয়ে পরকে আপন করবার জিনিস বুঝিয়ে বলবার জিনিস তো ও নয় ভাই। তাছাড়া এও তো মানতে হবে যে, গানের আবেদন হ'ল শিল্পের মধ্যে সবচেয়ে সুকুমার, সবচেয়ে নরম, সবচেয়ে অধরা—এই আছে এই নেই। গানের রূপ আছে ওজন নেই, রস আছে স্পর্শ নেই, আনন্দ আছে ব্যাকরণ নেই। ওকে যে গ্রহণ করবে তাকেই আসতে হবে ওর কাছে, ও কারুর কাছে যাবার পাত্রী নয়। উপযাচিকা যে হ'তে চায় সে হোক—ও হবে না কোনো দিনও। ওর আসল রূপ হ'ল বরদাত্রীর করুণায়। যে চায় এ-করুণা তাকে সাধনা করতে হবে—শুধু দাবি করলে মিলবে না করুণাময়ীকে। ওর সবচেয়ে কাছে আসে কে?—বোধ হয় ফুলের গন্ধ।...নেশা জাগিয়ে, স্মৃতি রাঙিয়ে

ভার ছুলিয়ে গেল চ'লে—এপার থেকে ওপারে। ব'য়ে যাওয়া ভেসে যাওয়াই বটে, যে ছন্দে আমরা চলি দৈনন্দিন জীবনে তার উদ্দেশ্য আছে লক্ষ্য আছে অন্তত একটা হিসেব আছেই! কিন্তু গানের নেই কোনোই হিসেব কিতেব। ও হ'ল আকাশের পদ্মকুঁড়ি, ফোটে স্বপনের মৃণালে। আনমনা ও—নাম-না-জানা আনন্দে বেদনায় ওর আসা যাওয়া। ছায়ার মুখেই একটি গান মনে পড়ে অমর কবির"—ব'লে অসিত ধরে গুণ গুন ক'রে:

(আমরা) অরুণ কনক কিরণে চড়িয়া নামি,
(আমরা) সান্ধ্য রবির কিরণে অস্তগামী,
(আমরা) শরত ইন্দ্রধনুর বরণে
জ্যোৎস্নার মত অলস চরণে
চপলার মত চকিত চমকে
চাহিয়া ক্ষণেক হেসে যাই।
(আমরা) এমনিই এসে ভেসে যাই॥

"কত সত্যি কথা মিলি," বলে ও আবিষ্ট স্বরে। "গান কী জিনিস বল্ এই ঢেউ ছাড়া? ও কি বলে? না তো ও ভেসে যায়—তাও মাটি ছুঁয়ে নয় হেলে দুলে একে বেঁকে হাওয়ায় ভর ক'রে অথচ উড়ে যাওয়াও তো নয়—কেননা ওর কোনো লক্ষ্য নেই—না ওড়ার শ্রম। ও চলে ভেসেই বটে আপনারই তরল লীলায় মুগ্ধ নেশায়। কেন? কেউ কি জানে?

"কিন্তু এসব কথা বলতে গেলে একটু কেমন কেমন লাগে, না? কেমন যেন—কী বলব? মাটিছাড়া গোছের—অবাস্তব, না? আমার কাছে মনে হয় গানের চেয়ে বাস্তব আনন্দ জীবনে কমই আছে, কিন্তু যার কাছে মনে হয় ও হ'ল কবিত্বের রামধনু তাকে কী ক'রে বোঝাব যে রামধনু মাটি ছাড়া ব'লেই যে কম বাস্তব একথা সত্য নয়? এসব তো প্রমাণের বস্তু

নয় ভাই যে দলিল দস্তাবেজ কোনো কাজে আসবে। বড় জোর একটু আভাস দেওয়া যায়—তাও আবার সবার কাছে নয়। কারণ ঐযে বললাম, গানের যে ঠাট-ঠমক, ভাবরূপ, গতিবিধি, তার ছন্দ আছে কিন্তু আঘাত নেই, ছোঁওয়া আছে কিন্তু ধরা নেই। যে ওকে জানল সে মানল, কিন্তু যে জানল না তার কাছে এ সব কথা কথা বৈ আর কী? তাই স্বভাবদোষে ছায়ার গানের গুণগান ক'রে ফেলি বটে, কিন্তু তার পরেই আসে অনুতাপ। এখন বুঝেছিস ওর কথা বলতে আমি কেন কুণ্ঠিত হচ্ছিলাম? দরদ হ'ল স্বভাব-পর্দানসিন। তাইতো মানুষ সবচেয়ে বেশি ডরায় মনের কথা বলতে, মুখ খুলতে ভরসা পায় না দরদী না পেলে, কারণ এক দরদীই বোঝে তার দরদ দিয়ে। আর সবাই যদি প্রকাশ্য ঠাট্টা নাও করে হাসে মুখ টিপে, বলে—'উচ্ছ্বাস!'

"কিন্তু গভীর আবেগের প্রকাশ উচ্ছ্বাস নয় মিলি! উচ্ছ্বাস হ'ল সেই আবিলতা যার মায়ায় আমরা ছোটকে বড় করি। কিনা অসত্য বলা। কিন্তু বুকের তার যখন সত্যি বেজে ওঠে তখন সে ঝঙ্কারের নাম উচ্ছ্বাস নয়, মিথ্যা ভাববিলাস নয়। যদি হ'ত, তাহ'লে জীবনে থাকত শুধু ধুলো আর বালি, পাঁকে ফুটত না পদ্ম, পাষাণের বুক চিরে ছুটত না নির্ঝরিণী। মানি জীবন বড় বেশি গড়পড়তা—mediocre, কিন্তু তাই তো অসামান্যের দেখা পেলে আনন্দ রাখতে পারি না—বলি 'প্রেয়ো বিত্তাৎ প্রেয়ো অন্যস্মাৎ সর্বাৎ'—তুমি আমার প্রিয়—ধনের চেয়ে প্রিয়, সুখের চেয়ে প্রিয়, সবার চেয়ে প্রিয়। মনে পড়ে যোগিকবি এ-ইর একটি শ্লোক।

We kiss because God once for beauty sought
Within a world of dreams.

এর নাম আনন্দ গৌরব—'বঁধু তোমারি গরবে গরবিনী হাম রূপসী

তোমারি রূপে—' একে উচ্ছ্বাস ব'লে উড়িয়ে দিয়ে এমন কিছুই থাকে না যার জন্মে জীবনধারণ সার্থক।

খানিকক্ষণ কেউ কথা কয় না। তারপর অসিতই বলে সুর নামিয়ে: "বয়স যতই বাড়ে মিলি, ততই মানুষ ডরায় মনের গভীর কথা প্রকাশ করতে—বিশেষ ক'রে কথায়। এই জন্মেই বোধ হয় শিল্পের safety valve তৈরী করেছেন বিধাতা। কারণ গভীর কথা গভীর সুরে বলতে চাওয়ার মধ্যে যে আকুলি-বিকুলি আছে সেটা তো সত্যিই ছেলেমানুষি কি উচ্ছ্বসিয়ানা নয়।...তাই হয়ত মানুষ এত দুঃখ পায় যখন আলাপ-আলোচনায় তাকে নিরন্তর সাবধান হ'তে হয়—গানে কবিতায় চিত্রে যাকে নিয়ে চোখের জল ফেলি কথাবার্তায় তাকে নিয়ে এতটুকু বাড়াবাড়ি করতেও ডরাই। কেন এমন হয় সময়ে সময়ে ভাবি। ছায়ার অন্তর্ধানের পরে এ-প্রশ্নের যেন একটা উত্তর পেয়েছি। সেটা এই যে, সুর ও ছন্দ বাদ দিয়ে কোনো গভীর ব্যথাই নিজেকে জানান দিতে পারে না—তাই দরদ যেখানে বেশি সেখানে আব্রু খসাতে বাধে—বলতে সাধ হ'লেও ভরসা পাই না আমার গানের সূক্ষ্ম বিকাশের কতবড় একটা দিক আঁধার ক'রে চ'লে গেছে ঐ একরত্তি মেয়েটা। কারণ..." অসিত ফের থামে.. "কারণ এ-বেদনাকে ফুটিয়ে তুলব কেমন ক'রে? হারানোর অতল শূন্যতার কি কোনো সাক্ষী আছে যাকে তলব করা চলে? তাই এবার ফিরে আসি সেই লোকে যেখানে বাস্তবতার কিনা ঘটনার, এজাহার আছে।—রোস্ আমাকে ভুল বুঝিস নে যেন এখানেও। মনে করিস নে—বাস্তবতার তরফে সাক্ষী বেশি মজুদ ব'লেই রসলোকে তাকে বেশি সত্য বলে আমি মনে করি। বরং উল্টো। কারণ গভীর ভাবের ভাবুক যাঁরা তাঁরা সবাই জানেন যে আনন্দ যতই গভীর হয় ততই সে এড়িয়ে যায় বাইরের সাক্ষীদেরকে। কাজেই রসতৃষ্ণায় গভীরতাই যদি বহুবাঞ্ছিত

হয় তবে মানতেই হবে তার তৃপ্তি নিবিড় নিটোল হ'য়ে ওঠে ঐ অধরারই এলাকায়। ছুঁতে পারি একটু, তাই আনন্দ ধরে না—ধরতে যে পারি না সে বেদনাও কিন্তু ঐ একই আনন্দ কেবল উল্টো সাজানো। এ ত কথার কথা নয়। অন্তত গান যে একটিবারও গেয়েছে প্রাণ দিয়ে সে জানেই জানে যে গভীর বেদনা আর আনন্দ অভিন্ন। আর তখন এমন কি 'মায়া'র মতন খাসা কথাটাও কাজে আসে না…গান তো কিছুকে আড়াল করে না, প্রকাশ করাই যে ওর কাজ—কখনো অশ্রুর মধ্যে দিয়ে ফোটায় হাসি, কখনো হাসির মধ্যে দিয়ে অশ্রু · কখনো বিরহের মধ্যে দিয়ে মিলন, কখনো মিলনের মধ্যে দিয়ে বিরহ।—কিন্তু এসব এখন থাক। কারণ ওর সম্বন্ধে আরো কিছু বলার আছে যেটুকু না বললে ওর গানের মর্মকথাটুকুও না-বলাই থেকে যাবে। তাই আসি এ শেষ অধ্যায়ে। তবে দাঁড়া—একটু যেন শীত শীত করছে—আর একটু কফি দে তো দেখি ফ্লাস্ক থেকে।"

প্রমীলা টপ ক'রে ওর কপালে হাত দিয়ে বলল: "এ কী ভাই। গা যে ফের গরম—বললাম তোমাকে বাইরে না—তা কথা শুনবে না—দেখ দেখি বেশ সেরে গিয়েছিল, ফের জ্বর এল বুঝি ঠাণ্ডা লেগে।

অসিত ঠাট্টার সুর ধরল: বাঁচা গেল ভাই। লজ্জানিবারণ মান রাখলেন। বলার পথ রইল যে উচ্ছ্বাসটার বাড়াবাড়ি হ'ল এই জ্বরেরই তাড়সে।"

নির্মল হাসল না এবার, বলল গম্ভীর সুরে: এখন গা তুলতে আজ্ঞা হবে কি? বচনে সর্বনাশ তো হয়েছে এখন শয়নে পদ্মনাভের পালা।

* * *

ডাক্তার এলেন নির্মলেরই মোটরে। পরীক্ষা ক'রে বললেন ভয়ের বেদনাই কারণ নেই, তবে বুকে একটু সর্দি বসেছে, ফের ঠাণ্ডা না লাগে। সবল দেহ, জ্বর সাধারণ। না—তানমার্গ থেকে শ্রীনগরে নিয়ে যাওয়ার

দরকার নেই, বরং এখানকার হাওয়াই বেশি স্বাস্থ্যকর। দেখতে দেখতে সেরে যাবে।

প্রমীলা আশ্বস্ত হ'য়ে অস্ফুটে বলে : "সর্বরক্ষে।"

পঞ্চমীর বাঁকা চাঁদ মেঘের সঙ্গে লুকোচুরি খেলছে। কী সুন্দর! শয্যায় শুয়ে সার্সির মধ্যে দিয়ে অসিত মুগ্ধনেত্রে চেয়ে চেয়ে দেখে। অদূরে গুলমার্গের তুষারলোকে চাঁদের পাণ্ডুর আভা কী অপরূপ ফুটেছে!... মনে পড়ে পেশোয়ারে সেই ছায়াদের সঙ্গে এমনি একটি কুটীরেই ওঠা—সেখানেও ঠিক এম্‌নি বড় বড় জানলা ছিল আর সামনে একটা বকুল গাছ। বকুলের গন্ধ ভেসে আসে। কাশ্মীরে বকুল গাছ এই ও প্রথম দেখল্। অনেকগুলো ঝরা বকুলে ঘরের মেঝে ছেয়ে গেছে। হাওয়ায় উড়ে এসে থাকবে। ছায়া কী ভালোই বাসত বকুল ফুলের মালা গাঁথতে! তাই হয়ত অত আগ্রহ ক'রে শিখতে চেয়েছিল অমর কবি-সুরকারের সেই মালা গাঁথার গানটি যেটি অসিত মোটরে কাশ্মীর যাবার পথে ওকে শিখিয়েছিল মোটরে বসেই :

আমি সারা সকালটি করি নাই কিছু, করি নাই কিছু বঁধু আর
শুধু বকুলেরি তলে বসিয়া বিরলে মালাটি আমার গেঁথেছি।

কী অপরূপ গাইত ও—নাই-এ হুবহু অসিতের মিড়ভঙ্গিম তানটি দিয়ে। বাংলা গানে এ ধরণের তান ছায়া ছাড়া আর কে দিতে পারত—এমন স্বচ্ছন্দ ভঙ্গিতে?

বেশ লাগে ওর শুয়ে শুয়ে এই সব স্মৃতির ছবিগুলোকে ফের রঙিয়ে তুলতে। অসুস্থ হওয়ার মধ্যে একটা আরামও আছে বেশ। দায়িত্ববোধ তখন থাকে না। মানুষের মধ্যে আত্মসমর্পণের তৃষ্ণা গভীর। সুস্থ শরীরে এ-তৃষ্ণা মেটে না। বলিষ্ঠতার হাজারো দায়িত্বজ্ঞান। 'শক্তি' না থাকলেও সে চায় 'পতাকা' বইবার ভার। তাই বুঝি রোগ দেখা দেয় সময়ে সময়ে শাপে বর হয়—কেননা কেবল তখনই বলিষ্ঠ মানুষও

স্বচ্ছন্দে শিশু হ'তে পারে। শিয়রে ম্লানমুখী প্রমীলার দিকে চেয়ে বলে একথা হঠাৎ।

প্রমীলা রুষ্ট স্বরে বলে : চাইনে আমি তোমার আত্মসমর্পণ দাদা—শিশুকে আমি কোনোদিনই দেবতা মনে করি নি। কী যে তোমাদের এক কুসংস্কার আছে।

কে বলল শিশুদের মধ্যে নীচতা নেই ? অহৈতুকী নিষ্ঠুরতায়ও ওরা কিছু কম যায় না। তাছাড়াকম স্বার্থপর ওরা ? না, শিশু নিয়ে ও ধরণের উচ্ছ্বাস আমার একটুও ভালো লাগে না।"

ব'লে অসিতের আপত্তি সত্ত্বেও ওর মাথা টিপে দিতে দিতে : "তোমাকে কেন যে তানমার্গে তাঁবুতে রাংলাম তোমার কথা শুনে। নৈলে তো তোমার বুকে এমন সর্দি বসত না।"

"কে বলল ?"

প্রমীলা ঘাড় নেড়ে বলল : "আমি জানি। তুমি নিজেই তো বলো তোমার জ্বর কতদিন হয় নি।"

অসিত বলল : "কিন্তু এ জ্বর কে বলল ?"

"মানে ?"

অসিত হাসল : "মানে দেহের কোনো গলতি নয় আর কি।"

"ও।"

ওর মনে পড়ে যায় হঠাৎ প্রতিমার কথা। সেও থেকে থেকে 'ও' বলত যদিও ঠিক এ ধরণের মিড় দিয়ে না। আহা, সে কেমন আছে আজ ? সে যদি খবর পেত কী ভাবত অসিতের জ্বর শুনে ? বুঝতে পারত নিশ্চয়ই তার বলিষ্ঠ স্বাস্থ্যেও একটা চোট লেগেছে।

প্রমীলা হঠাৎ বলিল : আর একবার টেম্পারেচার নেব, হাঁ করো তো।"

প্রমীলা চেঁচিয়ে উঠল আনন্দে "পাঁচ পয়েণ্ট কমেছে।"

"দেখলি তো ?" অসিত ওর একটা হাত আদর ক'রে নিজের উত্তপ্ত কপালে রাখে। "বলিনি ? কাল দেখবি আমি চাঙ্গা হ'য়ে উঠে Johnny Walkerএর মতন ফের টহল দিয়ে বেড়াচ্ছি।"

"তোমার মুখে ফুল চন্দন পড়ুক ভাই—তাই যেন হয়। আমার কী যে দুঃখ হচ্ছে ! তোমাকে সারা সকালটা বাইরে ঠাণ্ডায় না বকালে কক্ষনো জ্বর আসত না ফের।"

"তুই এমন করছিস মিলি, যেন তোর অসিদাকে নিয়ে যমে মানুষে টানাটানি।"

প্রমীলা ওর মুখ চেপে ধরে : "কী যে সব অলুক্ষুণে কথা মুখে আনো ! কিছুদিন তোমাকে আর কথা কইতে দেওয়া চলবে না দেখছি। না না না। দোষ করেছ—শাস্তি পেতেই হবে। চুপ ! একেবারে চুপটি ! না, ওপাশ ফিরে শোও তো—আমি পিঠে একটু মালিশ দিই। কী। ডাক্তার বলেছে দিতে—দেবো না ? হ্যাঁ তোমার কথা আবার মানুষে শোনে। ফেরো—ফেরো।" ব'লেই ও স্পিরিট ল্যাম্প জালিয়ে তেল গরম করতে ব'সে গেল পাশের পাথরের টেবিলে।

কী করে ! ফিরে শুতেই হ'ল।

"ব্যথাটা ঠিক কোন্‌খানে ভাই !"

"ব্যথা ঠিক নয়।"

"না হোক চোটটা লেগেছিল কোন্‌খানে ?"

পিঠের মাঝ বরাবর—বাঁ কাঁধেই সবচেয়ে বেশি।"

"কিন্তু তিনচার বছর হতে চলল ভাই এখনো ব্যথাটা সারল না কেন ?

অসিত হঠাৎ ব'লে ফেলল : "আক্রমণটা একটু জোর হয়েছিল কি না।"

"আক্রমণ!" প্রমীলা চমকে ওঠে।

"হুঁ। কিন্তু যেতে দে ও কথা।"

মালিশের কথা বেমালুম ভুলে গেল ও, বলল: "বলো না ভাই, দুটি পায়ে পড়ি।"

অসিত হাসে: "এই যে বললি আর বকাবি না?"

প্রমীলাও হেসে ফেলে: "কেবল এই কথাটি। ফুরুলে নোটে গাছটিকে এমন মুড়িয়ে দেব—"

প্রায় দু তিন মিনিট তেল মালিশ করার পর অসিত কথা কইল: "তোরা বিশ্বাস করতে পারবি নে হয়ত—সেই ভয়েই বলতে চাইনি মিলি। কি জানিস? আমাদের চারদিকে নানান্ শক্তির আনাগোনা। এমন দৃষ্টি সাধনায় মেলে যার প্রসাদে তাদের সত্যি সত্যি চাক্ষুষ করা যায়।"

"কী রকম শক্তি—দৈত্য দানা?"

"শুধু তারাই নয়—আরো নানারকম জীব—দেবতা মহাত্মারাও।"

"তাদের দেহ আছে?"

"স্থূল দেহ নয়—তবে—কিন্তু এসব আমার শোনা কথা মিলি।"

"তবু বিশ্বাস হয়।"

"প্রথম প্রথম হ'ত না। কিন্তু পরে বুঝেছি যে যা নিজে দেখিনি তা-ই অবিশ্বাস্য এটা জ্ঞানের কথা নয়—অজ্ঞানেরই মিথ্যে অভিমান।"

"এ আমিও মানি। তবে যাঁরা দেখেছেন তাঁরা শ্রদ্ধেয় বুদ্ধিমান্ ও সত্যবাদী হ'লে তবে তো।

"খুব ঠিক কথা। কিন্তু যাঁদের কাছে আমি শুনেছি এসব শক্তির কথা—মানে যাঁরা দেখেছেন এদেরকে, তাঁরা শুধু সত্যবাদী শ্রদ্ধেয় ও

বুদ্ধিমানই নন—তার ওপরে জ্ঞানী এবং মহৎ। কাজেই অবিশ্বাস করার প্রশ্নই আসে না।"

"ও।"

একটু পরে: "এই সব শক্তিদেরই আক্রমণ হয়েছিল তোমার ওপর?"

অসিত ওর দিকে তাকিয়ে বলল: "এসব প্রসঙ্গ যাক দিদি। ফের শুধু ধোকা লাগবে—বিশ্বাস তো হবে না।"

প্রমীলা "আচ্ছা" ব'লেই মুখ ফিরোলো।

"ও কী রে! কী পাগলি তুই বল্‌তো? না লক্ষ্মী দিদি আমার—"অসিত উঠে ব'সে ওকে কাছে টেনে নেয়, বলে আদর ক'রে: "শোন্—আমি সব সইতে পারি, কেবল পারিনে সইতে এই তোদের চোখের জল। শোন্—মুখ তোল্। আমি বলব—হ্যাঁ সবই বলব—মানে অবশ্য যতটুকু জানি এসবের।

"আচ্ছা" বলল ও চোখ মুছে "কিন্তু না, উঠে বসতে দেব না। আর কথা বলবে খু—ব আস্তে আস্তে। আমার মালিশ তাল দিক তোমার গল্পের সুরে। কেমন?"

"আচ্ছা" ব'লে হেসে অসিত চিৎ হয়ে শুলো। প্রমীলা আস্তে আস্তে ওর বুকে মালিশ করতে লাগল।

অসিত বলল: "আমার এসব কথা বলতে একটু সঙ্কোচ আসে কেন জানিস? আমি এসব নিজে চাক্ষুষ করি নি ব'লে। যোগের কিছুই জানি না বলব না—তবে যাকে বলে occult—নেপথ্যতত্ত্ব—তার বেশি কিছু জানি না। আর জানি না ব'লে পুরোপুরি মানতেও বেগ পেতাম প্রথম প্রথম। কিন্তু এমন সব সতীর্থের কাছে শুনেছি এসব অভিজ্ঞতার কথা—যাঁরা সব দিক দিয়েই এত শ্রদ্ধেয়—তার ওপরে ঐ যে বললাম জ্ঞানী। কাজেই তাঁদের অকপট এজাহার অবিশ্বাস করা অসম্ভব। বিশেষ যখন সবার ওপর রয়েছে গুরুদেবের নিজের সাক্ষ্য। কিন্তু তবু হয় কি, মন

এসব মেনেও মানতে চায় না আমার। পরের মুখে ঝাল খাওয়ায় আপত্তি আমার একটু বেশি প্রবল কি না। অথচ গুরুদেবকে যে দেখেছে মেনেছে সে জানে যে তাঁর সাক্ষ্যে ভুল হওয়ার সম্ভাবনা কত কম। শুধু এই জন্যেই নয় যে তিনি জ্ঞানী—এই জন্যেই যে তিনি ব্রহ্মবিৎ। বৃহদারণ্যক বলেছে: ব্রহ্মকে যিনি অভয় ব'লে জানেন তিনি ব্রহ্মই হন। এ কথায় আমার আস্থা আছে—যদিও এ-আস্থার কথা বলা চলে কেবল তার কাছে যে স্বভাবে শ্রদ্ধালু। কারণ আধ্যাত্মিক সত্য শুধু বিচারে পাওয়া যায় না —শ্রদ্ধা হ'ল সে-সত্যের আলো-নামার একটি প্রধান সর্ত। গুরুদেবের কথা মানতে মন আমার রাজি হ'ল আরো এই কারণেই।"

প্রমীলা: মেনেই যদি নিই আগে থেকে—তাহ'লে সন্দেহ সংশয়ের তো প্রশ্নই ওঠে না।

অসিত হাসল ম্লান হাসি: "ওঠে ভাই। সাধনা যদি করিস কখনো দেখতে পাবি সংশয়ের গণ্ডি পেরুনো কী দারুণ কঠিন। চোখে দেখেও বিশ্বাস হয় না অতীন্দ্রিয় দর্শনদেরকে। মন প্রশ্ন করে—ঠিক দেখেছি তো-না সব ভুয়ো—কল্পনা! একথা আরো বেশি খাটে যখন লীলার সত্যকে জানতে চাই। বিশেষ করে ঐ যে বললাম নেপথ্যতত্ত্বকে।"

প্রমীলা: নেপথ্যতত্ত্ব মানে?

অসিত: আমাদের প্রত্যেকের চারধারে হাজারো শক্তির খেলা চলছে। আমরা জানি বা না জানি তাদের সঙ্গে আমাদের লেন দেন সর্বদাই চলছে: শুধু আমাদের চেতনার সঙ্গে তাদের চেতনার নয়—আমাদের দেহের সঙ্গে তাদের দেহের। কিন্তু আমরা ইন্দ্রিয় দিয়ে এসব ক্রিয়া-কলাপের হদিশ পাই না। এ হদিশ পেতে হ'লে একটা আলাদা জাতের ধারণাশক্তি দৃষ্টিশক্তি শ্রুতিশক্তি অর্জন করতে হয়। 'আলাদা জাতের' কথাটা হয়ত ঠিক হ'ল না। কেন না এসব শক্তি আমাদের

মধ্যেই গুহ্য হ'য়ে রয়েছে—দল-না-মেলা ফুলের মতন। সাধনায় তাদের পাঁপড়ি খোলে মাত্র। মরুকগে। যেটা বলতে চাইছি সেটা এই যে এই সব গুহ্য শক্তির পাঁপড়ি যখন যোগে এক এক ক'রে খুলতে থাকে তখন সত্যিই চাক্ষুষ করা যায় অনেক কিছু—কত অভাবনীয় শক্তির খেলা, অন্তরের ডাক ও উপরের সাড়ার নাট্যলীলা—দুঃখের মধ্যেও আশ্চর্য করুণা আরো কত কী। শুধু তাই নয়—সেই সঙ্গে অনুভব করা যায় এমন অনেক আলো বা আনন্দ যাদের কোনো দিশাই পায় না আমাদের মন বুদ্ধি ইন্দ্রিয়। এই সব তত্ত্বকেই বলা হয় গুহ্যতত্ত্ব বা নেপথ্যতত্ত্ব—occultism. আমরা যে-জ্ঞান নিয়ে চলি তারা যে যথেষ্ট নয় একথা আমরা বেশি ক'রে বুঝতে পারি যখন হঠাৎ আঘাত পাই, কি সঙ্কটে পড়ি। তখনই ঠিকমত দিতে শিখি জ্ঞানের মূল্য। জ্ঞান যে শুধু শান্তি বা চিত্তপ্রসাদ দেয় তা-ই নয়—ত্রাণও করে বহু দুর্দৈব থেকে, বাঁচায় বহু অলক্ষ্য আক্রমণ থেকে।

"অলক্ষ্য আক্রমণ মানে ?"

"বলছিলাম না আমাদের আশে পাশে নানা সূক্ষ্ম দেহীরা রয়েছে ? তারা কখনো বা হয় সহায়, কখনো অন্তরায়, কখনো করে আক্রমণ।"

"কিন্তু আক্রমণ করে কেন ?"

অসিত মৃদু হাসে: "এবার তুই আমাকে অপদস্থ করলি মিলি। কারণ এধরণের প্রশ্নের উত্তর দিতে হ'লে পূর্ণজ্ঞানী হওয়া চাই। তাই আপাতত শুধু এইটুকু জেনে আমাকে রেহাই দে যে আমাদের চেতনায় যেমন একদিকে বিকাশ হচ্ছে তেমনি অন্যদিকে সে-বিকাশের পথে বাধাও হানা দিচ্ছে—নিরন্তরই।

"বাধা ? কী ধরণের ?"

"তার কি কোনো দিশপিশ আছে রে যে নামকরণ করব ?—জড়তার বাধা, আলস্যের বাধা, রোগশোকের বাধা, অন্তর্বিদ্রোহের বাধা—আরো

কত রকমের বাধা আছে। সাধারণ জীবনেও এসব বাধার নানান্ সূক্ষ্ম চাল দেখতে পাওয়া যায়—কিন্তু যোগে এদের দেখা যায় যেন সাম্‌না-সাম্‌নি।" যোগে এরকমটা হয় কেন? না, যোগ যারা নেয় তারা ভাগবত শক্তির স্বপক্ষে তাদের সমস্ত জীবন দিয়ে দাঁড়ায় ব'লে, কাজেই তাদের ওপরে প্রায়ই আঘাত আসে বেশি, কেন না বিরুদ্ধ শক্তিরা জানে যে ভাগবত শক্তিদের বিকাশ হ'লে আসুরিকদের হবে ভাতে মারা। এই জন্যেই যোগপন্থীদের এত বেশি সাবধান হওয়া দরকার। গুরুর একটা প্রধান প্রয়োজনীয়তাও এইখানেই। তিনি অনেক অলক্ষ্য শক্তির আক্রমণ থেকে বাঁচান শিষ্যকে।

"তোমার পরে যে-আক্রমণ এসেছিল সে কি এই ধরণের কোনো আক্রমণ? মানে, যখন বাস উল্‌টে গেল তোমাদের?"

"জানি না মিলি। শুধু এইটুকু বলতে পারি অকুতোভয়ে যে আমি সে সময়ে প্রত্যক্ষ করেছিলাম দুটো শক্তিকে—একটা চাইছিল আমাকে মারতে, আর একটা—আমাকে বাঁচাতে।"

"ছায়াকেও কি এইরকম কোনো একটা শক্তি মারল?"

"গুরুদেবের কাছে তাই তো শুনেছি।"

"কিন্তু ভাগবত শক্তিরা তাহ'লে কি বেকারের দলে ভর্তি হ'য়ে চুপটি ক'রে থাকেন?"

অসিত হাসে: "এবার প্রশ্নটা তোর হ'য়ে আসছে ছেলেমানুষি। এর পরের প্রশ্নধারা হবে আরো সরলা নাবালিকা ঢঙের: ভগবান যদি ভালো লোক তবে এত মন্দকে কী ক'রে স'য়ে থাকেন তাঁর সৃষ্টিতে—কেন সব কাঁটাই রাতারাতি গোলাপ হ'য়ে উঠল না তাঁর বাগানে?—প্রশ্নটাকে আরো মোক্ষম ক'রে বলা যায়: সংসারে কাঁটার জন্ম হ'লই বা কেন, সবই কেন গোলাপ হ'ল না, কেন বিশ্বলীলায় জীবনেরই জয়জয়কার রটল না, মরণরূপী কলি আসতে পেল কোন্ ছিদ্র দিয়ে?"

"কিন্তু এসব তো জরুরি প্রশ্ন ভাই, জবাব না দিয়ে এড়িয়ে গেলেই বা চলবে কেন?"

"এড়িয়ে যাবার প্রশ্ন উঠছে না মিলি। তবে কি জানিস? এসব প্রশ্নের জবাব মেলে না মনের মহলে। জবাব যদি চাস যেতে হবে মনের পারে। যাওয়ার অবশ্য পথ আছে—কিন্তু সে-পথ সহজ নয়—দুর্গং পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি। তবে এসব হ'ল বড় বড় কথা—আমার মুখে সাজে না, কেননা আমি অনধিকারী, দিব্যদৃষ্টি লাভ করি নি, বলতে পারি না এখনো যে তমসার পারে সেই আদিত্যবর্ণ মহান্ পুরুষকে আমি জানি যাঁকে জানলে 'নাতঃ পরং বেদিতব্যং হি কিঞ্চিৎ' অর্থাৎ আর কিছু জানার থাকে না—যা-কিছু জানার তিনিই দেন জানিয়ে। তাই এইখানেই জবাব এল তোর প্রশ্নের: বিশ্বলীলার মধ্যে যে-সব ছন্দ আমাদের অসঙ্গত বা অশোভন মনে হয় তাদের তাৎপর্য জানতে হ'লে যেতে হবে তাঁরই কাছে যিনি প্রবর্তন করলেন এসব ছন্দ। বিশ্বলীলার সঙ্গে কাব্যলীলার তফাৎ এইখানেই যে কাব্যলীলার কাব্যরস পেতে হ'লে কবির পরিচয় অনাবশ্যক —কিন্তু বিশ্বলীলার ছন্দরস ঠিক বুঝতে হ'লে বিশ্বনাথকে না জানলেই নয়।

প্রমীলা রাগ করে: "কিন্তু এ ভাই বিশ্বনাথের অন্যায়। তিনি নিজেকে রাখবেন প্রাণপণে ঢেকেঢুকে। কেউ জানতে চাইলেও তার যে কী প্রাণান্ত পরিচ্ছেদ দেখতেই তো পাই সাধুসন্তদের জীবনচরিতে অথচ তাঁকে জানতে না পেরে যদি পথ চলি তবে চিরটাকাল চলতে হবে হোঁচট খেতে খেতেই?"

"শুধু হোঁচট খেতে খেতেই কেন?"

"নয় তো কী! বিশ্বনাথের রাজ্যের হালচাল, আইন কানুন যখন জানি না তখন কখন কোন্ ফাঁকে যে আমাদের চালচলন বে-আইনির কোঠায় পড়বে টের পাব কেমন ক'রে?"

অসিত হাসে: "তোর কথায় জৌলুষ আছে মিলি মানছি। কিন্তু

তোর প্রশ্নের উত্তর তুই নিজেই দিয়েছিস যদিও জানতে পারিস নি। কারণ যদি ভাগবত আইন কানুন ব'লে সত্যিই কিছু থাকে তবে সে আইনের মুক্তি হওয়ার পথও আছেই আছে। না থাকলে আইনকানুন কথাটার কোনো মানেই থাকে না—বিশ্বলীলাটা দাঁড়ায় একটা উন্মাদ শক্তিধরের খেয়ালের প্রলাপ। কিন্তু একথা আজকাল এমন কি নাস্তিক বৈজ্ঞানিকরাও টের পেতে সুরু করেছেন যে বিশ্ব চলছে একটা বিরাট নিয়ম মেনে, নানান সূক্ষ্ম শৃঙ্খলাকে অঙ্গীকার ক'রে। সাধারণ জীবনেও আমরা এ-অঙ্গীকার করতে নারাজ হ'লে একটি পাও চলতে পারি না। এ আমাদের শুধু তো দেখে নয় ঠেকেও শিখতে হয় বার বার। কিন্তু এই যে ঠেকে শেখার বা ইন্দ্রিয়বোধের পথ, এ চরম জ্ঞানের পথ নয়—অপরোক্ষ অনুভবের পথ, যে-পথের পথিক—যোগ বা ধর্ম। এ-পথের সুরু মনের চৌহদ্দি থেকে বটে কিন্তু এর লক্ষ্য মনের ওপারে।

প্রমীলা একটু ভাবল পরে বলল: "কিন্তু ইন্দ্রিয়বোধের পথে চললে অপরোক্ষ অনুভবের পথের দিশা মিলবে না কেন? মনকে কেন পদে পদে তোমরা নামঞ্জুর করতে চাও?"

অসিত বলল: "কি জানিস? সব বড় সাধনাই সুরু হয় তত্ত্বজিজ্ঞাসা থেকে—কোন্ পথে, কেমন ক'রে, কোন ছন্দে চলতে হবে সীমার মধ্যে অসীমের উপলব্ধিকে পেতে হ'লে। এ-জিজ্ঞাসার উত্তর দিতে পারেন তাঁরাই যাঁদের হয়েছে এ-উপলব্ধি। তাঁরা বলেছেন সবাই একবাক্যে যে মন এ পথের খেই ধরিয়ে দিলেও বেশিদূর পারে না আমাদের সহযাত্রী হ'তে। অন্য ভাষায়, যে-সত্যের মিলন বিনা আমাদের জীবন অসার্থক থেকে যায় সে-সত্যের সঙ্গে ঘটকালি করতে পারে না আমাদের ঘরোয়া বুদ্ধি। সেজন্যে চাই আর এক বুদ্ধি—শুদ্ধ বুদ্ধি যে কাটিয়েছে বাসনার ছোঁয়াচ। কিন্তু শুধু বুদ্ধিই বা বলি কেন—আমাদের দেহের

মনের প্রাণের তলে রয়েছে অনেক অগোচর শক্তিবীজ তাদেরও আবাদ করতে হবে—জ্ঞানের ফসল ফলাবার জন্যে। কিন্তু রক্ষে কর্ দিদি, এসব বড় বড় কথা আমাকে দিয়ে বলিয়ে নিস্ নি। তোকে তো বলেছি যে এসবের সবটা না হোক অনেকখানিই আমার কাছে আস্তন্ত শোনো কথা না হোক্, ঝাপসা কথা। আমার কাছে এধরণের কথারও কিছু মূল্য আছে মানি, কিন্তু সে শুধু এই জন্যে যে এসব কথা হ'ল আমায় সত্যদীক্ষার সহায়, এসব শুনলে এদের আভাসে-পাওয়া সত্যকে প্রত্যক্ষ করবার উৎসাহ জাগে—এজন্যে নয় যে এসব কথার নজির হেঁকে পাঁচজনকে থ ক'রে দিতে চাই।"

প্রমীলা বলল: "একথা আমিও মানি ভাই। তাই তো জিজ্ঞাসা ক'রে তোমাকে বিরক্ত করি বার বার। কারণ বিশ্বাস করো একথা মানতে আমারও একটুও আপত্তি নেই যে যা আমরা জানি তার বাইরে এমন অনেক কিছুই আছে যা আমাদের না জানলেই নয়।"

অসিত খুসি হ'য়ে বলল: "হাত দে হাত দে মিলি। এই কথাই আমি বলতাম ওদের—ছায়াদের। কিন্তু ওরা ছিল, ঐ যে বললাম, খানিকটা ব্রাহ্মভাবাপন্ন কিনা—তাই ভাবত এই সব হিঁদুয়ানির বুঝি বেশির ভাগই মেকি। আমাকে বাজত বেশি সেই জন্যেই। তবে আমি যে দেখেছি গুরুদেবকে। ওরা তো দেখেনি। কাজেই আমি যা বলতাম ওরা ঠিক বুঝতে পারত না। ভাবত—যে-আটপৌরে জ্ঞান নিয়ে আমরা সচরাচর চলি তার চেয়ে বেশি পাথেয় না জুটলে কী-ই বা এমন ক্ষতি? কিন্তু আমার মধ্যে যে একটা বিপ্লব ঘটে গেল গুরুদেবের দীক্ষায়। তাই লৌকিক জ্ঞানে ঘরোয়া বুদ্ধিতে আমার তৃপ্তি নেই। অবিশ্যি গুরুদেবের মতন জ্ঞান দুর্লভ—কিন্তু আমাদের প্রত্যেককেই যে তার সাধ্যের সীমানা খুঁজতে হবে প্রাণপণে এ তো মনুষ্যত্বের একটা গোড়াকার কথা। কাজেই যে-জ্ঞানে সংসারীরা তুষ্ট তাতে আমার সোয়াস্তি নেই—কেন না এটুকু

আমি জেনেছি যে তার চেয়ে অনেক বড় জাতের জ্ঞান আমরা পেতে পারি সাধনায়।

আমি দেখেছি বার বার যে মনকে শান্ত করবার চেষ্টা করলে, বাসনাকে নিবৃত্তির দিকে লওয়াবার সাধনা করলে, জ্ঞানীর কাছে নত হয়ে তাঁর বাণী নিয়ে শ্রদ্ধার সঙ্গে ধ্যান করলে অনেক আঁধারই কাটে—যদিও একটু একটু ক'রে। নৈলে কি তুই ভাবিস আজ আমি এত শান্ত হ'য়ে তোর সঙ্গে কথাবার্তা কইতে পারতাম? বিশেষ আজই অজয়ের চিঠি পেয়ে যাতে সে লিখেছে ছায়ার মৃত্যু-যন্ত্রণার কথা?

প্রমীলা প্রসঙ্গটা বদলাতে বলল: "কিন্তু নেপথ্যশক্তিদের কথা যে চাপা প'ড়ে গেল ফের?"

অসিত হাসল বলল: "তোকে ভুলোনো যে কী কঠিন! আমি সত্যিই চাইছিলাম প্রসঙ্গটা এড়িয়ে যেতে। তবে তুই যখন চেপে ধরলি তখন শোন্। যে-বাসে আমরা সবাই যাচ্ছিলাম সেটা যখন উল্টে গেল—যার ফলে দেবদা মারা গেল—তখন সত্যিই আমার হয়েছিল এক বিচিত্র অনুভব। তাকে বোঝাবার ভাষা খুঁজে পাই না। কারণ কী ক'রে তোকে বোঝাব সে-অদ্ভুত অনুভূতি—আমাকে নিয়ে দুটো বিরুদ্ধ শক্তির সেই লড়াই—*tug-of-war*?"

প্রমীলা: হ্যাঁ একথা তো এইমাত্র বলছিলে তুমি। কিন্তু বলো না ভাই আর একটু পরিষ্কার ক'রে। এ তো বুঝলাম যে একটা শক্তি তোমাকে বাঁচাতে চাইছিল, তার নাম দেওয়া যাক তারণ-শক্তি—আর একটা চাইছিল তোমাকে মারতে, তার নাম দেওয়া যাক মারণ-শক্তি। তুমি কি সত্যিই অনুভব করলে যে প্রথম শক্তিটা তোমাকে বাঁচালো?

অসিত: ঠিক ওভাবে নয়। তবে মনে হ'ল কোনো ভয় নেই আমার—যখন আমাকে ঘিরে রয়েছে এই তারণশক্তি। তাই তো আমাকে অত বেজেছিল যখন দেবদা বাঁচল না।

প্রমীলা : কিন্তু কেন বাঁচলেন না তিনি? তারণশক্তি কি তাঁকেও রক্ষা করতে যায়নি?

অসিত : ফের তুই আমাকে ফ্যাসাদে ফেললি মিলি। এ প্রশ্নের উত্তর দেব আমি কী ক'রে। দিতে হ'লে শোনা কথাই বলতে হবে ফের।

প্রমীলা : তাই শুনব। তবে তোমার গুরুদেবের কথা হওয়া চাই—এ ও সে-সাধকের কথা নয়।"

অসিত (হেসে) : আচ্ছা কিন্তু বলি কী ভাষায় এও আর এক মুস্কিল।—(একটু থেমে) কি জানিস! গুরুদেবের কাছে শুনেছি, তারণ-শক্তির তারিণী করুণা আমাদের চারদিকেই আছে—যদিও সে যে সব সময়ে আমাদের সুখ চায় তা নয়। তার লক্ষ্য আমাদের বিকাশ —যাতে ক্রমশ হই আমরা অমৃতের অধিকারী—যে'ানে সব সংশয়, সব দুঃখ, সব জ্বালা রূপান্তরিত হয়েছে পরমানন্দে। বিকাশ বলে ঠিক কাকে সব সময়ে আমরা বুঝি না—বিশেষ যখন রোগে ভুগি, কি দুঃখ পাই, কি মৃত্যু আসে মাঝ পথে। কিন্তু তবু—বলেন গুরুদেব—জ্ঞান চাইলে তার আলো নামে আর সে-আলোতে স্পষ্ট দেখা যায় যে

আমি সুখ ব'লে দুখ চেয়েছিনু
তুমি দুখ ব'লে সুখ দিয়েছ।

ব্যাপারটা অবশ্য ঠিক এত সরল নয়। কেন না অনেক সময় দুখ ব'লে যা দেন তা সুখ তো নয়ই দুঃখের চোদ্দ পুরুষ। যেমন ধর দেবদাদের কথা। পর পর তিন বছরে দেবদা রাজু ছায়া মারা গেল—আর সে যে কী যন্ত্রণা পেয়ে! এর পরেও তুমি দুখ ব'লে সুখ দিয়েছ কীর্তন গাইলে সেটা শোনায় ভণ্ডামি বা তামাশার ম'ত। কিন্তু তবু এই এক জন্মেই জীবনের শেষ নয়। এ যদি মেনে নিই—যেকথা গুরুদেব বলেন জ্ঞানের দিব্যদৃষ্টি খুললে স্পষ্ট দেখতে পাওয়া যায়—তাহ'লে এটুকু অন্তত বলা চলে

যে এখন যাকে দুঃখ মনে হচ্ছে পরে হয়ত দেখা যাবে তার প্রয়োজন ছিল— বিকাশের জন্যে, চেতনার পরিণতির জন্যে। কিন্তু এ-ধরণের কথা এখন আমাকে বলতে হচ্ছে 'কিন্তু' 'হয়ত' ক'রে। গুরুদেব থাকলে বলতে পারতেন এটা জোর ক'রে 'বেদাহমেতৎ'—'আমি জানি' ব'লে। কারণ এ-সত্যকে তিনি যে সত্যিই প্রত্যক্ষ করেছেন। তাই জানেন যে যাকে আমরা বলি গভীর দুঃখশোক সে এমন জগৎজোড়া হ'ত না যদি না কোনো মহৎ পরিণতির কিছু সহায়তাও তারা না করত।"

"কিন্তু এ ধরণের কথা শুনে সান্ত্বনা কি সত্যি পাওয়া যায় ভাই? প্রতিমা দেবী কি এ কথায় কান দেবেন মনে করো?"

"না করি না। কিন্তু এটুকু মনে করি যে কোনো না কোনো সময় আসবেই—এ জীবনে না হোক পরের জীবনে—যখন তাকেও এ-কথায় কান দিতেই হবে—মানতেই হবে যে করুণাকে চিনতে হ'লে তার সাধনা করা চাই। আর তখন সে বুঝবেই বুঝবে যে সুখ শান্তি দুঃখনিবৃত্তি সবেরই ঐ এক পথ—বাসনার বিসর্জন—ভগবানে আত্মসমর্পণ। সুখের খোঁজে এ ছাড়া অন্য যে পথেই কেন ধাওয়া করো না শেষটা দেখবে মাথা ঠুকে গেল চোরাগলিতে।"

মিনি ঘরে ঢুকে বলল: "মা! মামাকে ফের বকাচ্ছ তুমি? বেচারির অসুখ—"

অসিত ওকে টেনে নিল কাছে, বলল হেসে: "সত্যি মিনি দেখ্ তো কী অন্যায়! আমি ভালো মানুষ তাই ব'কে চলেছি—তবে হয়েছে কি জানিস—সে ভারি মজা, উ!"

"কী মামা? কী?"

"আমি তোর মাকে লেকচার দিয়েছি এমন গম্ভীর সুরে যে ও স—ব বিশ্বাস ক'রে ব'সে আছে—মনে ওর সন্দেহ হয় নি যে যা যা বলেছি সব হ'ল জ্বরের তাড়শে ভুল বকা।"

"আহা! যেন জ্বর না থাকলে মামা যা যা বলেন সব ঠিক বকা।

ওরা হেসে উঠল।

হাসি থামলে প্রমীলা ওর চুল ধ'রে টান দিয়ে বলল: "যা যা: কাজিল মেয়ে—পদ্মার সঙ্গে পুতুল খেল্‌গে যা।"

মিনি বলল: "হ্যাঁ মা! লক্ষ্মী মা। আমার আর একটা ডল চাই—পদ্মার মতন। ওর ডলটা যে শুইয়ে দিলে হাঁই তোলে। আমারটা শুধু চোখ বোঁজে।"

অসিত বলল: "বটে? তবে তো আর মান থাকে না। দাঁড়া, সেরে উঠে তোকে এমন এক ডল কিনে দেব যে শুইয়ে দিলে নাক ডাকায়।"

মিনি হাততালি দিয়ে বলে: "এমন ডল আছে না কি মামা? বেশ হবে। পদ্মা খুব জব্দ হবে তাহ'লে। আমি যাই তাকে ব'লে আসি গে—" ব'লে ঝড়ের মতন বেরিয়ে গিয়েই ফিরে দোর গোড়ায় উঁকি মেরে বলল: "ওঃ—ভুলে গিয়েছিলাম মা। বাবা বললেন মামা ঘুমলে তুমি একবার তাঁবুর দিকে যেও—কি কি জিনিস সেখানে প'ড়ে আছে এখনো।"

মিনি চ'লে গেলে অসিত কুণ্ঠিত স্বরে বলল: তুই এখন যা মিলি। মালিশ চমৎকার হয়েছে।"

প্রমীলা চেঁচিয়ে উঠল: "ও মা! দেখ দেখি আমি মালিশের কথা একেবারে ভুলে গেছি। হাতে তেল একেবারে শুকিয়ে গেছে।—তা, এ তোমারই দোষ, এমন কথা বলো কেন যা সব মনটা দিয়ে শুনতে হয়।—কিন্তু ও কী, উঠে বসতে যাচ্ছ যে? শোও ফের মালিশ করব আমি—করবই করব।

অসিত ওর গালে হাত দিয়ে আদর ক'রে বলল: "আর দরকার নেই দিদি। সত্যি আমার বেশ ভালো লাগছে এখন। কাঁধের

কাছটায় যে একটু ব্যথা করছিল সেটাও নেই। তুই যা নির্মল বেচারি ভদ্র ব'লে কি আর লোক নয় ?"

"আচ্ছা আচ্ছা যাচ্ছি গো যাচ্ছি। ও একটা লোকের মতন লোক—কারণ কবিত্ব ক'রে রোগের মতন রোগ ডাকে না।

"রোগ ডাকি কি আমি কবিত্ব করতে রে ?"

"তবে ?"

"মিষ্টি দিদিটির হাতের সেবা পেতে—একটু আহা উহু শুনতে।"

"রাখো রাখো—আমার জানা আছে কত ধানে কত চাল। তুমি না কি সেই মানুষ যে আমাদের সেবা নেবে সাধ ক'রে। তাহ'লে কি আর ছুটতে এমন ক'রে বনবাসে ? না—শোও ফের, আমি পায়ে একটু মালিশ ক'রে দিই এবার।"

"কর্ দিদি তোর যা ধর্মে সয়—দুর্গে দুর্গতিনাশিনী—কিছু মনে কোরো না মা !" ব'লে চোখ বোঁজে।

প্রমীলা ওর পায়ের কাছে একটা টুল নিয়ে বসল।

* * * *

হঠাৎ চমকে উঠল অসিত : "কে ? ছায়া ?"

প্রমীলা বলল : "না অসিদা, আমি।"

"ও। কিন্তু এখনো ! ঢের মালিশ হয়েছে যা। ক্লান্তি লাগে না তোর ?"

প্রমীলা বলল : "ছায়ার লাগত কি অসিদা—পনের মিনিটে ?"

অসিত ফের পাশ ফিরে শুল। একটু পরে বলল : "এবার যা দিদি লক্ষ্মীটি ! সত্যি, আর দরকার নেই। দেখ্ নির্মল ডাকছে মনে নেই ?

"আছে গো আছে। আমি যাচ্ছি। তুমি ঘুমও তো।"

"মালিশ করলে কখনো ঘুমনো যায় ? তুই যা তবে ঘুমবো। না সত্যি, রাগ করিস নে দিদি। শোন কাছে আয়—একটা কথা বলি।"

প্রমীলা রাগ ক'রে বলল : "কথা হবে পরে। এখন ঘুমোও তো। ব'লেই বেরিয়ে গেল।

অসিত ভাবতে লাগল চুপ ক'রে। সত্যি, অসুখ না হ'লে কি ও জানতে পারত প্রমীলা ওর জন্যে এত ভাবে।

মনটা ওর ভ'রে ওঠে বিষাদের মাঝেও। একথা ও বলতে পারবে না যে জীবনদেবতা দেন শুধু কেড়ে নিতে। বরং উল্টোটাই কি সত্য নয়! বড় আপনার যে তাকেও মানুষ হারায় আরো আপনার যে তাকে পেতেই নয় কি? শুধু তাই নয় যে চ'লে যায় বুকের মধ্যে একটা ফাঁক রেখে, সে কি ফিরে ফিরে এসে ভ'রে দিয়ে যায় না সে ফাঁক ক্ষণে ক্ষণে? শুধু স্মৃতির দানেই নয়—ছায়ার আলোয়? আঁধারে যে যায় মিলিয়ে সেকি নেয় না আলোয় নবজন্ম? ওর মনে বেজে ওঠে ছায়ার কণ্ঠে ওরই শেখানো গান।

আঁধারের ডোরে গাঁথা আলোকের মণিমালা,
গগনের দেবালয়ে স্বপনের প্রদীপ জ্বালা।
অচেনার রূপ-উদাসী
চেতনায় বাজে বাঁশি,
বেদনার অশ্রু ফুলে অজানার গন্ধ ঢালা।

এ-গান আজ ওর বুকের মধ্যে বেজে ওঠে যে নতুন ঝঙ্কারে সে কি শুধুই কবি-কল্পনা? না এ শুধুই একটা কথার কথা যে—

মলয়ে মিলায় যে-সুর শিশিরে পাই যে তারে,
বিরহে আসে ফিরে মিলনে হারাই যারে
যারে চায় যুগের তৃষা
রজনী অনিমিষা
জেগে রয় স্মৃতির বুকে তারি নয়ন নিরালা।

বাজে ওর তানগুলি গানের কথাগুলির চারিদিকে স্নিগ্ধ স্ফুলিঙ্গের ফোয়ারা হ'য়ে ঘুরে ঘুরে......

কখন যে ঘুমিয়ে পড়ল......

হঠাৎ ঘুম ভেঙে যায়। শুনতে পায় পাশের ঘরে ঘড়িতে বাজল টং টং ক'রে এগারটা।

একটা মেঠো বাঁশি না? এত রাতে! মনে পড়ে ছায়ার কণ্ঠ। চড়া পর্দায় ঠিক এমনি বাঁশির মতই শোনাত। মনে পড়ে ওকে একটা স্তোত্রের সুর শিখিয়েছিল গীতার—

ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিৎ
নায়ং ভূত্বা ভবিতা বা ন ভূয়ঃ।
অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো
ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে॥

মনে পড়ে এ-শ্লোকটির মানে বুঝিয়ে দিয়ে যেদিন ও শিখিয়েছিল ছায়াকে এর গম্ভীর সুর সেদিন। ছায়া হঠাৎ ওকে প্রশ্ন করেছিল: "আচ্ছা অসিদা, একটা কথা আমাকে বলবে?"

"কী?"

"ধরো, আমি যদি আর না থাকি—এ শ্লোকটি আওড়ে তুমি খুব সান্ত্বনা পাবে!"

একটা দীর্ঘনিশ্বাস পড়ে ওর অজান্তে। সঙ্গে সঙ্গে আশ্চর্য—মনে হাসি পায়—ছায়া তার অসিদাকে নিজের চেয়ে জ্ঞানী ভাবত!

স্মরণে

Saigyo Hoshi :

Since I am convinced
That reality is in no way
Real,
How am I to admit
That dreams are dreams ?

সত্য যারে মনে হয় সে যদি স্বপন
স্বপন যে নহে সত্য মানিব কেমনে ?

অসিতের ঘুম ভাঙল যখন রাত হ'য়ে এসেছে · পূর্বাকাশে মেঘের মধ্যে দিয়ে একটা চাপা দ্যুতি রঙের সুর ভাঁজছে আকাশের নিরঙ পর্দার আরোহ-অবরোহে।

ও উঠল। ঘড়িতে ভোর পাঁচটা। কাল বিকেল থেকে বলতে গিয়ে শুয়ে। আর কি ঘরে টেঁকা যায়? রবারের জুতো প'রে ভালো ক'রে কম্বল মুড়ি দিয়ে পড়ল বেরিয়ে। মাথায় একটা উলের টুপি—ফের ঠাণ্ডা না লাগে···প্রমীলা তাহ'লে আর রক্ষা রাখবে না।

ঘর থেকে বেরুতেই দেখে পাশের ছোট্ট ঘরটিতে প্রমীলা শুয়ে। নির্মল ওদিকে বড় হল ঘরে। প্রমীলা নির্মলের কাছছাড়া হ'য়ে এই ছোট্ট ঘরটাতে শুয়েছে ওরই জন্যে—যদি রাতে দরকার হয় ওর।

মন ওর ভিজে উঠল। কত করে এরা দুজনে ওর জন্যে! কত ভাবে! প্রমীলা তো বটেই কিন্তু নির্মলই কি কম? এমন সহজ সরল শ্রদ্ধায় নিজের স্ত্রীকে ওর অভাবের মধ্যে এভাবে ঠেলে দেওয়া! ওকে সেদিনই বলছিল—কি একটা জমিদারি কাজে ওকে হয়ত দিন সাতেকের জন্যে বাংলা দেশে যেতে হবে একবার। প্রমীলাকে তখন ও রেখে যাবে ওর দাদার কাছে—এই তানমার্গেই। বলেছিল ও ঠাট্টা ক'রে—"ভাবনা কি? দাদার সঙ্গে বোনের মিলনের পথের কাঁটা বিদায় নিল।" শুভ্র কথাকে নোংরা ভাবে নেওয়া কতই সহজ—ওর গায়ে কাঁটা দেয় ভাবতে। অথচ ছায়ার সম্বন্ধে এধরণের কথা কি রটায় নি অনেকেই?—মানুষের মন এত মলিন হয় কী ক'রে?...ভাবে ও বাইরের ছোট বারান্দায় দাঁড়িয়ে। কেন এত ছোট হ'য়ে যেতে চায়? এতে কি সত্যি কোনো আরাম আছে এই অকারণ সন্দেহে? ছায়া তো ছিল ওর নিজের কন্যারই মতন—শিশু যাকে বলে। তবু এ ধরণের ইঙ্গিত ক'রে ওরা হাসাহাসি করতে পারল কেমন ক'রে? ফুলের বনে কেন এত কাঁটা?

উত্তরও বেজে ওঠে সঙ্গে সঙ্গে। মামুলি উত্তর কিন্তু তবু আজ বেজে

ওঠে যেন এক নতুন রেশে ওর উপলব্ধির গুণেই হয়ত : সংকীর্ণমনারা আছে ব'লেই না দেবদার মতন মনুষ্যের মহিমা এমন মুগ্ধ করে, নির্মলের উদারতা এত স্পর্শ করে! ওর মনে পড়ে সেদিনও যখন ও প্রমীলার সঙ্গে নিভৃতে গল্প করছিল নির্মল ঢুকল বাইরে থেকে দোরে টোকা দিয়ে তবে। বিরল বটে এ ঔদার্য। কিন্তু তাই তো দুর্মূল্য। কিন্তু যা মহার্ঘ তা নেই এধরণের উদ্ভট যুক্তির উদয় হ'ল কোত্থেকে কে জানে? অথচ বুদ্ধিমান্ লোকেও তো নিত্যই ব'লে বেড়াচ্ছে একথা—শুধু একটা জাঁকালো নামের লেবেল এঁটে। কী? না তারা রিয়ালিস্ট। কিন্তু রিয়াল বলব কাকে? শুধু মানুষের আবেগের প্রকৃতির গড়পড়তা ছন্দটিকে? আর যে সৌকুমার্য, যে-সুষমাবোধ, যে-উদারতা মনের প্রাণের বহু সাধনায় ধীরে ধীরে দল মেলে তাদের ভিশমিশ করা হবে শুধু এই অপরাধে যে প্রতিদিনের হাট-বাজারে তারা বিকোয় না? উদারতা কি শুধু একটা mood বই কিছুই নয়—আজ আছে কাল নেই?

অসম্ভব—বলে ও খুব জোর দিয়ে, মাথা নেড়ে। কে বলল উদারতা একটা ধর্ম নয় যেমন ধর্ম—ধরো বদান্যতা বা সরলতা? যে স্বভাবে উদার তার মধ্যে কখনোই সঙ্কীর্ণতা আসে না আসতে পারে না এতটা অবশ্য কেউই বলে না। কিন্তু তবু একথা বললে কি খুব ভুল হবে যে, স্বভাবে যে উদার কাজের বেলায় সে কদাচ কুটিল হয়? স্বভাবে যে দিলদরিয়া সে কি তেমন সাবধানী হ'তে পারে যেমন পারে তারা যারা নিষ্প্রাণ, মুমূর্ষু? দেবদার কথাই মনে প'ড়ে যায় ওর ফের। দেখলে কি মনে হ'ত না যে ওকে নায়ক ক'রে একটি চমৎকার নাটক কি উপন্যাস লেখা যায়? তবু বলে কি না এ যুগের অকালপক্কের দল যে "ভালো" চরিত্র একটু বেশি ভালো হ'য়েছে কি আর্টের ভরাডুবি—যেহেতু "খুব ভালো" হ'ল অবাস্তব—বড় একটা দেখা যায় না। আরে! বড় একটা দেখা যাবে কী ক'রে? গেলে কি সে আর এত চোখে পড়ত—না, মন

টানত ? মনে প'ড়ে যায় সেদিনই একজন তথাকথিত মনস্বী রিয়ালিস্টের লেখায় পড়ছিল এই অদ্ভুত থিওরি যে, খুব ভালো চরিত্র নাটক নভেলে উপজীব্য হ'তে পারে না। পারে না ? ধরো যদি ও কোনোদিন দেবদার মৃত্যুশয্যায়ও পরের-কথা-ভাবার কথা লেখে, যদি লেখে ওর পারিবারিক জীবনের আশ্চর্য উদারতার কথা, সাধুতার কথা, শক্তিমান্ হ'য়েও শক্তি-প্রয়োগ না করার কথা, পুরুষ হ'য়েও সেবাপরায়ণতার কথা, সাধুতায় মহত্ত্বে অটল শ্রদ্ধার কথা তাহ'লে সে-বর্ণনা আর্টে নামঞ্জুর হবে ছবিটা বড় বেশি ভালো, বড় বেশি সুন্দর দেখাচ্ছে ব'লে ? হয় হোক। কোনোদিন ও লিখবেই—তাতে আর্ট যায় থাক।

কিন্তু দেবদার কথা মনে আসতেই ওর মনের তর্কের উদ্ধত ঝাঁঝ যায় নিভে। বুকের মধ্যে শুধু কৃতজ্ঞ আনন্দ উঠে উদ্বেল হ'য়ে, স্নিগ্ধ গর্ব এমন বন্ধু ওকে ভালোবেসেছিল···চিনেছিল। চিনেছিল ! না—এ-অভিমান ছাড়তে হবে। গুরুদেবকে মনে প'ড়ে যায়। বেজে ওঠে তাঁর মন্ত্র : স্নেহ প্রীতি প্রেম বিকাশ পায় নিরভিমানের আলোয়—অভিমানের আওতায় যায় শুকিয়ে। কিন্তু তবু হয় না গৌরব ? মনে পড়ে আজও - বাস উল্টে যখন ওরা সবাই পড়ে যায় একটা খাতে দেবদার বুকের কখানা পাঁজরই গিয়েছিল ভেঙে। সে-যন্ত্রণা দেখা যায় না। ডাক্তার মাথা নাড়ল কোনো আশাই নেই—পাঁজরগুলো ভেঙে মুচড়ে ফুসফুসের মধ্যে ঢুকে গেছে। কিন্তু বলিষ্ঠ দেহ—এতটুকুও ঝাপসা হয় নি চেতনা। কিন্তু সে অবর্ণনীয় যন্ত্রণায়ও শুধিয়েছে ও আর সবাই কেমন আছে। শুধু তাই ? সেই মেটো ডিস্পেন্সারিতে যখন ওরা তুলল ওকে—যখন দেবদা মেজেয় শুয়ে প্রতিমার কোলে মাথা দিয়ে—চারদিকে যখন সবাই কাঁদছে ওর বুকের অবস্থা দেখে—মাঝখানটা গর্ত হ'য়ে গেছে পাঁজরগুলো নেমে গিয়ে—অথচ তবু ও বলছে ড্রাইভার বেচারি গরিব যেন জেলে না দেওয়া হয়। মাথার কাছে একটি বুড়ি ওকে হাওয়া করছিল—কান্তি তাকে সরিয়ে দিতে যেতে দেবদা বারণ করল :

"আহা থাক—বড় ভালোবেসে হাওয়া করছে ও। ওকে কিছু থোক টাকা দিও—আমি চ'লে গেলে।" এ ওর স্বচক্ষে দেখা, এতটুকুও বাড়ানো নয় তো। শুধু তাই? যখন ওকে নিয়ে যাওয়া হ'ল অ্যাম্বুলান্সে ক'রে হাঁসপাতালে নার্সদের কাছে, আহা, আজও মনে পড়ে ওর সেই আক্ষেপ: "তোমাদের বড় কষ্ট দিচ্ছি নার্স অসময়ে—কিছু মনে কোরো না—যন্ত্রণা বড় অসহ্য নইলে একটি কথাও বলতাম না।" এহেন মানুষ ওকে ভালোবেসেছিল—গৌরব হবে না একটু? শুধু ভালোবাসাই তো নয় কী শ্রদ্ধা সেই সঙ্গে! প্রবল নাকি ওকে একবার সাবধান ক'রে দিতে গিয়েছিল যে ছায়াকে অসিতের সংশ্রবে বেশি আসতে দেওয়া বাঞ্ছনীয় নয়। আরও দু-চারজন শুভার্থী ওর কাছে অসিতের বিরুদ্ধে বলতে গিয়েছিল। "যাও যাও—নিজের চরকায় তেল দাও গে—আমাকে মানুষ চেনাতে হবে না। ইট কাঠ পাথর নিয়ে আমার কারবার—কে টেকসই কে অপল্‌কা চিনি।"

এ গল্প ও শুনেছিল পরে প্রীতির কাছে। শুনে আনন্দ হয়েছিল বটে, কিন্তু কুণ্ঠাও এসেছিল। শান্ত হ্রদে একটা ঢিল পড়লে সারা জলের বুকে যেমন কুণ্ঠা ছেয়ে যায় চক্রাকারে অনেকটা তেম্‌নি। ভেবেচিন্তে ও বলেছিল দেবদাকে খোলাখুলিই যে মেয়েদের সুনাম মস্ত জিনিষ—তার ওপর ছায়া কুমারী আজ বাদে কাল সম্বন্ধ হবেই বড় ঘরে—যদি—কিন্তু কথাটা ও শেষ করতে পায় নি দেবদা হো হো ক'রে হেসে উঠেছিল। প্রতিবাদ করেনি একটুও, শুধু বলেছিল: "অসিত, তুমি কি সত্যি ভাবো যে আমি জানি না ছায়াকে তুমি কী চোখে দেখ? না বুঝি না তোমার সংস্পর্শে ও কী ভাবে ফুটে উঠছে ফুলের ম'ত?" আজও চোখে ওর জল ভ'রে আসে ভাবতে একথা। শুধু দেবদাই তো নয়—ওদের সবাই-ই ওকে কী বিশ্বাসই করত! মনে পড়ে একদিন সন্ধ্যাবেলা প্রীতি ওকে নিরালায় কী বলেছিল জলভরা চোখে। বলেছিল: "ছি ছি তোমার সঙ্গে

ঘনিষ্ঠতায় ছায়ার অনিষ্ট হ'তে পারে এমন কথা তুমি কী ক'রে ভাবলে ভাই? জানো, দাদা কী বলে তোমার সম্বন্ধে? বলে আমি কি জানি না যে ছায়ার জীবনের যে-বিকাশ অসিতের সংস্পর্শে হ'ল সে-বিকাশ ওর আর কারুর সংস্পর্শেই হ'তে পারত না?"

"বলে?"

"শুধু তাই? ও কতবারই বলেছে যে ছায়াকে ও যত ভালোবাসতে পেরেছে তুমি যে তার চেয়েও বেশি ভালোবেসেছ।"

"একথা দেবদা আমাকেও একবার লিখেছিল বটে।"

"কিন্তু আরো ঢের কথাই ও বলে যা ও তোমায় লিখতে পারে না। সেদিনই তো আমাকে বলছিল হেসে: 'আমি যে অসিতের মতন কলম-বাজ নই সোনা!—নৈলে দেখতে ওর নামে এমন একটা সনেট কি ওড লিখতাম যে ও ভদ্রসমাজে আর মুখ দেখাতে পারত না।' ব'লে সে কী হাসি অসিদা, যদি দেখতে!"

"শুধু তাই নয়" বলেছিল প্রীতি (কথা বলতে একবার সুরু করলে প্রীতিকে থামায় কে?) "ও কত সময়েই আমাকে বলেছে, জানো, যে সাবধানী মহাপুরুষ ঝাঁকে ঝাঁকে মেলে সোনা, কিন্তু বেপরোয়া লক্ষ্মীছাড়া মেলে কচিৎ। এক কথায় যে সব ছাড়ে—

"থাক্ থাক্।"

"গোড়া কেটে আগায় জল দিয়ে থাক থাক্ ব'লে সেরে নিতে চেষ্টা করলে শুনব কেন অসিদা? তুমি কী ক'রে ভাবতে পারলে যে তোমার মতন মানুষের সঙ্গে ছায়াকে অবাধে মিশতে দিতে দাদা কিন্তু করতে পারে? তবে বুঝি বেপরোয়াদেরো সময়ে সময়ে সাবধানী হ'তে সাধ যায়—for a change?"

কিন্তু কেন ও বেপরোয়ামি ছেড়ে সাবধান হ'তে চেয়েছিল প্রীতিকে ও বলতে পারে নি খুলে। বলতে পারে নি যে ওর আত্মীয়দের মধ্যেও

অনেকেই বলতেন নানা কথা ছায়াকে ঠেশ দিয়ে। কেউ বলত ছায়া সোজা মেয়ে নয়—ডুবে ডুবে জল খায়, কেউ বা বলত না রে না আসল খেলোয়াড় হ'ল ঐ ধুরন্দর এঞ্জিনিয়র সাহেব—মেয়ের ঘোড়ের চাল দিয়ে যদি অসিতের মতন দাবাটা হাতানো যায় মন্দ কি, এ-ও বুঝলি না? এছাড়া আর যা বলত ওরা সে-সব ভাবতেও যেন মনটা কালো হ'য়ে আসে। মনে পড়ে কোথায় যেন ও পড়েছিল এক সিনিকের উক্তি।

আত্মীয় বলি কাকে জানো? হায় রটায় যে উল্লাসে।

সেই অপবাদ—শুনে যাহা চিরশত্রুও লাজ বাসে।

হঠাৎ তাকিয়ে দেখে ও রিট্রিটের গেট ছাড়িয়ে অনেকদূর এসে পড়েছে। পথে একটা মোড়ে অন্যমনস্ক হ'য়ে ও একটা ছোট ঢালু পথ বেয়ে নেমে এসেছে অনেকখানি। সামনে সেই নির্ঝরিণীটাই এখানে ব'য়ে চলেছে এঁকে বেঁকে। একটা গুহার মুখে কয়েক ফুট লাফিয়ে পড়ছে নিচে। তার ওদিকে অগাধ খট্টা। সেখানে—খট্টার একেবারে কোলে– কয়েকটি মেঘবালা যেন সবুজ পাতার খোঁপা প'রে গায়ে ফুঁ দিয়ে বেড়াচ্ছে। দক্ষিণ দিকে সানাটোরিয়ামের শুধু লাল টালির ত্রিকোণ চূড়াটা দেখা যাচ্ছে। ঠিক সামনে সেই চিরপরিচিত 'হিমালয়ো নাম নগাধিরাজঃ'—ঠিক তেমনি ধ্যানহিমাপেস্ত হ'য়ে দাঁড়িয়ে ভোরের ঘুম-কুয়াশার বেষ্টনে। সুদূরে—যদিও মনে হচ্ছে অদূরে—তাঁর তুষারজটা ঝিকমিকিয়ে উঠছে।

অসিত চেয়ে থাকে নির্নিমেষে। মনের সব কুণ্ঠা ক্ষোভ গ্লানির জড়িমা যেন ধুয়ে মুছে ভেসে গেল এ আশ্চর্য দৃশ্যে। এমন কি আত্মীয়দের আত্মীয়তার কথাও মন থেকে পিছলে কোথায় যে চ'লে গেছে! এ দৃশ্যের সামনে পার্থিব সব কিছুকেই যেন মনে হয় অকিঞ্চিৎকর। ছায়ার মৃত্যু সংবাদ পাওয়ার পর এতটা সুস্থ সে কোনদিন বোধ করে নি

এ দেড় মাসের মধ্যে। এখানে ওখানে বেড়িয়েছে বটে কখনো একলা কখনো ওদের সঙ্গে—গান গল্প সবই করেছে মনের মধ্যে জপ করেছেও কম নয়—"বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়···" কিন্তু বৃথা। থেকে থেকে আচমকা বুকের মধ্যে অশ্রুর জলস্তম্ভ উঠেছে ঠিকরে। সেদিনও যে এত বিচিত্র ভাবে ছিল ছন্দোময়ী হ'য়ে আজ তার আর চিহ্নও নেই ধরিত্রীর ধুলায়। বিচিত্র জগতে সবই আছে নেই কেবল সেই বিচিত্রা!

বিচিত্রাই বটে। পরমায়ু তার ক্ষুদ্র ছিল কিন্তু তৃষ্ণার তো তার অবধি ছিল না। এ দেখব তা দেখব—কত কী করব—কত কী শিখব—কত কী শুনব—কত কী পড়ব—সে কি একটা? পারবে কেন অসিত ওর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে? থিতিয়ে যাওয়া হ্রদের বুক এঁটে পারে কি কখনো নৃত্যময়ী ঝর্ণার উচ্ছলতার সঙ্গে? শিশুর সঙ্গে পারে কখনো প্রবীণ তাল রাখতে?

শিশু শিশু শিশু।' ভাবতেও ভালো লাগে। সত্যি দর্শনীয় কিছু দেখল তো। এ-দেখার দাম দেয় কে? আঠারো উনিশ বছরের মেয়ে যে মনে প্রাণে এমন অপাপবিদ্ধ শিশুসরল থাকতে পারে এ কি স্বচক্ষে না দেখলে বিশ্বাস হয়? তবে কেনই বা ও বিকৃতমনাদের কুৎসায় মন খারাপ করে। ছায়াকে তারা চিনবে কী ক'রে? যতই গুণগান করি না সাম্যের—মানুষ তো সব সমান নয়। কাজেই যারা ছোট, গড়পড়তা তারা বড়কে অসামান্যকে ঠিক চোখে দেখতে পারে কখনো? রোলাঁর একটা চিঠি কথা মনে পড়ে: অসামান্যেরা সামান্যকে চেনে জানে কিন্তু সামান্যরা কখনো অসামান্যকে চিনতে জানতে পারে না। ঐ ক্ষের বুঝি অভিমান হয় আশুসার যে, অসিত ওকে চিনেছিল।

অন্য দিকে মোড় ফিরিয়ে দেয় চিন্তার। আত্মাভিমানের কাটান কী? উত্তর জোগায়—নেই। সংসারে সর্বত্রই আমি থাকে একান্তে আত্মপ্রণয়ের দ্বীপান্তরে। একমাত্র স্নেহের বন্যা তাকে ভাসিয়ে নিয়ে যায়

—যোগসূত্র রচে অন্য অন্য সব অনুরূপ ঐকান্তিক দ্বীপের সঙ্গে। ভালোবাসাই পারে এই অসাধ্য সাধন করতে—কেন না তার ধর্মই হ'ল একাকার ক'রে দেওয়া ভেদবুদ্ধির উদ্ধত দুর্গ ধূলিসাৎ করা। তাই ভালোবাসা ভাবায় সব আগে নিজের কথা না—ভালোবাসার ধনের কথা। তাই না বলেছে আত্মবিলুপ্তির কঠিন সাধনা সব চেয়ে সহজে সিদ্ধিলাভ করে প্রেমের মন্ত্রে। তখন ভেসে যায় নিজের সব যোগ্যতার কথা—যাকে ভালোবেসেছি তার কথা ছাড়া আর সবই মনে হয় অবান্তর—এহ বাহ্য।

কিন্তু তবু কেন মনে হয় ফিরে ফিরে তাদের কথা যারা ছায়ার নিন্দে করত—কুৎসিত ইঙ্গিত করত। কী ক'রে জানবে কী নিষ্পাপ ছিল সরলা মেয়ে। সত্যি ওর মন যে কী রকম শিশুর ম'ত শুভ্র ছিল সে কথা বাইরের পাঁচজনে ঠাহর পাবে কী ক'রে? ও নিজেই কি জানত ও কতখানি সরল ছিল—গ্লানির ছায়াও যাকে ছুঁতে পারে নি আঠারো বৎসর বয়সে? মনে পড়ে একবার ওর এক আত্মীয়ার ওখানে গান হয় কলকাতার বাইরে। দেবদারা সবাই গিয়েছিলেন।

রাতে অসিত ফিরতে পারে নি। দেবদাকে অসিত বলল: "ছায়া এখানে থাকুক আজ—কাল আমার সঙ্গে ফিরবে।" "বেশ" বলেই দেবদার প্রস্থান—ছায়াকে ওর জিম্মায় রেখে একেবারে একলা।

ছায়া এভাবে একলা বাইরে কখনো থাকে নি। বলল; "আমি তোমার কাছেই শোব অসিদা!"

অসিত প্রথমে একটু চমকে গিয়েছিল। আজও সেজন্যে লজ্জা আসে। কিন্তু এত সহজে ও বলেছিল কথাটা যে অসিতকে বলতেই হ'ল: "বেশ তো ছায়া।"

বেশ মনে পড়ে সে-রাতটির কথা। ছায়া শুল ওর পাশেই। শুয়ে ওর হাতে মাথা রেখে গলাটি ধরল জড়িয়ে যেমন ও একঘর লোকের

মাঝেও ধরত। আর সঙ্গে সঙ্গে নেতিয়ে পড়ল ঘুমে। বোধ হয় তিন মিনিটও হবে না।

সন্তর্পণে সম্ভ্রমে নির্মলাকে ও একটু সরিয়ে শোয়াল মাথাটি একটি ছোট বালিশে ন্যস্ত ক'রে। মন ওর উঠেছিল ভ'রে। এমনটি আর ও কবে দেখেছে? এ কি সত্যিকার শিশু না হ'লে পারে কেউ? মনে পড়ে ভোরবেলায় এক ফালি সোনার রোদ এসে পড়েছিল ওর শ্যামল স্বচ্ছ মুখখানিতে। কী সুন্দর লেগেছিল ঘুমন্ত মেয়েকে! মনে হয়েছিল সত্যিই যেন আকাশের আলো এসে জাগালো পৃথিবীর আলোকে। চোখের পাতায় রোদ লেগে ওর ঘুম ভেঙে গেল। ঘুম ভেঙেই চোখ কচলিয়ে ব'লে উঠল ও: "একি!" তার পরেই অসিতের সঙ্গে চোখাচোখি।

"কী অসিদা? রাতে ঘুম হয়েছিল?"

স্বচক্ষে না দেখলে কি অসিতই বিশ্বাস করত? ভাবত বানানো গল্প—আর্ট!

অথচ ছায়া যেটা জানত না সেটা এই আর্ট। ভাগ্য ভালো যে ও জন্মেছিল এমন পরিবারে যেখানে আর্ট না শিখেও আর্টিস্ট হওয়া অসম্ভব ছিল না। নৈলে কি ও পারত নিজের ঝোঁকে চলতে? কটা হিন্দু পরিবারে সহ্য করে বয়স্থা মেয়ের এ ধরণের বাড়াবাড়ি? অথচ ছায়ার চালচলন তো বাড়াবাড়ি মনে হ'ত না কারুর চোখেই! সবাই যেন মেনে নিত ওকে স্বতঃসিদ্ধা ব'লে, বলত প্রশ্রয়ের হাসি হেসে: ও শিশু।

শিশু? নয়ত কী? কী ভাবে চলত ও মনে পড়ে। সে কি একটা স্মৃতি! কখনো বা সবার সামনে ওর চোখ টিপে ধরবে। কখনো ও স্বরলিপি করছে হয়ত—ঝুঁকে দেখতে গিয়ে নড়িয়ে গলা জড়িয়ে ধরবে দুটি স্নেহকোমল হাতে। কখনো ও চিঠি লিখতে বসলেও পাঞ্জাবির হাতা ধ'রে হিড় হিড় করে টেনে নিয়ে বসাবে ফরাসের ওপর: "চিঠি লেখা

এখানে চলবে না --আশ্রমে গিয়ে লিখবে—আর সব আগে আমাকে রোজ একখানা ক রে অন্তত—বুঝলে ?"

"আর আশ্রমের বাইরে ?"

"কেবল আমাকে গান শেখাবে, না হয় গান শোনাবে।"

লীনার "আদুরী" কথাটা আজও মনে পড়ে। সত্যি চল্লিশ বছর বয়সে ও দেখে নি কোনো পরিবারে মেয়ের এত আদর ছেলে থাকতে। এ একটুও বাড়িয়ে বলা নয় যে একমাত্র পুত্র রাজুকে কারুর চোখেই পড়ত না এ পরিবারে। ছায়া যা বলবে তাই হবে - কেউ না করবে না। দুখানা মোটরের বড়টি ওর জন্যেই হাজির থাকবে আর সবার আগে। যদি কোনো কাজে সে-গাড়ি পাঠাতে হয় কোথাও সারথি আগে এসে জিজ্ঞাসা করবে দিদিমণির এখন গাড়ির দরকার আছে কি ন । মাছের মুড়ো রাজুর পাতে পড়বে—যদি দিদি তুলে দেয় নিজের হাতে—নৈলে নয়। শুধু আদর যত্ন বললে কিছুই বলা হয় না, মিল্টনের একটি চরণ ওর মনে পড়ত "Cynosure of neibouring eyes.—অসিত ওকে তাই তো নাম দিয়েছিল নয়নতারা। নয়নতারাই বটে : বাড়ি শুদ্ধ সবাইকার। তাই না ও পেয়েছিল এমন অবাধ স্বাধীনতা—

হঠাৎ পিছনে পায়ের শব্দে থমকে ফিরে দাঁড়াল। প্রমীলা। হাতে ওর একগাছি সরু বেত।

* * *

হেসে উঠল ও বেত উঁচিয়েই :

"কী ? ভেবেছ শুধু ভয় দেখানো ?"

"না দিদি। তবে বেশি জোরে না, লক্ষ্মীটি !"

প্রমীলা গম্ভীর ভাবে ঘাড় নেড়ে বলে : "দুষ্টুর সঙ্গে লক্ষ্মী হওয়া মানে পাপের প্রশ্রয়। না সত্যি অসিদা। সময়ে সময়ে আমার হাত নিশপিশ করে বিশ্বাস কোরো।"

"করছি।"

"হাসি না। ভারি রাগ হয় আমার। কী করব বলো তো তোমায় নিয়ে? ফের ভোরবেলা বেরিয়ে এসেছ? নিউমোনিয়া দাঁড় করতে না পারলে—"

"আহা, আমি যে একেবারে সেরে গেছিরে—আর কক্ষনো জ্বর হবে না দেখিস্। এমন সূর্যোদয়—ঘরে থাকা যায় কি? বিশেষ অমন স্ট্রবেরি খেয়ে চাঙ্গা হ'য়ে।"

"দেখি" বলেই প্রমীলা কাছে এসে ওর কপালে হাত দেয়। "মানছি জ্বরটা এখন নেই—কিন্তু আসতে কতক্ষণ?"

"এবার কুডাক ডাকছেন মিনি?"

"ডাকছি দাদা, বড় দুঃখেই

আচ্ছা—"বলেই গলবস্ত্র হ'য়ে—না হয় ঘাট মানছি। কেবল জিজ্ঞাসা করি—দয়ামায়া না হয় যোগীর পরমধর্ম কিন্তু আত্মহত্যাটা কি তার স্বধর্ম?"

হঠাৎ ডান দিক থেকে মিলির গলা শোনা গেল: "ঐ মামা! পেয়েছি বাবা!" বলেই এ কী? মা-ও যে? তুমি কখন এলে?"

"এই মাত্র।"

"কিন্তু মামাকে ছেড়ে দিলে কী ব'লে এই ভোরবেলার ঠাণ্ডায়?" বলেই মামার পিঠে এক কিল।

"কী করিস লক্ষ্মীছাড়া মেয়ে!" বলে প্রমীলা চোখ পাকিয়ে "মামার অসুখ না?"

"কোথায় অসুখ?" ব'লেই অসিত কাঁদ কাঁদ মেয়েটাকে টেনে নিল কোলে। নির্মলও দেখা দিল এই সময়ে।

"কী করিস অসিত! এত ভোরে—ফের?"

"বাবা রে বাবা!" বলে অসিত, "এবাড়ির সবারই মুখে ঐ এক বুলি।

আর বোস দেখি—এখানে এই সাদা পাথরটা বেশ শক্ত আছে—কী চমৎকার দেখাচ্ছে ঐ ঝরণার গা বেয়ে এক রাশ ইন্দ্রধনুর রঙ।"

আর ঐ দেখ দেখ মামা! ঐ গাছটার সাদা ডালে আলো ছায়ার ঢেউ খেলে যাচ্ছে—কী ক'রে মামা? ওপরে তো পাতা নেই।

"তাই তো!" ব'লে অসিত চেয়ে থাকে মুগ্ধ নেত্রে। এরকম ও কখনো দেখে নি। হয়েছে কি নিচে নির্ঝরিণীর জল জমা হয়েছে একটা গহ্বরে। আলোটা পড়েছে তার ওপর। জল নড়ছে আর প্রতিফলিত আলোও নড়ছে। সেই নড়নচড়নই আঁকছে ওপরের ডালে আলোছায়ার গতিচ্ছবি।

"দেখ দেখি মিলি! ঘরে ব'সে থাকলে দেখতে পেতাম এ ছবিটা?"

মিলি বলে: "কিন্তু ফিরে গিয়ে কোঁ কোঁ ক'রে ফের জ্বর এলে—তখন? ভুগতে হবে তো আমাদেরই।"

নির্মল অসিত হেসে ওঠে কিন্তু প্রমীলা ধমকে বলে: "হয়েছে—আর ফাজলামি করতে হবে না। যাও ছুটে যাও। পরাণকে বলো মামাকে পাওয়া গেছে টোস্ট কফি গরম রাখতে—আমরা এলাম ব'লে।"

"জো হুকুম রাণীজি!" বলেই দুষ্টু মেয়ে ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল দুলিয়ে দেছুট।

"কোত্থেকে এসব সম্বোধন শেখে ওটা?" বলে নির্মল হেসে।

"ঐ কাশ্মীরী মেয়েটার কাছে—পদ্মা না কি যেন—যার সঙ্গে ও পুতুল খেলে সানাটেরিয়ামে।"

না এল অসিতের জ্বর, না কাশি। নির্মল প্রমীলা দুজনেই ভারি খুসি হ'য়ে উঠল! কিন্তু ওরা এবার সতর্ক হ'য়ে উঠেছে। অসিত একেবারে

নজরবন্দী। পরাণের উপর কড়া আদেশ—গেটে সর্বদা তালা লাগানো থাকবে।

অসিত কী করে? চুপ চাপ থাকে। কখনো লেখে এক আধটা কবিতা। কখনো ধরে একটু গান। কখনো বা পড়ে। সকালে বিকালে রিট্রীটের কম্পাউণ্ড ছেড়ে বাইরে যাওয়া ওর নিষেধ। প্রমীলা শাসিয়ে রেখেছে হঠাৎ পালিয়ে গেলে ও কুরুক্ষেত্র করবে। তাছাড়া নজর এড়ায়ই বা কী ক'রে? এ তো ডাক-বাংলো নয়—একটাই গেট। পাঁচিলগুলো মহাকায়।

যাহোক তিন চারদিনের মধ্যে অসিত বেশ সুস্থ বোধ করে। না ক'রে করে কি? প্রমীলা শ্রীনগর থেকে যা সব পথ্য আনাচ্ছে—স্ট্রবেরি, পেয়ার, আপেল তার উপর পক্ষিমাংস স্টু আরও কত কী পুডিং। পরাণটা রাঁধে বড় চমৎকার। তাছাড়া অসুখের পর ভালো হবার মুখে একটু বেশি চাঙ্গা বোধ হয় না?

কিন্তু তবু একটু বিপন্নও বোধ করে ও। এত নজরবন্দী থাকা কি পোষায় তাই ব'লে পাখা অক্ষম ব'লেই কি পাখি নয়? সত্যি, স্বভাবটা ওর বিচিত্র: স্নেহ ভালো লাগে, কিন্তু সেবার ঘটা নয়। একটু আধটু পরিচর্যায় অবশ্য ওর অরুচি নেই কিন্তু একটু বেশি হলেই অস্বস্তি। ঘরোয়া জীব যে নয় তাকে পোষ মানাতে গেলে চলবে কেন? তার ওপর একাদিক্রমে অনেকদিন আশ্রমে কাটিয়ে এসেছে।

সত্যি, ওর সময়ে সময়ে এত ইচ্ছে করে ফিরে যেতে সেই শান্তিনীড়ে —নিরালায়—যেখানে স্নেহ করবার কেউ নেই। এ আর এক আশ্চর্য। অথচ আশ্রমে সময়ে সময়ে এত মন কেমন করত ছায়াদের কাছে কি কোনো প্রিয় বন্ধু বান্ধবীর কাছে যেতে একটু আদর যত্ন পেতে। স্বভাবটার কি ও তল পেল? কেন এমন হয়? দোটানার কি শেষ নেই জীবনে?

হঠাৎ সেদিন বিকেলে প্রমীলা গেছে সানাটোরিয়ামে একটি বাঙালি

মেয়েকে দেখতে। ও মাঝে মাঝে যেত। মেয়েটির প্লুরিসি। ও যেত মাঝে মাঝে কিছু বাংলা রান্না নিয়ে। তাছাড়া বিদেশে বিভূঁয়ে বাঙালি মেয়ের হঠাৎ নিউমোনিয়া প্লুরিসি—না গেলে চলে? নির্মলও একটু বেরিয়ে ছিল। অসিত এত বড় স্বর্ণসুযোগ হেলায় হারাতে পারল না। কম্বল সাল একটা থার্মস ফ্লাস্ক আর টর্চ নিয়ে বেরিয়ে পড়ল। ওদিকে যেতেই মিলির গলা, সে পড়ছে পদ্মার কাছে "আবোলতাবোলের" একটা ছড়া, আর মানে বুঝিয়ে দিচ্ছে ভাঙা হিন্দিতে :

"এক যে রাজা"—"থাম না দাদা
রাজা নয় সে—রাজপেয়াদা।"
"তার যে মাতুল"—"মাতুল কিসে ?
সবাই জানে—সে তার পিসে।"

অসিত স্নানের ঘরে ঢুকে ওদিককার ছোট দরজা দিয়ে দ্রুতপদে বেরিয়ে পড়ল !

সর্বনাশ গেটে ঢোকে কে? ধরা প'ড়ে গেছে।—না সর্বরক্ষে—পিয়ন। ওর হাতে একটা মোটা খাম দিয়ে সেলাম করে চলে গেল।

ঠিকানা প্রীতির বড় বড় হরফে লেখা। দিন দশবারো আগে ও তাকে লিখেছিল একটা চিঠি ঈষৎ ভৎর্সনা করে ছায়ার অবস্থা হঠাৎ এত খারাপ হ'ল অথচ ওকে জানানো পর্যন্ত হ'ল না! জানলে অন্তত শেষ দেখাটা হ'ত।

একটা নতুন পথ ধরল—অরণ্য পথ। ও আজ চায় একেবারে নিরালা স্থিতি। একেবারে নিঃসঙ্গ হ'তে।

পথটা একটু নেমেই সমতল হ'য়ে গেছে। পায়ে হাঁটা পথ। দুধারে

পাইন গাছ। পায়ের নিচে শুকনো পাইনের পাতা প'ড়ে প'ড়ে মোটা কার্পেটের মতন নরম হয়ে গেছে। পাতার ফাঁকে ফাঁকে আলোর নেমেছে ঢল—ঝিলিমিলি। মিনিট পাঁচেক দ্রুত চ'লে ও পৌঁছল একটা বড় সুন্দর ঈষদুন্মুক্ত জায়গায়। বসল একরাশ পাতার কার্পেটে। দুধারে ভুট্টার মতন দেখতে পাইন ফলগুলো কী চমৎকার দেখায়! সামনে একটা কৃষ্ণচূড়ার গাছ। এ-অঞ্চলে কৃষ্ণচূড়ার গাছ ও ইতিপূর্বে দেখে নি। এ গাছটি ছিল ওর একটি ফেভরিট। সবুজের মাঝে হঠাৎ লালের সম্ভাষণ ওর কী যে ভালো লাগত।

ব'সে ও চিঠিটা বার করে খাম ছিঁড়ে। পড়ে:

অসিদা ভাই!

সংসারের খাঁচাটা রয়েছে, কেবল পাখিটা নেই আর। যার জন্যে এতদূর থেকে তুমি ছুটে এসে মাসকয়েক আগে সে রইল না তবু। রাখতে পারা গেল না। পারব কেমন ক'রে বলো! দাদা যে ওকে ডাকছিলেন। ও তো এ জগতের ছিল না। দুদিনের জন্যে আমাদের খাঁচায় আকাশের সুর শোনাতে এসেছিল বই তো নয়। তবে আমারা নাকি মাটির মানুষ আগুন দেখলেও ভেবে বসি শিখা বুঝি বা মাটিরই সখী। নয় যে বুঝি—যখন সে যায় নিভে। কিন্তু তবু ভুল হয় কেন যখন জ্বলে আমাদের মাটির আধারে একেই কি তোমরা মায়া বলো? তাই কি দীপ চায় এত ক'রে নিভন্ত শিখাকেও আঁকড়ে ধরতে? অথচ যেন আঁকড়ে ধরতে গিয়েই তাকে দেয় নিভিয়ে! বুঝি অবিশ্যি—জ্বলে নেভে না সে আমাদের হুকুমে, না উপরোধে। তবু এ-জানায় সান্ত্বনা কতটুকুই বা? আলোর পরে অন্ধকার আরো অন্ধ করে যেন। কিন্তু তা ব'লে করছি কী বলো? বলে না—বেঁধে মারলে সবই সয়। একথায় রাগ কোরো না ভাই। একটু ভেবো তাদের কথা যারা হঠাৎ আলোর শিখর থেকে ঝাঁপ দেয় আঁধারের

গহ্বরে। আলো যে পেয়েছে আর আলো যার নিভে গেছে তাদের মধ্যে ভাষার সেতু বাঁধবে কে?

"লিখতে যাচ্ছিলাম 'পায় নি'—'নিভে গেছে'-র জায়গায়। কিন্তু শোকের উচ্ছ্বাসেও মিথ্যা কথাটা সত্যি হ'য়ে দাঁড়ায় না! তাই কী ক'রে বলব আলো আমরা পাই নি? যে-আলো আমাদের আনন্দের দীপে জ্বলেছিল সে-আলো কম দেয়ালিতেই জ্বলে। শুধু দাদার মতন দাদা, রাজুর মতন ছেলে, ছায়ার মতন মেয়েই নয়। এর উপরেও পেয়েছিলাম কত লোকের যে দরদ স্নেহ শ্রদ্ধা। দুঃখের এই দুর্দৈবের মধ্যেও তাই এ-সান্ত্বনা জ্বলছে বৈ কি মিটমিট ক'রে যে যা পেয়েছিলাম তা অচল। কিন্তু সান্ত্বনা তো শান্তি নয় ভাই। তবে কথায় বলে বেশি সুখ সয় না। তাই তোমার মতন মানুষকে পরমাত্মীয় পেয়েও আমাদের সাধের বাগানের সেরা ফুলগুলি রাখতে পারলাম না। অবশ্য সবই ঝরত একদিন জানি। কিন্তু এমন অকালে এমন ভাবে ঝরল কেন? কেউ কি জানে অসিদা?

"তোমার চিঠির ভাবে মনে হ'ল তুমি যেন একটু আহত হয়েছ ওর অসুখের বাড়াবাড়ির সময়ে তোমাকে জানাই নি ব'লে। কিন্তু জানাই নি—কারণ জানাবার সময় পর্যন্ত পেলাম না। মনে আছে তুমি যখন ছায়ার শিয়রে এসে বসে সকাল সন্ধ্যায় প্রার্থনা করতে, তোমার গুরুদেবের আশীর্বাদী ফুল রাখতে ওর বালিশের নিচে, ওকে কত গান শোনাতে, গল্প বলতে তখন আমাদের অনেকেরই মনে হয়েছিল ও যেন একটু সারছে। হয়ত একটু সেরেও ছিল। ডাক্তারে বসিয়েও তো দিয়েছিলেন। কিন্তু ফের সেই মূর্ছাটা দেখা দিল যা তুমি দেখে গিয়েছিলে সেই 'নীলাকাশের অসীম ছেয়ে' গানের পরেই। এ-মূর্ছাটা হঠাৎ কেন এল নতুন উপসর্গ হয়ে জানি না কেউই। উপসর্গ কি একটা অসিদা? জগতের সব যন্ত্রণা যেন জোট পাকিয়ে মেয়েটাকে চেপে ধরল।

"কিন্তু তবু সবেরি একরকম প্রতিবিধান মিলছিল: কাশি হ'লে অক্সিজেন টিউব, পেটে বেদনা হ'লে ফোমেণ্ট, জ্বরে ইঞ্জেকশন—যাহোক তবু একটা কিছু করবার খুঁজে পাচ্ছিলাম। তুমি যখন আশ্রমে ফিরে গেলে তারপর ডাক্তারও বললেন, লক্ষণ ভালই ওকে চেঞ্জে পাঠালে এসব উপসর্গগুলো কেটে যাবে। তাই খুব ভরসায় বুক বেঁধেই ওকে নিয়ে গেলাম রাঁচি।

"সেখান থেকে ও তোমাকে একখানা পোস্টকার্ড লিখেছিল, 'বেশ ভালো আছি' ব'লে। কিন্তু রাঁচি যাওয়াটাই হয়ত ভুল হ'ল। অন্তত 'বেশ' ও মোটেই ছিল না সেখানে। না হ'ত ক্ষিদে, না কমল পেটের বেদনা, না ছাড়ল জ্বর, না থামল কাশি—বুক ধড়ফড় করত সমানেই। এর পরেও বেশ ছিল বলি কী ক'রে?

"কিন্তু তবু যা হোক সুখে দুঃখে আশায় নিরাশায় একরকম ক'রে কাটছিল—কিন্তু রাঁচি যাওয়ার পরই ফের দেখা দিল ঐ কাল মূর্ছা। শেষটায় একদিন এমনি ভয়ঙ্কর হ'ল সেটা, যে মেয়ের প্রায় ধনুষ্টঙ্কারের মতন অবস্থা হ'ল। তিন চার ঘণ্টা কাঁপুনি। সমস্ত শরীর যেন কে মোচড়াচ্ছে, থাকে। ঘণ্টা কয়েক বাদে যখন সম্বিৎ এল দেখা গেল ওর বাক্‌রোধ হয়েছে। অথচ সব বুঝতে পারছে—মাথা পরিষ্কার। অনেক চেষ্টা ক'রে বড় জোর মা কি জল বলে তার পরেই কথা জড়িয়ে যায়—শুধু দুচোখে জল উপচে পড়ে। ভাবতে পারো অসিদা? আর রাজুও টাইফয়েডে এমনি ক'রেই মারা গেল ওবছর—ঠিক্ এমনি সজ্ঞানে বাক্‌রোধ হ'য়ে। দাদারও মৃত্যুযন্ত্রণা তো চোখে দেখেছ। কেন আমাদের এমন দুঃখ পেতে হ'ল অসিদা? আমরা তো কারুর উপকার বই অপকার করি নি? আর সব চেয়ে দুঃখ পেল কি সেই আলোর পাখিটা যে চিরটাকাল সবাইকে শুধু আলোর গানই শুনিয়েছে, আনন্দই দিয়েছে! আর সব-চেয়ে বড় মর্মান্তিক পরিহাস কী ভেবে দেখেছ কি? গেল ও কোন্ দিন

জানো ? ওর জন্মদিনে। যেদিন আমরা উৎসব করি বিধাতার বরদানের আনন্দে সেই দিনই কি না হ'ল চিতা সাজাতে ? আর এমন দেহের যাকে আগুনও পুড়িয়ে বেশি শুদ্ধ করতে পারে না—যে ছিল অপাপবিদ্ধ—"

অসিত আর পড়তে পারল না। চোখ জলে ঝাপসা হ'য়ে গিয়েছিল······

চুপ ক'রে ব'সে থাকে। কত কথাই ভেসে ওঠে স্মৃতির বুদ্বুদে! চেয়ে থাকে সামনের সেই কৃষ্ণচূড়ার গাছটার দিকে। মনে পড়ে ছায়া প্রায়ই বলত : "কৃষ্ণচূড়া কী ভীষণ ভালো লাগে আমার! তোমার লাগে না অসিদা!" এদিকে শুনতে পায় একটা নির্ঝরিণীর ঝিরঝির শব্দ মনে পড়ে ওর কণ্ঠে নির্ঝরিণীর গান। হাওয়ায় গাছের পাতায় বাঁশি বেজে ওঠে। মনে পড়ে ও গাইত—"কার বাঁশিখানি বাজে বিজনে!"

যা কিছু দেখে শোনে জাগায় সেই একজনেরই স্মৃতি!···দেখে চলে ছবির পর ছবি!···শোনে ধ্বনির পর ধ্বনি।···

রাওলপিণ্ডি থেকে মোটরে চলেছে ওরা কাশ্মীর।

"ও কী! আমি বসব কোথায় ?"

"আহা! আদুরী!" বলে লীনা ঠোঁট বেঁকিয়ে "যেন অসিদার পাশে ছাড়া জগতে আর বসবার এতটুকু জায়গা নেই। আজ আমি বসব।"

ছায়া হেসে বলে : "হঠাৎ এ-সাধ হ'ল তোর কোত্থেকে!"

"দিদিদের আদুরেপনা দেখে দেখে।—কী অসিদার দিকে চাইছ কি ? কী অসিদা ? উঠিয়ে দেবে আমায় ?"

"না না বোস্।" বলে অসিত ওকে আদর ক'রে।

লানা লাফিয়ে উঠে দাঁড়ায়, দিদির হাত ধ'রে টেনে বসায় অসিতের পাশে—মোটরে "বোস্ আতুরী, বোস্। আমি একটু মজা দেখছিলাম।—ও মা ও কা দিদি?"

"ঝিলম নদী। জিওগ্রাফিতে পড়িস নি পাঞ্জাবের পাঁচটা নদী সটলেজ ভিয়া, চেনাব, রাবি, ঝিলম?"

"সেই ঝিলম? কিন্তু ঝিলম তো পাঞ্জাবের নদী—এ যে কাশ্মীর।"

প্রীতি বলে: "আহা কাশ্মীরের হিমালয় থেকেই তো নদী নামে। মাথায় তোর কী পোরা বলত?"

ছায়া বলে: "শুধু কেরোসিন তেল। তাই এমন দপ্ ক'রে জ্ব'লে ওঠেন মেয়ে।"

হাসে ওরা সবাই ···

সকালবেলা ছায়াদের বাড়ি। কলকাতা।

প্রতিমা, আসুন আসুন অজয়বাবু, বসুন। আমি চা নিয়ে এই এলাম ব'লে—

প্রীতি: আহা বোসো না দিদি এক সেকেণ্ড সুস্থির হ'য়ে।

ছায়া: সবাই কি সব পারে মাসিমা?

প্রতিমা হেসে ওকে একটি কিল দেখিয়ে চ'লে যায় তাড়াতাড়ি আর একবার "আসছি এক্ষুনি" ব'লে।

অজয় ধরে তবলা ওর আশ্চর্য সুন্দর ঢঙে। গান জ'মে যায় দেখতে দেখতে। ছায়া ধরে অসিতের হার্মোনিয়ামের সঙ্গে:

পূজা আমার সাঙ্গ হ'ল হৃদয় মাঝে তোমায় পেয়ে
এখন শুধু চলছি পথে তোমারি গান গেয়ে গেয়ে।

প্রীতির মাথা অক্লান্তভাবে দুলছে।

"উঁ হুঃ—বলছি অসিদা কখন থেকে এখানটা আমার হয় নি—তুমি তবু গা করবে না। ঐ রেশটা তানের পর—ও—ধু—উ—উ ব'লে ঐখান কী সুন্দর! মাসিমা?"

"সত্যি। বড় সুন্দর" প্রীতি সায় না দিয়ে করেই বা কী?

"কিন্তু ওখানটা যে হচ্ছে না" বলে ছায়া প্রায় কাঁদো কাঁদো সুরে।

অসিত বলে: "ঐ তো খাসা হচ্ছে ."

"তোমার প্রশংসায় যেন আমি কান দিই! বলুন তো অজয় বাবু? হচ্ছে?

অজয়: ঠিক বলব?

ছায়া: হ্যাঁ—একেবারে ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির।

অজয়: অসিদার মতন হচ্ছে না।

ছায়া: দেখলে? অসিদা? কী? এবার?

অজয়: রোসো—আমাকে আগে শেষ করতে দাও কথাটা। আমি হচ্ছে না বলি নি—বলেছি অসিদার মতন হচ্ছে না। এটুকু হ'ল ঠিক। কিন্তু তুমি গেয়েছ একেবারে ঠিক।

ছায়া (আশ্চর্য): একেবারে ঠিকটা হচ্ছে কী?

অজয়: অসিদার চেয়ে ভালো হচ্ছে।

অসিত "সাবাস" ব'লে হাত বাড়িয়ে দেয় অজয়কে। করমর্দন পর্ব আর কি। ছায়া "যাও, তোমাদের কেবল ঠাট্টা" ব'লে উঠে যায় আর কি রাগ ক'রে।

অসিত ওর কণ্ঠবেষ্টন ক'রে ধরে গুনগুন ক'রে 'যদি বারণ করো তবে গাহিব না'-র সুরে:

"যদি তারিফ করো তবে গাহিব না,
যদি ভ্রূকুটি করো মুখে চাহিব না,

যদি আমার ও-প্রাণকূলে
গান তব ঢেউ তুলে
আমার এ তান-তরী বাহিব না।"

ছায়া হেসে ফেলা সত্ত্বেও রাগ করতে ছাড়ে না, বলে: আহা। ভা—রি—"

অসিত: ইয়ে।

ছায়া: এবার ভয়ঙ্কর রেগে যাব কিন্তু অসিদা। আমার কোনো কথাই তোমরা আমল দাও না—

প্রতিমা একটা ট্রেতে তিন পেয়ালা চা আর খাবার সাজিয়ে এনেই অবাক: "কী হয়েছে প্রীতি? ওকে কে বকল ফের?"

প্রীতি (হেসে): ওকে বকবে এমন বুকের পাটা কার দিদি? তবে মেয়ে তোমার ওরিজিন্যাল তা মানতেই হবে। মানে, আমরা বকলে যা করি উনি তা-ই করেন বাহবা দিলে।

প্রতিমা (অসিতকে): তা ওর জন্যে দায়ী তো ভাই তুমিই। অত আদর দিলে কেউ না বিগড়ে পারে? বলুন তো অজয়বাবু?

অজয় (গম্ভীরভাবে): হুঁ বেশি আদর গুরুপাক বৈ কি। কিন্তু তার চেয়েও গুরুপাক আপনার ঐ লুচি আর রাঙা ডালনা আর সাদা পায়েষ। এত এনেছেন কী করতে বলুন তো? এর নাম কি জলখাবার নাকি? না ঋষিবাক্যের মার নেই—যঃ পলায়তি স জীবতি—

ছায়া (উঠে গিয়ে দোরের কাছে দাঁড়িয়ে): সেটি হচ্ছে না। মা বেচারি এত কষ্ট ক'রে লুচি ভাজবে আর আপনারা ভদ্রতা ক'রে বলবেন খাব না—

প্রতিমা: হ্যাঁ ছাড়িস নি। খাবে না কী কথা? সেই সকাল থেকে বাজাচ্ছে বেচারি? অসিত! লক্ষ্মীটি ভাই, না হয় দুপুরে একটু কম ক'রেই খাবে বাড়ি ফিরে। পায়েষটা আমি নিজে হাতে করেছি—ওমা! কপাল-

খানা! আম কেটে আনতে ভুলে গেছি—এক্ষনি আসছি নিয়ে—ততক্ষণ তোমরা সুরু করো ভাই। তারপর এসে গান শুনব। ভাবি তো শুনি —কিন্তু একটু কি ছাই সময় পাই?

ব'লেই দ্রুত প্রস্থান।

কলকাতার আতিথ্য তো। গৃহলক্ষ্মী বেচারি গান শোনে কেমন ক'রেই বা?

ল্যান্সডাউন রোডে প্রীতিদের বাড়ি। সেদিন প্রীতি হরিশমুখার্জি রোডে দিদির বাড়িতে আসতে পারে নি ওর মার অসুখ ছিল ব'লে। কাজেই গানের আসর স্থানান্তরিত হ'ল—ছায়ার মোটরের প্রসাদে সহজেই। তানপুরো তবলা হার্মোনিয়ম সবই নিয়ে যাওয়া হয়েছে—প্রতিমাও গেছে। এবার রসদের ভার নিয়েছে প্রীতি—কাজেই সবই গোলমাল হচ্ছে।

অসিত বলল: "একা প্রীতি? চায়ে নুন?"

প্রীতির মা হেমলতা দেবী বললেন: "সে কি ভাই?"

"আর কি দিদিমা?" অসিত ওঁকে ছায়ার দেখাদেখি দিদিমাই বলত।

প্রীতি বলল: "কেবল ঠাট্টা?"

অজয় বলল বিনীত সুরে: "আজ্ঞে প্রীতিদি, কিছু যদি মনে না করেন তবে বলি, আপনার কাছে চায়ে নুনটা ঠাট্টা শোনাতে পারে কিন্তু আমাদের কাছে নয়।"

প্রতিমা হেসে দাঁড়িয়ে উঠল, বলল: "প্রীতি যেখানে দেখেশোনে সেখানে এম্নিই ব্যবস্থা—আমারই বোঝা উচিত ছিল—না তুই বোস—

তুই গানে মাথা নাড় যা পারিস—চা করতে মঞ্জুকে ডাকলি নে কেন?" মঞ্জু প্রীতির বড়বৌদি।

প্রীতি খুব রাগ করল, না করলে চলে? বলল: "আহা, ভুল যেন মানুষের হয় না? সেদিন তোমার হয় নি; কপির তরকারিতে নুন কম হয় নি?"

দিদিমা বললেন: "কিন্তু নুন কম হওয়া যে-ধরনের ভুল চায়ে নুন হওয়া কি সেই ধরনের ভুল রে? তুই কেন চা করতে গেলি? যা পান সেজে আন যা পারিস।"

অজয় বলল করজোড়ে: "দোহাই দিদিমা—চায়ে নুন বেশি হ'লে মুখে দিয়ে ভদ্রতা রাখা যায় কিন্তু পানে চুন বেশি হ'লে ভদ্রতা রক্ষা করার দাম দিতে হয় দগ্ধানন হ'য়ে। ওতে আমি নেই—না বরং মঞ্জুদিই সেজে আসুন।"

মঞ্জু শান্ত মেয়ে, বলল হেসে: "কী করেন আপনারা সব ঠাকুরঝিকে নিয়ে? ও রোজ সাতান্নটা পান খায় তবু চুন দিতে শেখে নি বলতে চান?"

'সাতান্নটা!" প্রীতি রেগে বেরিয়ে যাবে এমন সময়ে দেবদার উদয়।

"একী? সোনার বাসন্তী মুখে শ্রাবণের ঘনঘটা ঠাঁই পেলে কোন্ ছলে?"

"যাও দাদা। তোমরা সবাই আমাকে ক্ষ্যাপাবে—আমি কমলাদের ওখানে যাই চ'লে। আমাকে বোঝে কেবল ঐ একটি মেয়ে।"

প্রতিমা ট্রেতে চা সাজিয়ে এনে হাজির। দেবদা বলল: "কি গো? ঢেঁকির স্বর্গে গেলেও কী কর্তব্য তার দৃষ্টান্ত হওয়া ছাড়া আর কি কোনো সার্থকতাই নেই তোমার জীবনে?"

প্রতিমা হেসে বলল: "কী করি বলো? তোমার আদুরে সোনামণি অতিথিদের চায়ে নুন দিয়ে অভ্যর্থনা করছিলেন।"

ছায়া এসব শুনতে শুনতে হাসিমুখে একটা স্বরলিপি অভ্যাস করছিল অসিতের শেখানো একটি গানের।

এতক্ষণে মুখ তুলে বলল: "মাসিমাকে ক্ষেপানো যদি সারা হ'য়ে থাকে অসিদা তবে এ-তানটায় চড়া গা-টা গা না পা দেখে দেবে কি? আমার তো মনে হচ্ছে এটা পা-ই হবে।"

দিদিমা (খুসি): দেখ গো দেখ! নিষ্ঠা কাকে বলে দেখ একবার। তোমরা করছ এত হাসি তামাশা কিন্তু ও মেয়ে নিজের কাজ গুছচ্ছে।

দেবদা: আপনারা সবাই মিলে, মা, ওর মাথাটি না খেয়ে ছাড়বেন না দেখছি।

অসিত (ছায়াকে কাছে টেনে এনে আদর ক'রে): এ-মেয়ে কি যে-সে মেয়ে দেবদা! দেখি—হ্যাঁ তাই তো—ওটা পা-ই বটে। দেখেছ দেবদা—কেমন ধরেছে মেয়ে!

দেবদা (প্রসন্নতা গোপন ক'রে গম্ভীর মুখে): ধরাটা কি শক্ত না কি? ও-ই করছে ও সারাদিন। কি বলেন অজয়বাবু?

অজয়: না দেবকুমার বাবু। স্বরলিপিতে ছাপার ভুল ধরা চারটিখানি কথা না।

অসিত বলল: "কী দেবদা? কেবল আমিই বাড়িয়ে বলি, না? অজয় দেখতে বৈষ্ণব হ'লে কি হয়—একটা সোজা ওস্তাদ নয় মনে রেখো—সার্গমে চরকিবাজি খেলে।

দেবদা: যেতে দাও ওকথা—কিন্তু কী গানের তান এটা? একটা নতুন গান না কি?

ছায়া বলল: একেবারে আনকোরা বাপী, আনকোরা। কী সুন্দর যে—শুনলে না তো।

দেবদা (হেসে): আরে, শুনতেই তো আধ ঘন্টার জন্যেও ছুটে এলাম কোত্থেকে জানিস! এখুনি আমায় যেতে হবে ফের—গড়িয়াহাটা।

প্রীতি : এত রোদে ফের যাবে অতদূর ?

দেবদা : কী করব বলো সোনা ? মোট বওয়া যার অভ্যেস তার স্বর্গে গেলেও মোটের স্মৃতি লেপ্টে থাকে মগজে। কিন্তু যাক গে—আমার সময় নেই বেশি (ঘড়ি দেখে) মোটে কুড়ি মিনিট। গা তো শুনি। ভোর থেকে রোদে দাঁড়িয়ে ক্লান্ত হ'য়ে গেছি—একটু চাঙ্গা হ'য়ে নিই—

রাজু : নাইটিংগেলের মূর্ছনা শুনে।

ছায়া (স্বগত) : ফাজিল ছেলে ! মুর্ছনা বানান করতে পারিস ?

মঞ্জু দেবদাকে কমলালেবুর সরবৎ এনে দেয় বরফ দিয়ে।

দেবদা (চুমুক দিয়ে) : আঃ : যার মঞ্জু নেই তার কে আছে ?

প্রীতি হেসে বলে : গঞ্জু ছাড়া আর কে বলো—মানে যাকে সইতে হয় গঞ্জনা প্রতি চুকের জন্যে।

ছায়া : কিন্তু শুনবে না বাপী ?

দেবদা (সরবতে চুমুক দিয়ে) : গান হ'লে তবে তো শুনব। আমি তো দেখছি সোনাদের এখানে গানের চেয়ে পানই বেশি মানে বাংলা পান সোনা, ভুল বুঝো না—ইংরিজি পান নয়।—যাহোক ধর এই মেয়ে !"

অজয় ধরে সুরফাঁক তাল পাখোয়াজে, অসিত বাজায় হার্মোনিয়াম, ছায়া গায় :

"আলো শুভ আলো
হে প্রোজ্জ্বল আশা
তব মন্ত্রণা ঢালো
তব দীপন ভাষা—

না—ওখানটা হ'ল না অসিদা—ঐ তুই তুই তুই তুই কম্পনটা পাপা মামা গাগা রেরে—কী সুন্দর এখানটা বাপী, অথচ ও কম্পনটা আমার বেরুচ্ছে না কিছুতেই।

অজয় : কেন ? বেশ তো বেরুচ্ছে।

ছায়া : কোথায় বেরুচ্ছে ? শোনো তো বাপী। বলো দেখি বেরুচ্ছে ? তব দীপন ভা আ আ আ যা আ আ আ বলো তো অসিদার মতন হচ্ছে ঠিক ?

দেবদা (হেসে) : ভালো শাগিসি পাকড়েছিস বটে। কী অসিত ? হচ্ছে তোমার নয়নতারার তান ?

অসিত (সখেদে) : আমি হতাশ ভাবে সন্দেশ খাই (কথাবৎ কার্য—পাশের রেকাবি থেকে)—ও আমার নয়নতারা হ'লে কী হয় আমি যে ওর চক্ষুশূল—কোনো কথাই আমার নেয় না ও।

দেবদা (বিস্মিত) : সে কি ?

ছায়া : অসিদার কথা শোনো কেন বাপী !—আমার অপরাধ—আমি ধ'রে ফেলেছি অসিদা একটু বেশি বেশি বলে যাকে ভালোবাসে তার সম্বন্ধে—একথা কে না জানে বলো ? নয় মাসিমা ?

দিদিমা (হেসে) : কিন্তু তোকে যে অসিদা ভালোবাসে জানলি কী ক'রে মেয়ে ?

নয়নতারা চুপ ক'রে হাসে—প্রথমে ওর দিদিমার দিকে চেয়ে। একবার ওর বাবার দিকে চেয়ে—সব শেষে অসিতের দিকে চেয়ে।

অসিত (গম্ভীর) : কিছু গাইতে পারে না মেয়েটা—তোর কিছুই হয় নি। এ ভৈরবী সুরফাঁকতাল ধ্রুপদ কি নয়নতারা দেবীর কাজ—এক চক্ষুশূল খাঁ হ'লে তবে যদি একটু পারত।

ছায়া : বাজে বকা ঢের হয়েছে। এখন শেখাবে, না শেখাবে না ? বাপী মিথ্যে বলে নি তোমাদের এখানে মাসিমা গান হয় না, হয় শুধু আড্ডা। ধরো না ঐ কম্পনটা—কী ক'রে গান এগুবে এত গল্প হ'লে ? গাও না ভাই ?—না ঐ কম্পনটুকুই আমি চাই—ঠিক তুমি যেমন করো—বলো তো ?

অসিত (গায়) : তব দীপন ভাষা প ন হ'ল গাগা মামা মনে রাখিস আর ভাষা হ'ল পাপা মামা গাগা রেরে—কেমন, ঠিক মনে হচ্ছে না যেন সুরে আগুন লেগেছে ?

ছায়া (উজ্জ্বল কণ্ঠে) : কী সুন্দর ! আর একবার গাও তো—এবার একটু একটু আসছে। শোনো তো মাসিমা—আহা কী যে চমৎকার ! (গায়)

তব দীপন ভাষা

অজয় (প্রীত) : শোভানাল্লা—যাকে বলে। দেখেছ অসিদা একেবারে তোমার কেডেন্সটুকু পর্যন্ত এসে গেছে এবার।

ছায়া (খুসি) : এতক্ষণে একটু আসার পথে বটে—

দেবদা (ঘড়ি দেখে) : আচ্ছা—নতুন একটা ভুল পাবি এ তানটার জন্যে। চলি অসিত। কিন্তু দেখো হুবহু হয় যেন। কাজ ঠিক না হ'লে দেবকুমার মিঞা বখশিশ দেবার পাত্র নয়।

কলকাতায় শ্রীশরৎ বসুর প্রকাণ্ড বাড়ির প্রকাণ্ড ছাদ। মহাত্মাজি জহরলাল উপস্থিত। ছায়াকে নিয়ে যায় অসিত। নিচে গেটে ঢোকা কঠিন, এত ভিড়। দ্বারী অসিতকে দেখে স'রে দাঁড়ায়—ছায়া প্রতিমা অজয় দেবদা কান্তি মঞ্জু সবাই গেল পর পর। তার পরেই স্লাইডিং গেট বন্ধ।

ছায়া গিয়ে প্রণাম করে মহাত্মাজিকে। অসিত পরিচয় করিয়ে দেয়। জহরলাল চিনেছে : "মনে পড়ে সেই এলাহাবাদে ?" জহরলাল এলাহাবাদে ছায়ার গান শুনতে এসেছিলেন অসিতদের বাড়ি। শুনে বলেছিলেন ওকে (অবশ্য ইংরাজীতে) : তোমার এত সুন্দর গলা তবু আমাকে দেখে ভয় পাও ? আমি তো গানের গ-ও বুঝি না।"

ছায়ার বড় ইচ্ছে জহরলালকেও প্রণাম করে কিন্তু জহরলাল রাজি নয় কিছুতেই। ছায়া একটু নিরাশ হয়।

অজয় বাজায় ওর গিটার, অসিত ধরে হার্মোনিয়াম, ছায়া গায় :

মেরে গিরিধারী গোপাল দুসরা ন কোই
যাকে সির মৌর মুকট মেরো পতি সোই
শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম কণ্ঠ মাল হোই।
তাত মাত ভ্রাত বন্ধু আপনা না কোই
ছাড় দই কুল কি কান ক্যা করে গা কোই।
অঁসুঅন জল সিঁচ সিঁচ প্রেম বীজ বোই
মীরা প্রভু লগন লাগি যো হোই সো হোই।

প্রার্থনার পরেই গান শুরু হয়। আকাশে এক আধটা ক'রে তারা ফুটে উঠেছে। খোলা হাওয়ায় ওর কণ্ঠ যে কী মায়াময় শোনায়! মহাত্মাজি শুনে ওকে খুব আদর করে বললেন ইংরাজীতে : "এ যে অপূর্ব কণ্ঠ। নাইটিংগেলই হ'ল তোমার উপাধি।"

অসিত (ছায়ার পানে চেয়ে হেসে) : কী? এবার?

মহাত্মাজি : ব্যাপার কি?

অসিত : ও বলে আমরা ওকে স্নেহ করি ব'লে ওর কণ্ঠকে বেশি মর্যাদা দেই তার প্রাপ্যের চেয়ে।

* মহাত্মাজি (একগাল হেসে) : এ বেসুরো জগতে নাইটিংগেলকে কি বেশি মর্যাদা দেওয়া চলে কখনো ?

সেই থেকে ওর রটে যায় নাইটিংগেল নাম। যে কয়দিন মহাত্মাজি কলকাতায় ছিলেন ছায়াকে প্রায় রোজই যেতে হ'ত ওঁকে হিন্দি ভজন শোনাতে। ছায়ার সে আনন্দ কি ভুলবার ?

লাহোর স্টেজ। লাজপৎ রায় যক্ষ্মানিবাসের জন্য টাকা তুলতে চ্যারিটি কন্সার্ট। অসিতই উদ্যোক্তা। মহাত্মা গান্ধি ছায়াকে নাইটিংগেল উপাধি দিয়েছেন কাগজে ছাপানো হয়েছে—আরো অনেক কিছুর জোগাড় করেছিল অসিত। খুব লোক হয়েছে। ছায়া তো ভয়ে এতটুকু। মোটরে যখন চলেছে তখনও বলছে: "আমি না গাইলে হয় না অসিদা? নিভাও উল্‌ফৎকা ইন্দো নাজুকোঁ মে সখ্‌ত মুক্কিল হৈ—দম বন্ধ হ'য়ে আসে উচ্চারণ করতে? ও কি আমি পারি?"

প্রীতি (ওর মাথায় হাত বুলিয়ে): পারবি না কেন? তুই কেবল আগে থাকতেই কুডাক ডাকিস।

ছায়া (কাঁদ কাঁদ সুরে): তার উপর তুধারে তুই সারঙ্গিওয়ালা—যদি সুরে কি তালে ভুল হয়?

অসিত (হেসে): পাখীর কি উড়তে ভুল হয় ছায়া, না ঝর্ণার ঝরতে?

ছায়া প্রথমেই গায়:

নিভাও উল্‌ফৎকা ইন্ দো নাজুকোঁমে সখত মুক্কিল হয়
উধর নাজুক মিজাজি উর ইধর নাজুক মেরা দিল্ হয়।

গানের সময়ে 'পিনড্রপ সাইলেন্স' যাকে বলে। অসিতকে একজন বলে ফিশফিশ ক'রে লাহোরের শ্রোতারা রবীন্দ্রনাথের গীতিনাট্য অভিনয়ের সময়েও পা ঘষেছিল। খুব মুগ্ধ না হ'লে পাঞ্জাবীরা ঠায় চুপ ক'রে গান শোনার পাত্র নয়। অসিত তাকায় প্রীতির দিকে পরে ছায়ার দিকে। সারঙ্গিওয়ালা তুজন ফের সুর বাঁধছে ছায়া এবার গাইবে আর একটা গজল হায়দ্রাবাদের বিখ্যাত সভাকবি অমজদের।

অসিতের কানে আসে ওরা সুর বাঁধতে বাঁধতে নিজেদের মধ্যে মন্তব্য প্রকাশ করছে চাপা সুরে।

প্রথম সারঙ্গিওয়ালা: ক্যা সুরেলি আওয়াজ—কামাল কিয়া! য়ে কৌন বাই?

দ্বিতীয় সারঙ্গিওয়ালা: আরে! চুপ। বাই নহি। বাই কি ঐসি সুরত হোতি? বঙালিন।

প্রথম সারঙ্গিওয়ালা: কেয়া বলতে হো। বঙালিন ঐসা উঁচু তলফফোজ—ঐসা সুর ক্যা কোমল নিখাদ লগায়া হ—য় বোলকে। মহশাল্লা! ফির হলক তানকি—য়ে বনারসওয়ালি হয় বেশক।

অন্য সারঙ্গিওয়ালা: আরে বেওকুফ!—

অসিত (ফিশ ফিশ ক'রে): সুর দাঁড়িয়ে—তবলা মিলানা…

ছায়া ধরে বিখ্যাত অমজদের গজল:

য়ুঁ তো ক্যা ক্যা নজর নহি আতা
কোই তুমসা নজর নহি আতা…

গান শেষ হ'ল। করতালি করতালি · করতালি…হুর্‌রে… আংকোর—আংকোর! পাশের এক গুজরাটি বলে: 'আফ্রিন ছু।'

গৌহাটি। ওরা চলেছে শিলঙে। সেখানকার একদল লোক ছাড়ে না—"ছায়া দেবী"র গান তারা শুনবেই। দেবদা প্রথম কিন্তু কিন্তু করে—বিশেষ ওরা ছায়া দেবীকে অভিনন্দন দিতে চায় শুনে। কিন্তু প্রীতি জোর করে। বলে: "এ তোমার অন্যায় দাদা। নাইটিংগেলকে ঘরে পুরে রাখবে কী ক'রে?"

"না। তবে ঐটুকু মেয়ে, গানের অভিনন্দন? এ কি ঠিক হবে?"

ছায়া (খুসি): ঠিক বলেছ বাপী। আমি এখানে কিছুতেই গাইব না। ওমা! আমি আবার অভিনন্দন নেবো কি বলো?

অসিত মহা বিপন্ন। ওকে ধরেছে সবাই। নাইটিংগেল নাম ওর

টে গেছে—গ্রামোফোনের দৌলতে আরও রটেছে ওর কণ্ঠের নাম। সহরের দুতিন জন মাতব্বর এসে শেষটায় ওকে জনান্তিকে একটা পরামর্শ দেয়। অসিতের মুখ উজ্জ্বল হ'য়ে ওঠে, বলে: "আমি রাজি।"

দেবদাকে গিয়ে ওরা বলল: অভিনন্দন দেওয়া হবে না—শুধু গানই শোনা হবে।

দেবদা: সে বেশ কথা।

ছায়া স্টেজে ব'সে ওর নামজাদা "বুল্‌বুল্‌ মনফুল" ধরতেই যা হাততালি! গানের শেষে সেই আংকোর চিৎকার। ছায়ার কপালে ঘাম দেখা দিয়েছে। "আর পারব না ভাই!" শ্রোতারা কেউ চেঁচিয়ে বলে "ঐ টে—নিঝর ধারা।" কেউ বলে: "মুরলী মধু সুরে—।"

এম্‌নি সময়ে গৌহাটির এক যুবক উঠে বলল চেঁচিয়ে: "শ্রীমতী ছায়াদেবী বাংলার নাইটিংগেল আমাদের সভায় এসেছেন আমরা কী যে কৃতার্থ···ইত্যাদি···তাঁর শ্রীকরকমলে আমাদের কৃতজ্ঞ অভিনন্দন—আর্য নাট্য সমাজের সভ্যবৃন্দের শুধু এই প্রার্থনা—যেন শিলং থেকে নামবার পথে ফের তাঁর কিন্নরী কণ্ঠ শোনবার সৌভাগ্য···"

ছায়া (অসিতের পাঞ্জাবীর হাতায় টান দিয়ে): এ কী অসিদা! তুমি যে বললে—

অসিত (ভাজা মাছটি উল্টে খেতে না-জানা ভঙ্গিতে): কী জানি? ওরা যদি পড়ে অভিনন্দন আমি তো টুটি চেপে ধরতে পারি না—

যুবক ততক্ষণ প'ড়ে চলেছে উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে:

উমার তপস্যা হেরি' অপূর্ব বিস্ময়
বন্ধন লইল মাগি' মুগ্ধ মৃত্যুঞ্জয়।

শ্রোতারা: জোরে পড়ুন—louder please

আবার সেই গোলমাল: একটু থামলে শোনা যায়:

—সেই মন্ত্রখা।

জননী তোমার কণ্ঠে দিয়েছেন আনি'—

শ্রোতারা : Louder please…ঐ ঐখানে রে, ঐ হ'ল নাইটিংগেল না না—ফরসা মেয়েটি নয়—কালো মেয়েটি। মুখখানি কিন্তু বেশ… ইত্যাদি।

প্রাণারাম আনন্দের অমৃত সিঞ্চনে
ধরণীর সর্ব দুঃখ করেছ নিষ্ফল
হে কল্যাণী, ব্রত তব হয়েছে সফল
মৃত্যুঞ্জয় আনন্দের এনেছ সন্ধান
মুক্তকণ্ঠে আজি তব গাহি জয়গান—

শ্রোতারা : A song please শুনতে পাচ্ছি নে…মুরলী মধু সুরে—kindly ক'রে—

অসিত ছায়াকে ধরতে বলে গান। ছায়া তো ভয়ে কাঁপছে। কিন্তু যেই গান ধরল সেই সুর তাল মিড় তান একেবারে অটল অচল নিখুঁৎ। ছায়া গায় :

"মুরলী মধু সুরে
নীলিমা নূপুরে
বন্ধন যায় দূরে
নন্দন ফুল-বাসে
কণ্ঠে কাঁপে ভাষা
মন্ত্রে কাঁপে আশা
অন্ধ তিমির নাশা
বন্দনা ভাস্বভাষে।

অমনি সেই আশ্চর্য নিস্তব্ধতা !

শিলং। দেবদার নিজের হাতে তৈরি ইনর্ফোর্স'ড কংক্রীটের বাড়ি। সারা শিলঙ সহরে গান গান আর সর্বত্র তোলপাড় ব্যাপার। কিন্তু ছায়া খুব রাগ করে। বলে 'এখানে গান আমার শেখা হচ্ছে না।"

অসিত শেষটা সভায় গান গাও কমিয়ে দেয়। বাস্তবিকই শুধু গান গেয়ে বেড়ালে তো গানে উন্নতি হবে না ছায়ার। সকাল সন্ধ্যা শেখায়। ওখানে একটি সুগায়িকা পশ্বিনী মেয়ে আসে—রমলা। সুন্দর কণ্ঠ। ছায়া ওকে সখী পেয়ে গরি খুসি। দুজনেই শেখে ওর কাছে।

হঠাৎ শৈলেশ্বর এসে হাজির। র ম্যাট্রিস কলেজের পাশ করা। তার উপর কলকাতার বিখ্যাত নট। শিলং তো আরও সরগরম হ'য়ে উঠল। শৈলেশ্বর এক মাসের ছুটি নিয়েছে অনেক দিন পরে। সঙ্গে এনেছে ওর সুবেশা পত্নী সুহাসিনীকে। সুহাসিনীই বটে।

অসিতের শৈলেশ্বরের সঙ্গে আলাপ বহুদিনের। সেই লক্ষ্মৌয়ে অতুলপ্রসাদের ওখানে আসর হ'ত যখন, তখন থেকে। সুহাসিনীর সঙ্গে আলাপ গতবার হয়েছিল প্রথম—কলকাতায়। শৈলেশ্বর খুব উদার লোক—তেমনি আসর জমাতে পারে—তেমনি উদু বলে। কিন্তু ওর সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব ওর তবলা বাঁধা। শৈলেশ্বরের তবলায় হাত বড় পাকা—কিন্তু ওর একটা ধারণা বদ্ধমূল হ'য়ে গেছে যে তবলা-বাঁধাটা সঙ্গতের চেয়েও সুশ্রাব্য বস্তু। তাই ও যখন তবলা বাঁধত মনে হ'ত ওর এ-ধারণা বদলাবে না যে সময় জমে গেছে চলছে না আর—অর্থাৎ চিরন্তনের কোঠায় প'ড়ে কালাতীত অবস্থার কোঠায় ও এসেছে।

অসিত ওকে বলত প্রায়ই হেসে: "যে আসরে তুমি তবলাধারী শৈলেশ্বর, সে আসরের যেন ধার না ধারি।" শৈলেশ্বর খুব হাসত। ওর খোলা হাসির জন্যে ওকে আরো ভালোবেসে ফেলেছিল অসিত।

এহেন শৈলেশ্বর সুহাসিনীকে নিয়ে রোজ আসত ছায়াদের ওখানে তবলা বাঁধতে, পান জর্দা খেতে আর উর্দুতে গল্প করতে। ও ভারি রসিক। সুহাসিনীকে নিয়েও পড়ত মাঝে মাঝে। সুহাসিনী রাগও করত কিন্তু না হেসেও পারত না।

একদিন বলল শৈলেশ্বর (অবশ্য তবলা বাঁধতে বাঁধতে): "জানো অসিদা! সুহার ইন্‌টুইশন দারুণ। পরশু রাতে আমি কানে আঙুল দিয়ে ঘন ঘন কান চুলকোচ্ছি রাতে শুয়ে—তাতে খাটটা বুঝি একটু নড়েছে। অমনি সুহা চেঁচিয়ে উঠল লাফিয়ে: "ভূমিকম্প গো, আসামী ভূমিকম্প! চলো চলো নিচে—ও কী দেরী করলে নিস্তার নেই।"

"হোঃ হোঃ হোঃ।"

ছায়ার আর ভয় নেই। যে খোলা হাসে তার সঙ্গে ওর সহজেই ভাব হয়। তবে শৈলেশ্বর মস্ত ওস্তাদ ব'লে মাঝে মাঝে তবু ডরিয়ে উঠত বিশেষ হিন্দি গান গাইতে ওর সামনে।

অসিত সেদিন ব'লে দিয়েছে ওকে একথা—অবশ্য তখন ও তবলাই বাঁধছিল পাঁচটা পান একসঙ্গে গালস্থ ক'রে। শৈলেশ্বর ওর সুন্দর আয়ত চোখ আরো আয়ত ক'রে তাকালো ছায়ার দিকে: "অ্যাঁ? ছায়া! আমাকে কি না তুমি ওস্তাদ ব'লে দেগে দিলে।"

ছায়া: তা আপনি লক্ষ্ণৌয়ের পাশ—

শৈলেশ্বর: লক্ষ্ণৌয়ে পাশ করলে (তবলায় ঠকাশ) কি পাখা গজায় (ঠকাশ)?

ছায়া: না, তবে নামডাক গজায়।

শৈলেশ্বর: কিন্তু তুমি কি নিজে একটা সোজা ওস্তাদ না কি? যে জৌনপুরী গাইছ (ঠকাশ) টিমা লয়ে। কিন্তু শোনো, অত টিমা গেয়ো না।

ছায়া : সুরেশ্বর বাবু যে জৌনপুরীটা আমাকে তিমা লয়েই শিখিয়েছিল—

প্রীতি : তা হোক ওটা গা না একটু জলদ ক'রে যখন উনি বলছেন।

ছায়া (মাথা নেড়ে) : না, সুরেশ্বর বাবুর কাছে যে-গান শিখেছি সেটা যখন গাইব ঠিক তাঁর ঢঙেই গাইতে হ'বে—মানে যতটা পারি।

শৈলেশ্বর (ওর পিঠে দিলাশা দিয়ে) : মহশাল্লা ছায়া! এরই তো নাম নাড়া বাঁধা। জীতা রহো। না, আমার কথা আমি ফিরিয়ে নিচ্ছি —তোমার যা ইচ্ছা গাও (ঠকাশ)।

ছায়া (হতাশ) : আজ কি আর গাওয়া হবে? তবলার ঠকাশ তো আর শেষ হবে না।

শৈলেশ্বর : হোঃ হোঃ হোঃ হোঃ। না না ছায়া—The devil is not as black as he is painted by Asida, the angel : আমারো তবলা বাঁধা শেষ হয় এই দেখ—ক্রান্—উঃ—একেবারে সা তো সা-ই—ক্রান্—আরে! এখানকার কানিটায় কী হ'ল আবার! (ঠকাশ)।

প্রীতি (হেসে) : এই চা নিন।

শৈলেশ্বর (কুর্ণিশ ক'রে) : এই তো চাই—সেলাম আলেকম। (চুমুক দিয়ে) নাও এবার ধরো ছায়া!

ছায়া : কোন্‌টা? মাসিমা?

প্রীতি : কাল য়েটা গাইলি সেটা ধরলে কী হয়?

শৈলেশ্বর : ধরা হয়।

ওরা হাসে।

ছায়া বলে : "কিন্তু সেটাতে যে তালফের আছে। যদি ভুল হয়।

শৈলেশ্বর (চায়ে চুমুক দিয়ে) : কুছ পরোয়া নহি। বিলকুল মিলিয়ে দেব।

ছায়া : সেটি হচ্ছে না শৈলেশ্বর বাবু। গোঁজামিল দিয়ে ভুল লয়ে কোনোমতে মিলিয়ে দেব—ভাবতেই আমার খারাপ লাগে। তালে ভুল হ'লে আপনি মিলিয়ে দেবেন না—ব'লে দেবেন কোথায় তাল কাটল।

অসিত (হেসে) : ওর কথা ধোরো না শৈলেশ্বর। তোমার যেমন তবলায় ঠকাশ ওর তেমনি "যদি ভুল হয়"—একটা কথার মাত্রা। যার যেখানে শোভা। গান যখন ও ধরবে তখন ও অন্য মানুষ—সিকিমাত্রারও যদি ভুল হয় তবে বোলো আমায়।

শৈলেশ্বর (উচ্চাঙ্গের হাসি হেসে) : বাঙালি মেয়ে সুরেলা মানি—কিন্তু তালতলা দিয়েও কি সে কখনো গেছে অসিদা ?—নিখুঁৎ তালে গাইবে বঙালিন—য়ে কভি হো সকতা ?

অসিত (ঝাঁঝালো সুরে) : জী হাঁ। শুনিয়ে তো সহি।

শৈলেশ্বর (সমান তাচ্ছিল্যের সুরে) : বহুৎ আচ্ছা—মৈ তৈয়ার হুঁ (ঠকাশ) ধরো ছায়া।

অসিত : দাঁড়াও ছায়া। শৈলেশ্বর! এ গানটি কবি নিশিকান্তের—তিনটি স্তবক। প্রথম স্তবকে ধামার বাজিও, দ্বিতীয় স্তবকে আড়কাওয়ালি, তৃতীয় স্তবকে একতালা। ইচ্ছে ক'রেই খুব শক্ত তালফেরের গান গাওয়াব আজ—কোথাও যদি ওর একমাত্রারও ভুল হয় তো আমার কান ম'লে দিও।

ছায়া : কী করো অসিদা।

অসিত (উদ্দীপ্ত) : কী করি ? শৈলেশ্বর একবার শুনুক—সেই মান্ধাতার আমলের ওস্তাদি ধারণা যে এ যুগে অচল বুঝবে আর কবে ? গা তুই—নির্ভয়ে।

ছায়া ধরে শৈলেশ্বরের ধামারের সঙ্গতে :

মুক্তি এবার চাইব না মা, বলব না মা—সন্ধি করো।
এবার তোমার পাষাণ-কারায় আমায় তুমি বন্দী করো।

অধীর প্রাণের অসুরটাকে
জড়াও শিকল পাকে পাকে
তোমার কঠিন বন্দনে মা আমার সকল শক্তি হরো।

(তালফের—আড় কাওয়ালি)

চাইনে ক্ষমা, চাইনে স্নেহ, চাইনে তোমার ভালোবাসা,
চাওয়ার পালা শেষ ক'রে দাও, শেষ করো মোর পাওয়ার আশা।
আমার দাবি ফুরিয়ে ফেলো
বাসনা মোর পুড়িয়ে ফেলো
তোমার ক্রীতদাসের ম'ত চরণ তলে আমায় ধরো।

(আঁখর—তেওরা)

বোলো না কোমল স্নেহের কথা
ক্ষমা ক'রে আর বাড়িয়ো না মোর অক্ষমতা
তব অশনির আঘাত হানো মা দিও না প্রেমের প্রসূনলতা।

(তালফের—একতালা)

চাইনে তোমার বিজয়শঙ্খ, চাইনে বরাভয়ের পাণি
বিদ্রোহ মোর বিলুপ্ত হোক, বাজুক বরাভয়ের বাণী।
তোমারি ভয় সার জেনেছি
তোমার কাছে হার মেনেছি
আমার মাথার মুকুট দিয়ে তোমার পায়ের নূপুর গড়ো॥

(আঁখর—তেওরা)

তব বরাভয় দিও না মোরে
অহঙ্কারের রথখানি মোর দাও চূর্ণবিচূর্ণ ক'রে
থামাও ভ্রান্ত বিজয়াভিযান
বিলুপ্ত করো সব অভিমান
মম কামনার রাজধানী মোর মুহূর্তে দাও শূন্য ক'রে।

খানিক চুপ ক'রে থাকে, তারপর গান থামলে শৈলেশ্বর অনুতপ্ত কণ্ঠে বলে : "মাফ কোরো অসিদা। সাজা দিয়েছ বটে।"

অসিত (হেসে) : না না—সাজা আবার কী ?

শৈলেশ্বর : তবে আমার তরফের কথাটাও একটু ভেবো ভাই। বাঙালি মেয়েরা কী গান সচরাচর গায় বলো ? ড্রয়িংরুম মিউসিক—বটে তো ? কিন্তু ঐ সব elementary তালেও যেখানে সেখানে ব্রাহ্ম টান লাগিয়ে তালের ছন্দের করে না কি তারা আদ্যশ্রাদ্ধ ? কিন্তু ছায়ার বাংলা গান সুরে তালে তানে—কী কাণ্ড ! কেবল একটা অনুরোধ আছে—বলব অকুতোভয়ে।

অসিত : দিগ্বিজয়ীর মুখে এহেন কুণ্ঠা ?

শৈলেশ্বর : হেতু আর কিছুই নয়—আমার ভয় হয় পাছে ওকে তুমি কীর্তন শেখাও।

প্রীতি (সবিস্ময়ে) : কেন শৈলেশ্বর বাবু ? কীর্তন কী অপরাধ করল ?

শৈলেশ্বর : এমন অতুলনীয় কণ্ঠ—তাই বলছিলাম—কিছু মনে কোরো না অসিদা।

অসিত উত্তর দেয় না। ছায়া হঠাৎ বলে : "অসিদা ! আজ আমার বড্ড ইচ্ছে করেছে একটা গান শিখবার।

অসিত : কোন্‌টা ?

ছায়া : চণ্ডীদাসের ঐ কী আর কহিব আমি।

শৈলেশ্বর : সে কি ? সেদিন যে শুনলাম আজকাল তুমি খেয়াল ঠুংরি শিখছ !

ছায়া : শিখছি। কিন্তু আজ ঐটেই শিখতে ইচ্ছে করছে।

প্রীতি : কেন রে ? সেই ঠুংরিটা কালও শিখবি বলছিলি—সেই নিকালা নিয়ালা—

ছায়া : শিখব—পরে।

দেবদা : পরে কেন! ঠুংরি তো তুই ভালোবাসিস।

ছায়া : হ্যাঁ। কিন্তু কীর্তন আরো ভালোবাসি।—যদিও সবার মুখে নয় অসিদা, শুধু তোমার মুখে।

শৈলেশ্বর : কিন্তু অসিদার কীর্তন তো আর আসল কীর্তন নয়।

ছায়া : আসল কি নকল জানি না তবে অসিদা কীর্তন ব'লে যা গায় আমার খু-ব ভালো লাগে।

দেবদা (তাড়াতাড়ি) : অমন ক'রে জোর দিয়ে কথা বলে না।

ছায়া (অবিচলিত) : যা সত্যি তা বলব না?

ভাবতে আজও মন ওর আর্দ্র হ'য়ে আসে। এমন যে-মেয়ে তাকেও ও ভুল বুঝত কেমন ক'রে? কীর্তন ওর ভালো লাগত না এজন্যে কেন অসিত দুঃখ পেত? ওর কান ছিল অতি সূক্ষ্ম। কীর্তনের লম্ফঝম্পের মধ্যেও যে অসুন্দরতা ছিল তাতে ও আহত হ'ত। না হওয়াই তো আশ্চর্য। ভালো কীর্তন ও শোনে নি—আর যে সব কীর্তন সচরাচর শোনা যায় তাতে রসের চেয়ে দশাই বেশি। সে কীর্তন ওর মতন সুকুমারীর ভালো লাগবে কী ক'রে যে কুশ্রী কিছু দেখলেই আহত হ'ত গভীর ভাবে।

কিন্তু সুন্দর কিছু দেখলে কি ও কখনো উচ্ছ্বসিত না হ'য়ে পেরেছে? মনে পড়ে কাশীতে মোতিবাইয়ের বাড়িতে ও গিয়েছিল অসিতের সঙ্গে। ফিরে এসে কী আনন্দ ওর! "কী সূক্ষ্ম সুরের কাজ—কী মিষ্টি গলা অসিদা!" অথচ কাশীর একজন বাইজীর বাড়িতে যে ও কুমারী মেয়ে হ'য়ে গেল অসিত ডাকতেই, এ কি কম কথা? কিন্তু এভাবে ও যেতে

পারত না কোনো পরম বৈষ্ণবেরও বাড়ি যদি তার বাইরের ব্যবহার হ'ত অসুন্দর।

অসিতের কীতন খাটি কীর্তন নয়—একথা ওকে শৈলেশ্বর ছাড়া আরও অনেকে বলত—যেমন তারা বলত অসিতের সঙ্গীত রাগসঙ্গীত নয়। ও হাসত, বলত: "তাতে কী? সুন্দর তো।" সরল সহজ মন ওর—কূটকচালে তর্ক ও বুঝত না। চলত ও হৃদয়ের নির্দেশে—কান দিত না কূট তর্কে।

কিন্তু অসিত কত সময়েই ভুল বুঝত ওকে: মনে পড়ে কতদিন ওকে বলেছে অসিত ভক্তির গানে ওর মন নেই। ও বলত: "ভক্তি কি জানি না অসিদা, তবে এ জানি যে তুমি যে সব গান গাও তাতে কী রকম ক'রে ওঠে বুকের মধ্যে!" অসিতের গানের এর চেয়ে বড় প্রশংসা কোন্ বৈষ্ণব করেছে? না, গভীর আবেগ, গভীর ভক্তি যখনই সুন্দরের পরিবেশে ফুটে উঠত ওর রূপতৃষিত পবিত্র মনটি উঠত দুলে। ভগবানের কথা ভেবে না—সুন্দরকে বরণ করার দুর্নিবার আগ্রহে। অসিত চাইত ও ভক্তিকে ভক্তি ব'লে চেনে। তা হয়ত ও চিনত না —(কী যে ও ঠিক অনুভব করত বুঝিয়ে বলতে কি ও পারত?)—কিন্তু অসিতের ভক্তির গানে ও যেভাবে সাড়া দিয়েছে তেমন ভাবে কজন সাড়া দিতে পারত সাধক ভক্তদেরও মধ্যে ও প্রায়ই ওর সহজ ছন্দে বলত না কি: "তোমার বৃন্দাবনের লীলা অভিরাম যখন শুনি অসিদা—ধীরে ধীরে কে যেন তার বাঁধতে থাকে বুকের মধ্যে। শেষের দিকে যখন আসো মনে হয় টান এত বেশি—বুঝি বা ছিঁড়ে যায়!" কী অপরূপ ভাষা! এর চেয়ে বড় প্রশংসা কে করেছে ওর এ গানটির—যে গানটির জন্যে প্রতি সভায় লোকে চেঁচামেচি করত! তবু কেন ওর মনে সন্দেহ হ'ত ছায়া বুঝি ওস্তাদ হ'য়ে গেল? এ ধরণের মন যার সে পারে কখনো ওস্তাদ হ'তে?

তবে একথা ঠিক যে ভক্তির চেয়েও ভক্তকে বেশি ভালো বাসত, নীতির চেয়ে জীবনকে শ্রদ্ধা করা তাই বুড় মন্ত্রের উপাসনা, বড় সাধনার তপস্যার সব ও বুঝত না। কিন্তু যেই দেখত একজন ত্যাগী পুরুষ, একজন সুন্দর মানুষ, একজন বড় গুণী ও বলত ওর সরল সুরে: "বড় প্রণাম করতে ইচ্ছে হয়।" ভক্তি যার মজ্জায় বাসা বাঁধে নি সে কি পারে এত বড় কথা এত সহজে বলতে?

ফের ছবি ফুটে উঠে...ছবির পর ছবি। সামনের কৃষ্ণচূড়া গাছটা যেন তাল দেয় হেলে দুলে সেই ছবির সুরে সুর মিলিয়ে কীর্তন বলতে মনে পড়ে যায় হঠাৎ একটা কাণ্ড। একটা খুব বড় কীর্তন ছায়াকে ও শিখিয়েছিল "রাধার আত্মসমর্পণ"—পালার। গাইতে প্রায় চল্লিশ মিনিট লাগত। ছায়া শিখল ঠিক তিন দিনে—একেবারে নিখুঁৎ। কিন্তু গাইতে চায় না: বলে অতবড় গান মনে থাকবে না।

অসিত ওকে ভুল বুঝল ফের। ওর এক মাসির ওখানে দুদিন বাদে গানের আসর ছিল ছায়া ইতস্তত করতে লাগল। বলল: "ওটা নয় ভাই, লক্ষীটি।"

অসিত ভাবল কীর্তন ব'লেই বুঝি ছায়ার আপত্তি। কারণ ঠিক সেই সময়ে ও সুরেশ্বরের কাছে খেয়াল তালিম নেওয়া শুরু করেছে। কাজেই অসিত ভাবল খেয়ালের পরে এসব বাংলা গান ওর আর তেমন ভালো লাগছে না। মুখে অবশ্য এ-খেদ প্রকাশ করল না, কিন্তু সেদিন সকাল বেলা ও একটু বিমর্ষ হ'য়ে শেখাতে লাগল। ছায়া টের পেয়েছিল কিন্তু বলি বলি করেও কি যেন বলতে পারল না।

সন্ধ্যাবেলা সেদিন ও একলাই গেল ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের কাছে বেড়াতে। হঠাৎ দেখে ছায়ার গাড়ি। ও অনেক সময়েই এখানে

বেড়াত ব'লে ছায়া ওকে তুলে নিয়ে যেত। সেদিন ওর দেরি হচ্ছিল দেখেও বেরিয়েছিল নিজেই। প্রীতির কি একটা কাজ ছিল তাই ছায়া একলাই এসেছিল ওকে খুঁজতে।

দেখা হ'ল মেমোরিয়ালের পশ্চিম দিকে রেস কোর্সের মাঠের সামনে রাস্তাটায়।

ছায়া নেমে বলল: "এ কী ভাই? এখানে মাঠে ব'সে? ওদিকে বেঞ্চি রয়েছে তো।"

অসিত বলল: "আয় বোস্। এখানে বেশ নির্জন।"

তখন সন্ধ্যা হ'য়ে এসেছে। সামনে অনেকগুলো মোটরের জটলা—আইসক্রীমের ঠেলাগাড়ি—লেমনেডের ফেরি—কিন্তু এখানটা ছায়ায় ঘেরা—ক্বচিৎ এক আধটা মোটর বা মোটর সাইকেল হর্ণ বাজিয়ে চ'লে যায় হুশ ক'রে। তারপর আবার চুপ।

ছায়া বসল ওর পাশে ঘাসের ওপরেই—সারথিকে হাত দিয়ে সংকেত করল মোটর ঘুরিয়ে রাখতে একটু এগিয়ে।

অসিত বুঝল ও কী বলতে চায়। ভাবতেই ছেলেমানুষি অভিমান এল। মনে হ'ল—এমনিই যেন ছায়া খুব অপরাধ করেছে। সকালে নিজেকে বুঝিয়েছিল অনেক করে যে ছায়া রাধার কীর্তনটা গাইতে চায় না শুধু কুণ্ঠার জন্যে—কিন্তু এখন যেন জোর ক'রেই জপতে থাকে—ও গাইতে চায় না ওটা কীর্তন ব'লে। ও যে কত আগ্রহ ক'রে অতবড় গানটা শিখেছিল সে-চিন্তাকে ও আমলই দিল না। ছেলেমানুষি বলে আর কাকে?

ছায়া একটু চুপ ক'রে রইল পরে ওর হাতের ওপর একটা হাত রাখল। অসিত ধীরে ধীরে হাতটা নিল টেনে। ছায়ার চোখ ছলছল ক'রে উঠল। কিন্তু কিছু বলল না। অসিত দেখল ও মুখ নীচু ক'রে রয়েছে নিচের ঠোঁটটা দাঁত দিয়ে চেপে।

এত ইচ্ছে হ'ল ওকে আদর ক'রে কাছে টেনে আনে। কিন্তু হায় রে ালোবাসার নিষ্ঠুরতা! ওকে যে এত অল্পে দুঃখ দিতে পারে ভাবতেও ন যে আনন্দ হয়!...

খানিক বাদে অসিত বলল: "বেশ হাওয়া বইছে। না?"

"কই?" বলে ছায়া চম্‌কে উঠল। "হ্যাঁ, বেশ।"

"কী হয়েছে ছায়া? মুখ নিচু ক'রে কেন?"

ছায়া নিশ্চুপ।

"কী হয়েছে?" ব'লে ও পিঠে হাত দিতেই যা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কান্না মেয়ের।

"কী পাগলি রে তুই?" অসিত ওকে কোলে টেনে নেয়। "কিছু মনে করিস নে দিদি। লক্ষ্মীটি! শোন্ আমার খুব অন্যায় হয়েছে।"

মোটরে ছায়া ওর দুটো হাত টেনে নেয় নিজের হাতের মধ্যে: "এমন কথা কেমন ক'রে ভাবতে পারলে ভাই? তোমার শেখানো গান আমি গাইতে চাইব না—কীর্তন ব'লে?"

অসিত ওর কণ্ঠ বেষ্টন ক'রে ওর চুলে হাত বুলোয়।

ছায়া বলে: "তুমি বুঝতে পারো না অসিদা!"

"কী?"

"তোমার গান গাইতে আমার কত গর্ব। কুণ্ঠা আসে তো শুধু এইজন্যেই পাছে এমন গান নষ্ট করে ফেলি অসাবধান হ'য়ে।"

এই মেয়েকে ও ভেবেছিল ওর গানের প্রতি উদাসীন!

তারপরেই ছবি ফুটে ওঠে গানের আসরের—ওর মাসির বাড়ি।

অজয় ধরেছে তবলা। ছায়া গাইছে শ্রীরাধার আত্মসমর্পণ পদ। মাসিমা সভার অনেককে বললেন গৌরব ক'রে এ গানটি আমাদের অসিতের রচনা।

আজো শূন্য এ-দেহ মন্দিরে কেহ গাহে নি তো সেই বন্দন
মোর আশা বীথিকায় এলো না তো হায় সে অতিথি ফুলনন্দন
রহে প্রতি তনু অণু বন্ধ্যা···
ওই অবেলায় নামে সন্ধ্যা।···
তাহে অন্তরতলে কী তৃষা উথলে অশ্রুপাথার মন্থন···

এপাশে ওপাশে অসিতের কয়েকজন আত্মীয় আত্মীয়া ছিলেন—খুব গল্প করছিলেন। এঁরা ছায়ার গানের খুব নিন্দা করতেন। দু একটা চাপা সুর অসিতের কানে এল: "আহা কী গানই গাইছেন—ম'রে যাই।"

আর একজন: শোনাই যায় না।

আর একজন: অসিত যে কী দেখে...

আর একজন: আহা কেন যে প্রশংসা করে জানিসই তো ভাই।

আর একজন: আমাদের অসিত কেন এমন অন্ধ হ'ল ভাই?

এরা আত্মীয়া অবশ্য···নইলে এতটা টিটকিরি দিত না প্রকাশ্য সভায় এমন নির্লজ্জ হ'য়ে।

কয়েকটা মন্তব্য ছায়ার কানেও এসে পৌঁছেছিল। মনোদুঃখে ও যেন একেবারে মিইয়ে গেল। কণ্ঠ ওর প্রবল নয় কোনোদিনই, কিন্তু সেদিন যেন আরো মৃদু শোনাল। কোনো কোনো দীর্ঘ তান শোনাই গেল না ভালো ক'রে।

অসিতের যা ক্ষোভ হ'তে থাকে! কেন জেনে শুনে আনল ছায়াকে এই আসরে গাওয়াতে। ছায়া তো গাইতে চায় নি এখানে—বিশেষ এত বড় গান। ও বলেছিল ব'লেই গাইল অনিচ্ছা সত্ত্বেও। কিন্তু কেন ও জোর করল? বোঝা কি উচিত ছিল না? ছি। সেই কঠোর

ইংরাজি প্রবচনটা মনে পড়ে তাদের সম্বন্ধে যাদের সামনে মুক্তা ছড়ানো বিড়ম্বনা। ··চেষ্টা ক'রে রাগ সামলাতে হয়। এত রাগ ওর অনেকদিন হয়নি।

ও দায়সারা ক'রে একটা হিন্দি গেয়েই উঠে পড়ল গলা ভালো নেই ব'লে। অনেকে এসেছিলেন একটু নিরাশ হয়ে ফিরলেন।

"চলো দেবদা!"

"সে কি? আজ এখানে খাবিনে তুই?" বললেন মাসিমা।

"না মাসিমা। শরীর ভালো নেই।' ব'লে প্রায় রূঢ় তৎপরতার সঙ্গে ও সবার সামনে ছায়ার গাড়িতে উঠেই ডাকল: "আয় ছায়া!"

দেবদা বাজনা টাজনাগুলো নিয়ে উঠলেন: প্রতিমা অজয় প্রীতিও উঠল। দেবদা ও অজয় বসলেন সামনে সারথির পাশে।

"চলো। হ্যাঁ বাড়ি।"

প্রীতি বলল: একটু লেক ঘুরে যেতে বলো না দাদা।

"বেশ। চলো—লেক।

দেবদাই প্রথম নিস্তব্ধতা ভাঙল: "তা বেশ হয়েছে। মাঝে মাঝে গান একটু খারাপ হওয়া ভালো।"

প্রতিমা: বটেই তো। ক্রমাগত ভালো গাইলে গুমর হয়।

প্রীতি (ফোঁস ক'রে): কেন? ছায়ার গান এমন কী মন্দ হয়েছে শুনি? কী বলেন অজয়বাবু?

ছায়া (অজয়কে): কী মাসিমার কথার উত্তর কি আমার দিকে চেয়ে মুখ টিপে হাসি?

অজয়: কী বলব বলো? যদি বলি তোমার গান মন্দ হয় নি বলবে তো মন রাখা কথা বলছি?

ছায়া: আপনিই তো প্রায় বলেন সাহেবরা কোদালকে কোদাল ব'লে খুব ভালো করে।

দেবদা (হেসে) : কী হে অসিত ? ইতিমধ্যে পাখিকে বোলচালেও তালিম দেওয়া সুরু করলে কবে ?

প্রতিমা : মেয়েকে তোমার যত মুখচোরা ভাবো তত নয় গো নয়। কায়ে পড়লে ও বেশ দুকথা শুনিয়ে দিতে পারে।

দেবদা (সুর ক'রে) : মা কি বেটী সিপাইকি ঘোড়ি
কুছ নহি হয় তো থোড়ি থোড়ি।

প্রতিমা : আহা ! যেন আমার কাছেই ও কথা শেখে—ওকে কি আজকাল আমি দিনের মধ্যে পনের মিনিটও কাছে পাই ? হয় ওর গুরু নয় ওর মাসি নয় ওর সমজদার এই অজয়বাবু।

অজয় (করজোড়ে) : রাজায় রাণীতে যুদ্ধ খাসা জিনিষ প্রতিমাদি কেবল উলুখড়ের কাছে নয় মনে রাখলে বাধিত হব।

দেবদা : আজকাল দেখি সব্বাই হয়ে উঠেছে বাক্যবাগীশ। মেয়ের আমার দোষ কী ?

অসিত (ছায়ার কণ্ঠবেষ্টন ক'রে) : নয়নতারা যাঁর উপাধি তাঁকে দোষ দেয় কোন্ অন্ধ শুনি ?

দেবদা : তা যাই বলো অসিত, তোমার নয়নতারা কিন্তু শক্ত আছেন —খড়কুটোর চেয়ে অনেক বেশি সইতে পারেন চোখের জল না ফেলে।

ছায়া : আজ কিন্তু একটু অতিষ্ঠ হ'য়ে উঠেছিলাম বাপী !

দেবদা : সে কী রে ! আমার তো মনে হচ্ছিল তোর গান ওরা খারাপ বলাতে তোর একটুও মন খারাপ হয় নি।

ছায়া : আঃ সেজন্যে নয় বাপী—ভালো বললেই বা আমি কী এমন্ রাজা হ'য়ে যেতাম—

অজয় : খুড়ি—রাণী।

প্রীতি : তবে কী জন্যে আজ এত অতিষ্ঠ হয়েছিলি শুনি!

ছায়া : ওঁরা কেন কথায় কথায় 'আমাদের অসিত' বলেন বাবা? আমাদের অসিত হেন—আমাদের অসিত তেন, এসব কী?

অজয় (ঠাট্টা ক'রে): বলা উচিত ছিল নয়নতারাদের অসিত—কি বলো?

ছায়া (দৃঢ়স্বরে): না বলা উচিত ছিল—সবারই অসিত! কারণ অসিতদা আর যাই হোক সংসারী নয়।

লেক ঘুরে ওরা যখন নামল মোটর থেকে—দেবদা ছায়াকে টেনে নিল বুকে সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতেই: "অসিতদাকে চিনেছিস ঠিকই, দুষ্টু মেয়ে। কাল আর একটা নতুন শাড়ি—ভুল হবে না।"

নতুন শাড়ি ও কী যে ভালোবাসত! প্রীতির অজস্র অকাজের মধ্যে একটি ছিল প্রায় প্রতি সপ্তাহে ওকে একটি ক'রে নতুন শাড়ি জোগানো। কিম্বা দুল। ঘিতে যেমন আগুনের অরুচি নেই তেমনি ছায়ার অরুচি ছিল না এদুটি উপহারে—রঙিন শাড়ি আর বাহারে দুল। কিন্তু শখের আরম্ভও এখানে, শেষও। আর কোনো গহনা বা সাজ সজ্জার জন্যে ওর একটুকুও উৎসাহ ছিল না। অসিত ওকে ঠাট্টা ক'রে প্রায়ই বলত এমন শাড়িয়ানা আর দেখেনি সে। অথচ পরে একদিন ছায়ার একটা মস্ত তোরঙ্গ চুরি যায় রেলষ্টেশনে। তাতে অসিতের হাতে লেখা একটি জাপানী গানের খাতা ছিল—অসিত ওকে যে শো-খানেক গান শিখিয়েছিল তিনবছরে সবই তাতে লেখা ছিল। এই খাতাটির জন্যে ওর সে কী শোক! অসিতকে লিখেছিল: "ভালো ভালো শাড়ি গেছে প্রায় পঁচিশ-খানা, ভালো দুলও পাঁচ ছটা। কিন্তু তাতে দুঃখ নেই অসিদা, দুঃখ এই যে তোমার দেওয়া অমন সাধের খাতাটা খোয়া গেল। আহা, চোর যদি শুধু খাতাটা ফেরত দেয় তো আর এক তোরঙ্গ শাড়ি আমি তাকে

বখশিস দিতে রাজি আছি। এইভাবে একটা বিজ্ঞাপন দিলে হয় না অসিদা ?"

আজও অসিতের অবাক লাগে ভাবতে একথা। কে ওকে শেখালো একথা ? সংসার কী হয়ত ও দেখেশুনে কিছু শিখেছে, কিন্তু সংসার ছাড়ে মানুষ কী ধরণের প্রবল টানে, আর সে-টানে সংসার ছাড়লে যে বৈরাগীর আত্মীয় বলতে কেউ থাকে না একথা ও ধরলে কী ক'রে? অসিত তো কোনোদিনই বলে নি একথা মুখ ফুটে। ও-ও সাধু সন্ন্যাসীর সঙ্গে মিশত না কোন দিন যে একথা শুনবে, বলতে কি, সাধু সন্ন্যাসী মন্দির মঠ এসব ও এড়িয়েই চলত সচরাচর, যেজন্যে অসিত কত সময়েই মনে মনে ব্যথিত হয়েছে। মুখে ওর কাছে বলে নি এ ব্যথার কাহিনী—এ বিষয়ে অসিত ছায়ার চেয়ে কিছু কম চাপা নয়—হাসি গল্প আনন্দের বেলায় খুব খোলাখুলি হ'লে কী হয়। কিন্তু ও টের পেত এব্যথা যে কেমন ক'রে। ঐ ধরো, রাধার গানটা গাইতে চায়নি ওকে কীর্তন ব'লেই এ-সন্দেহ অসিত মনে প্রশ্রয় দিয়ে গভীর আঘাত পেলেও মুখে তো বলে নি একটি-বারও। অথচ ওর বিমনা ভাব দেখে ঐ শিশু মেয়ে এক মুহূর্তেই তো ধ'রে ফেলেছিল অসিত কী কারণে আঘাত পেয়েছে! তেমনি ও বুঝত—(শুধু উড়ো আন্দাজে নয়, কেমন এক নিশ্চিত দর্শনে যেন)--অসিত দুঃখ পায় ও সাধু সন্ন্যাসী মঠ মন্দির তীর্থ ভাগবত পুরাণ প্রভৃতি সম্বন্ধে ঔৎসুক্য বোধ করে না ব'লে। বুঝত দুঃখও পেত—সময়ে সময়ে তাই তো ঐ সংযমী মেয়ে চোখের জল রাখতে পারত না সেজন্যে পরে ওর অনুশোচনার অন্ত থাকত না। কিন্তু সব বুঝেও—অসিতকে ওর ব্যবহারে ব্যথা পাওয়া থেকে যে ও রক্ষা করতে পারত না সে-ব্যথা যে কতবড় অসিতও আন্দাজ করতে পারত বৈ কি। ক্রমাগত নিজেকে

বলত সে-সময়ে যেন ছায়াকে ভুলেও কখনো কোনো কষ্ট না দেয়। অথচ এই সব তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে কী যে মনকষাকষি দাঁড়িয়ে যেত। এ ধরণের মন কষাকষি তো কই ওর কারুর সঙ্গেই হয় নি কখনো—এত তুচ্ছ জিনিষ নিয়ে! ছায়া সাধু সন্ন্যাসী মঠ মন্দির ভালোবাসে না—নাই বা বাসল। প্রত্যেকেই তো স্বাধীন। গুরুদেবের দীপ্ত মুক্ত সংস্পর্শে এসে ও একথা আরো বুঝেছে। তিনি কখনো কি কারুর ব্যক্তিত্বে হাত দিতেন? অসম্ভব। মনে আছে একবার ও আশ্রম থেকে যখন চ'লে যেতে চায় হিমালয়ে ওর যোগী বন্ধু আনন্দের কাছে, গুরুদেব লিখেছিলেন ওকে (ও তখন কলকাতায়): "তুমি ভগবানকে পাও এজন্যে আমার যথাসাধ্য আমি করবই অসিত। আমার সহায়তায় পাও কি অন্য কারুর সহায়তায় পাও সেটা অবান্তর—যেটা প্রাসঙ্গিক সেটা হচ্ছে তোমার ভগবানকে পাওয়া।" কত বড় কথা অথচ কত সহজ ছন্দে লেখা—যেন কিছুই না। তাঁর চরণচ্ছায়ায়ই ও শিখেছিল, নতুন করে নাহোক গভীরভাবে, যে স্নেহ প্রীতি প্রেম বন্ধুত্ব জীবনের তীর্থপথের পাথেয় হয় কেবল তখন যখন টানটা হয় নির্মল, অর্থাৎ যখন আমরা দিতে চাই ফিরে চাই না। বলতেন গুরুদেব যে প্রেমে নিষ্কাম বলতে শুধু দেহশুদ্ধি বো ঝায় না; দেহশুদ্ধি তো চাইই—দেহসুখের লেশ থাকলেও প্রেম নিষ্কাম হয় না—কিন্তু পুরোপুরি নিষ্কাম হ'তে হ'লে চাই আশা-শুদ্ধি। অর্থাৎ সব রকম প্রত্যাশা থেকেই মনকে মুক্ত রাখতে হবে। স্নেহাস্পদকে ভালোবাসতে তার সত্তার মধ্যে তার শুভের জন্যে তার আনন্দের জন্যে—তোমার নিজের কোনো সুখসাধের জন্যে নয়। প্রত্যাশাকে প্রশ্রয় দিলে—বলতেন গুরুদেব—প্রীতি প্রেম স্নেহ সরল হয় না, ফুলই ফোটায় না শুধু, কাঁটার জটিলতারও সৃষ্টি করে। শুদ্ধ স্নেহ চাইবে স্নেহাস্পদের স্বাধীনতা অব্যাহত রাখতে— তার ইচ্ছাকে নিজের ইচ্ছার পথে চালাতে কোনো রকম জোর করবে না। শুদ্ধ প্রেম লওয়ায় কিন্তু মোচড় দেয়

না। মহাত্মাজির উপবাসকে যখন কেউ বলত ননভায়োলেন্স, গুরুদেব শুধু মৃদু হাসতেন। একদিন শুধু বলেছিলেন যে দৈহিক জোরের চেয়েও এ-জুলুম বেশি অনাধ্যাত্মিক। আবার বলেছিলেন যে ভালোবাসা যখন দাবি জানায় প্রবল ভাবে তখন তবু তা বোঝা যায় কেন না সেটা হ'ল জীবের জীবনের গোড়াকার তৃষ্ণা প্রায় পাশবিক কোঠায় পড়ে। কিন্তু ভালোবাসা যখন ভালোবাসার নামে জোর করে— তুমি আমার অভীষ্ট ম'ত কাজ না করলে আমি মর্মান্তিক কষ্ট পাব ব'লে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কিছু করায়—সেখানে সে-জুলুম বাইরে থেকে দেখতে পাশবিক না হ'লেও আসলে জবরদস্তি হিসাবে বেশি অক্ষমনীয়। কেন না ওখানে লুকিয়ে থাকে আত্মপ্রতারণা। যে ভালোবাসে সে ভাবে নিজেকে কী যে উদার, অথচ আসলে সে সমানই জুলুমবাজ—অন্তত আধ্যাত্মিক প্রেমের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে। একথা অধ্যাত্ম উপলব্ধি মাত্রেরই সম্বন্ধে সমান খাটে: প্রকৃত অধ্যাত্ম সত্যদ্রষ্টা ব'লে দেন সত্য এই এই—কিন্তু তোমার এসত্যকে গ্রহণ করতেই হবে ব'লে পীড়াপীড়ি করেন না ভুলেও। বোঝান, লওয়ান, ব'লে দেন না নিলে কী ফল হবে—কিন্তু নিজের ইচ্ছার বা বাসনার কোনো প্রয়োগ করেন না।

অসিত তাই চেষ্টা করত প্রবল পণে যাতে ছায়া ঘুণাক্ষরেও না টের পায় যে অসিত যা শ্রদ্ধা করে তা ছায়ার শ্রদ্ধেয় না হ'লে অসিতের বাজে, ওর কোনো নিহিত আশা ছায়া পূর্ণ না করলে ও মুখে কিছু না বললেও মনে মনে দুঃখ পায়। কিন্তু ঐ একরত্তি মেয়েটা কী ক'রে ধ'রে ফেলে— প্রতিবারই! যেমন এই রাধার গান গাওয়া নিয়ে হয়েছিল। কিন্তু এরকম কত যে ছোটখাট ব্যথা দেওয়া ও ব্যথা ফিরে পাওয়ার ঘাত-প্রতিঘাত চলত ওদের মধ্যে এক প্রীতি কিছু কিছু জানত—কিন্তু সে-ও সূক্ষ্মতম আঘাতের অন্তঃপুরে প্রবেশ করতে পারত না—যেখানে ছায়ার সঙ্গে অসিতের চলত মান অভিমান অজান্তে দুঃখ দিয়ে দুঃখ পাওয়ার

স্বপ্ন নাট্যলীলা। এ-দুঃখের মধ্যে একটা সেরা দুঃখ আনত এই ভগবান নিয়ে টানাটানি। অসিত কত যে ক্ষুব্ধ হ'ত ওকে নাস্তিক ভেবে—ভাবতে সময় সময় আনন্দ হ'ত ভাবত আর আসবে না আশ্রম ছেড়ে এহেন নাস্তিক মেয়ের সঙ্গে মিশতে। কিন্তু সংকল্প টি'কত না। ওর স্নেহকোমল মুখ, উদার দৃষ্টি সত্যনিষ্ঠ আচরণ ও পুষ্পশুভ্র চরিত্রের কথা যখনই মনে পড়ত না এসে পারত না। প্রতি বছরই অন্তত একবার ক'রে ওকে ছায়ার দরবারে হাজিরি দিতেই হ'ত—হয় কলকাতায়, নয় শিলঙে নয় কাশ্মীরে নয় আর কোথাও। ওর বৈরাগ্যের মনোভাব এজন্যে ওকে তিরস্কার করত বৈরাগীর পক্ষে ফিরে ফিরে সংসারীদের সঙ্গ ভালো নয় ব'লে। কিন্তু মুস্কিল এই যে বহু চেষ্টা ক'রেও ও কিছুতে ছায়াকে 'সংসারী মেয়ে' ভাবতে পারত না। নাস্তিক? হাঁ নাস্তিক মনে হ'ত বটে সময়ে সময়ে। অথচ এ-প্রশ্নেরি বা চরম নিষ্পত্তি হ'ত কই? নাস্তিক যে মেয়ে সে-ভক্তির গানে এমন দুলে ওঠে কী ক'রে, ভজনে কীর্তনে অন্যের হৃদয়েও ভক্তির ঢেউ তোলে কোন্ কৌশলে? অপরূপ কণ্ঠের? কিন্তু অপরূপ কণ্ঠ তো ও আরো শুনেছে—তারা তো কই এমন গান গাইতে পারে না—যা শুনতে না শুনতে মন ঊর্ধ্বমুখী নাহয়ে অন্তর্মুখী হয়। না, ওর মধ্যে নামে ভক্তির মন্দাকিনী কেবল ও জানে না আজও। মনে পড়ে ছায়াকে একটি হিন্দিভজন শিখিয়েছিল ও:

হয় প্রেম গঙ্গা বহ রহী তেরে হৃদয়কে আসপাস
ফির ভী সদা তূ তৃষিত ক্যোঁ য়ে তো বতা দে প্রেমদাস।

আহা কী গাইত মেয়েটা এই শেষ দুটি চরণ। মনে হ'ত ওর অন্তরের অতৃপ্ত তৃষ্ণা যেন জানাচ্ছে তার চিরন্তন কান্না ভগবানের পায়ে:

বহে প্রেমের গঙ্গা যে চির অঝোর
তোরি হিয়ার আশে পাশে তবুও মন,

বল্ তৃষিত কেন তুই জীবন ভোর
তোর বুঝি না প্রেমদাস, ধারা কেমন!

কী একটা গভীর সুর ছিল ওর হৃদয়ের গহনে "চির অঝোর"। তাই বুঝি ও হৃদয়ের আলোয় ধরতে পারত সেই সত্যকে যার বিরুদ্ধে মন ওর বেঁকে বসত সংস্কার বশে। এই-ই কি সত্য? নইলে কেমন ক'রে ও ধরে যে অসিতদা সবারই স্বজন, কোনো আত্মীয়ের পরিজন নয়? একথা তো ওর কাছে নির্মমতারি সামিল হওয়া উচিত—কেন না ও গভীর ভাবে ভালোবাসত বাপ মা মামা মাসি ভাই বোনকে। আত্মীয়তার হাজারো জালে ও বাঁধা। মুখে ও ভালোবাসার কথা ভুলেও বলত না বটে কিন্তু ওর প্রতি কাজে পরিচয় পেত প্রতি স্নেহাস্পদের জন্যে ও কত ভাবে। অসুখের অসহ্য যন্ত্রণার সময়েও জিজ্ঞাসা করত মা মাসি দিদিমা মামা সবার খাওয়া হয়েছে কি না—ওর অসুখের জন্যে লীনার স্কুলে যাওয়ার ব্যাঘাত হচ্ছে কি না ওকে দেখতে যারা আসে অসুবিধে ক'রে আসে না তো?—ইত্যাদি অথচ তবু ও ধরল কী ক'রে যে আত্মীয়তার গণ্ডীর মধ্যে যারা বাস করে তাদের প্রীতির সে দীপ্তিমূল্য নেই যে মূল্য আছে তাদের প্রীতির যারা সহজে পরকে করতে পারে আপন। পরের জন্যে যার প্রাণ কাঁদে—শুধু আত্মীয়ের জন্যে নয়—তার প্রতি ওর শ্রদ্ধা ছিল গভীর। ওর বড় প্রিয় ছিল অতুল প্রসাদের একটি গান:

আমায় রাখতে যদি আপন ঘরে বিশ্বঘরে পেতাম না ঠাঁই,
আমার স্বজন যদি হ'ত আপন হ'ত না মোর আপন সবাই।

মুখে ও বলতে পারত না এসব কথা গুছিয়ে, কিন্তু পারত যেটা মুখে বলার চেয়ে ঢের কঠিন কাজ: ওর গভীর শ্রদ্ধায় প্রকাশ করা এই আনন্দ। অসিত জানত ওর গান ছায়ার কত প্রিয় কিন্তু ছায়া কখনো চাইত না অসিত আর কাউকে না শেখাক। বরং যদি কেউ ওর সঙ্গে গান শিখতে চাইত ও সানন্দেই বরণ ক'রে নিত। কলকাতায় ওর দ

একটি প্রিয়সখী মাঝে মাঝে ওর কাছে আসত—পরে এক আই সি এসের মেয়ে—এক আগ্রার মেয়েও। এরা সবাই যে ভালো গাইত তা নয়—কিন্তু ভালো গাওয়া না গাওয়া ছিল ওর কাছে অবান্তর। এদের সঙ্গে একত্র অসিতদার কাছে গান শিখবে এইই তো সঙ্গত, উচিত: অসিতদা তো ওর নয়—সে যে সবারই। অথচ ও জানত ও যদি ঘুণাক্ষরেও প্রকাশ করে যে যারা তেমন ভালো গাইতে পারে না তাদের সঙ্গে শিখতে ওর একটুও অসুবিধে হচ্ছে—তাহ'লে অসিত নিষ্করুণ হ'য়েই তাদের প্রত্যাখ্যান করবে। তাই ও আরো সাবধান ছিল পাছে অসিত টের পায় যে ওর এ-ধরণের বন্দোবস্তে সুবিধে হয় না। কেন না যে-সময়ে অন্য মেয়েরা একটা গানও ভালো ক'রে শিখে নিতে পারে না সে সময়ে ও পারত অন্তত দু তিনটে গান নিখুঁৎ আয়ত্ত করতে। শেখার তৃষ্ণাও ছিল ওর অতৃপ্য—কিন্তু তবু না—ওর সুবিধের জন্যে অপরকে অসিদা 'না' বলবে? ছি। কম শেখা হয় উপায় কী? যে সবারই তাকে ও একা দখল করবে কেমন ক'রে?

শিলঙে ওর একটা খুব চমৎকার প্রমাণ মিলল রমলাকে নিয়ে। রমলা ছিল ও-অঞ্চলের একটি বিশেষ রূপবতী ও গুণবতী মেয়ে। বড় ঘরের মেয়ে। ওর বাবা ওখানকার মস্ত চাকুরে। রমলা নিজে চৌখস মেলামেশায়, বেশভূষায়, গল্পালাপে, পার্টি মজলিশে—এমন কি ফ্যাশানেবল বল ডান্সেও সে পেছপাও নয়। অভিনয়ও করে চমৎকার—ইংরাজি বাংলায় সব্যসাচী যাকে বলে। ক্লাবে যায় টেনিস খেলে কী না করে? এহেন রমলা গাইল এক পার্টিতে রবীন্দ্রসঙ্গীত। ছায়ার এ ধরণের গান আর তেমন ভালো লাগত না—কিন্তু সে গান শুনে মুখে কিছুই বলল না। রমলা অসিতকে ধরল: "আমাকে শেখাতেই হবে।" অসিত বড় বিপন্ন বোধ করে। শিলঙে এত লোক আসছে গল্প করতে, গান শুনতে, নিমন্ত্রণ করতে, বেড়াতে নিয়ে যেতে, যে ছায়াকে বড় জোর দেড় ঘণ্টা

দুঘণ্টার বেশি শেখানোর সময় পাওয়া যায় না। কলকাতায় শেখাত সকালে দু ঘণ্টা রাত্রে দু তিন ঘণ্টা—রোজ। ছায়া তাই আরো ফিরতে চাইত প্রথম প্রথম। কিন্তু সবাই অসিতকে চাইছে দেখে দুচার দিনের পর আর বলত না ফেরার কথা। কেবল সময়ে সময়ে অতর্কিতে ওর আক্ষেপ ফাঁশ হ'য়ে পড়ত যে শিলঙে গান শেখা হ'ল না এবার ভালো ক'রে, অসিদা দুদিন বাদেই তো ফিরে যাবে আশ্রমে! ব'লে কখনো বা হয়ত ছোট্ট একটি দীর্ঘ নিঃশ্বাস পড়ত। অসিত অনুতপ্ত বোধ করত কিন্তু কী করে? কলকাতা ওর আদৌ ভালো লাগে না। এখানেও ওদের মধ্যে এক গরমিল ছিল, কারণ ছায়ার খুব ভালো লাগত কলকাতার বাড়ি আর মামার বাড়ি। অথচ অসিত সেখানে স্বস্তি বোধ করে না—আত্মীয়দের দরুণ। নিরুপায়। সব সমস্যার কি সমাধান আছে? ছায়া তাই শিলং এসেছিল অনিচ্ছা সত্ত্বেও—অসিত তো একটু স্বস্তি পাবে।

কিন্তু ওর জন্যে ছায়া কলকাতা ছেড়ে এসেছে ভাবতেও আবার অসিতের খারাপ লাগত। তাই ও চাইত ওকে কিছু অন্তত ক্ষতিপূরণ দিতে। ক্ষতিপূরণ আর কী?—একটু বেশি ক'রে গান শেখানো। যখন ও শিলঙে আসে তখন ভেবেছিল সত্যিই যে শিলঙে ওর বন্ধুবান্ধব একটি নেই কাজেই শেখানোর সুবিধা হবে। কিন্তু এখানে এসে শুধু যে অনেক পুরোনো বন্ধু বান্ধবীর দেখা মিলল তাই নয়—তার উপর নতুন বন্ধু বান্ধবী এত বেশি লাভ হ'ল যে ও মুস্কিলে প'ড়ে গেল। এমন কি টিপার্টিতেও যেতে হ'ত অনেক সময়ে নতুন আলাপীরা এত ধরতেন। আর সবচেয়ে অপছন্দ করত ও ওই সব পার্টি। এই রকম একটি পার্টিতেই রমলার সঙ্গে ওর দেখা। আর সেই রমলা ওকে ধরে পড়ল: "আমি আপনার ওখানে গিয়ে গান শিখে আসব—কষ্ট দেব না একটুও এক্ষেত্রে না বলেই বা কোন্ অজুহাতে?

অথচ বলা তো উচিত। কারণ অসিত বুঝেছিল ছায়া মুখে এতে সায় দিলেও মনে মনে যে এ-প্রস্তাবে প্রফুল্ল হ'তেই পারে না। কেন না রমলা শিখতে এলে গান শেখার টেম্পো একটু ঢিমিয়ে যাবেই যাবে।

সেদিন সন্ধ্যাবেলা অসিত ছায়ার সঙ্গে বেরিয়েছে বেড়াতে। হঠাৎ ছায়া বলল: "রমলার গান কেমন লাগল অসিদা?"

"তোর কেমন লাগল শুনি আগে?"

ছায়া একটু চুপ ক'রে থেকে বলল: "রবীন্দ্রনাথের গান। ভালোই।"

অসিত হাসল। পায়চারি করতে করতে একথায় সেকথায় লেকের ব্রিজটার ওপরে এসে পড়েছে।

"কী বলবে ব'লেই ফেলো না অসিদা। অত উশখুশে কাজ কী?" ব'লেই হেসে ফেলল।

অসিত তাকালো ওর মুখের দিকে: "কী বলব তুই জানিস?"

"জানি না?"

"তোর মাসির ভাষায় বলি ই-শ্।"

ছায়া তর্জনী তুলে শাসিয়ে বলল: "আর যদি বলতে পারি?

অসিত হেসে বলল: "একটা ভুল দেব—যে ক'রে পারি।"

ছায়া বলল হেসে: "ভুল কি চায় কেউ তার কাছে, অসিদা, যার কাছে ওর চেয়ে ঢে—র বড় জিনিস চাইলে মেলে?"

অসিত ওর চিবুক ধ'রে খুব আদর ক'রে বলল: "নয়নতারা নাম রেখেছি কি সাধে? আচ্ছা যদি বলতে পারিস—রোজ সকালে বিকেলে দুবেলাই শেখাব। প্রতি বেলায় একটি ক'রে নতুন গান।"

ছায়া হাসল দুষ্টুমির হাসি: "আমিও বলি ঈ-শ্। এখন আর হয় না।"

"কেন?"

"জানো না? ডেকেছ কী জন্যে শুনি।"

অসিত একটু অবাক হ'ল সত্যিই। মেয়েটা ধরে তো সত্যিই! টেলিপ্যাথি জানে না কি? বলল: নাঃ। ধ'রে ফেলেছিস কবুল করছি। হ্যাঁ রমলার কথা জিজ্ঞাসা করতেই তোকে ডেকেছি একটু নির্জনে।

"কিন্তু নির্জনে কেন?"

"তোর মুখ হল্‌সা মাসি হয়ত হল্ হল্ ক'রে বলে দেবেন ওকে।"

ছায়া হাসল।

অসিত বলল: "কিন্তু কী বলিস তুই?"

ছায়া তাকাল ওর দিকে একটু আশ্চর্য হ'য়ে: "কী বলব? এতে বলবার কী আছে? ও শিখতে চাইছে শেখাবে। বেশ তো হবে দুজনেই শিখব।" ব'লেই চোখ নিচু করল।

অসিত ওর চিবুক ধ'রে তুলল একটুখানি: "এবার কিন্তু যে ধরা প'ড়ে গেলি!"

বলতেই ও ঝর ঝর ক'রে কেঁদে ফেলল।

"এ কী রে? ঠাট্টা ক'রে একটা কথা বললাম—"

অসিত ওকে বসায় একটা বেঞ্চির উপর জলের ধারে। আদর ক'রে বলে: "কেন কাঁদছিস ভাই। আমি রমলাকে গান শেখাব একথা সত্যি ভাবতে পারলি তুই?"

জলভরা চোখেই ও তাকা'ল অসিতের দিকে, অশ্রু দমন ক'রে বলল: "সে কি?" মুখের মেঘ কেটে গেল।

একটু বাদে বলল: "চলো ফিরি অসিদা।"

ওরা ফেরে। মিনিট খানেক যেতে না যেতে ও বলল: "দাঁড়াও অসিদা।"

"কী রে? ফের আবার কী হ'ল? এ কী! ফের চোখে জল?"

ও আঁচলে চোখ মুছে নিজেকে সামলে নিল এবার। বলল: "আর এমন হবে না অসিদা।"

"কেমন?—ও কী? ফের কান্না?"

দুহাতে মুখ লুকিয়ে ফের কাঁদে ও। অসিত ওকে বসায় ফের একটা বেঞ্চিতে। "কী হয়েছে রে?—কথা দিয়েও যদি আমি কথা না রাখি?"

ও মুখ তুলল: "আমি দুর্বল অসিদা, কিন্তু অত ছোট নই। ছি ছি। তুমি বুঝতে পারলে না কেন আমাকে আজ এত বেজেছে?"

"কেন রে?"

"আমি এত স্বার্থপর ভেবে।"

"সে কী?"

"ছি ছি অসিদা। লজ্জা করছে আমার মুখ দেখাতে। রমলাকে তোমার নিশ্চয় শেখাতে হবে। আহা বেচারি কত সাধ ক'রে শিখতে চেয়েছে। তোমাকে কাছে পেয়েও শিখতে পাবে না? একি কখনো হয়?"

অসিত মুগ্ধ হ'ল। আদর করে বলল: "এই তো আমার নেতারার মতন কথা।"

গেটে ঢোকবার সময় হঠাৎ ও অসিতের পাঞ্জাবির হাতা টেনে ধরল। অসিত দাঁড়াল।

"কী রে?"

ও একটু চুপ ক'রে রইল।

"নয়নতারারও চোখ তুলে তাকাতে এত লজ্জা?"

"তুমি আমায় ভারি খুকুমণি ভাবো। যাও।"

"ভাবব না? যার সব কিছু বলতেই এত কুণ্ঠা?"

ও সোজা তাকালো বলল: কুণ্ঠা কেন বোঝো না কি?"

"আমি কি তোর মতন অন্তর্যামী যে বুঝব?"

ও চুপ ক'রে রইল।

অসিত আদরের সুরে বলল: "বল্ না—কী জন্যে গেটে এসে দাঁড়িয়ে পড়লি।"

ও একটু চুপ ক'রে থেকে বলল: একথা বোলো না তুমি কাউকে।"

"বলব কেন রে।"

"কাউকে না। এমন কি মাসিমাকেও না। কথা দাও বলবে না?"

অসিত হেসে বলে: "আচ্ছা রে আচ্ছা। কিন্তু বললে কি তারা তোকে ভুল ভাবত ভাবছিস?"

ছায়া ওর দিকে তাকিয়ে বলল: "ভুল ঠিকের কথা নয় অসিদা, তবে—"

"কী?"

"আমি বোঝাতে পারি না।"

"তবু?"

"ঠিক যে কোথায় লাগে সেটা কি সবাই বোঝে অসিদা?"

"ভালোবাসলেও না?"

ছায়া মাথা নাড়ল, বলল: "তাইতো বলছিলাম অসিদা বোঝাতে পারব না।"

"কী?"

"ভালোবাসা বলতে আপনার জনরা যা বোঝে··· ঐ দেখ কথাই জোগায় না. আমি কি পারি গুছিয়ে বলতে? কি জানি আমার মনে হয় যাকে আমরা ভালোবাসা বলি···সে দেখতে পায় না সব সময়ে··· মানে দেখলে ঝাপসা দেখে। তাই তো ভুল বোঝে।"

অসিত ওকে আদর ক'রে বলে: "তবে যে নয়নতারা মিড় দিয়ে বলেন তিনি বো—ঝাতে পারেন না?"

"মানে সবাইকে পারি না। সবাই কি তুমি?"

এরকম ছোট ছোট কথায়ই ও প্রকাশ করত যা কম লোকেই পারে গুছিয়ে বলতে। তবু ও ভাবত কেন ওর সব কথাই যেন না-বলা থেকে যাচ্ছে? সুদূর কাশ্মীরে ব'সে আজ তাই তো অসিতের মনে এত ব্যথা জাগে যে অভিমানের ঝেঁাকে ও কত সময়েই না ছায়ার পরে অবিচার করেছে! অথচ তবু এটা ঠিক যে ছায়া জানত অবিচার করলেও অসিত ওর ব্যথার জায়গাটা বোঝে···আর যা দিয়ে বোঝে সেটা ভালোবাসা বলতে ঠিক যা বোঝায় তা নয় সেটা যে কী ও অনুভব করলেও বুঝিয়ে বলতে পারত না, কিন্তু অনুভব যে করত সেটা ওর নানা কথায় আচমকা ফাঁশ হ'য়ে পড়ত। একদিনের কথা ওর এত স্পষ্ট মনে পড়ে!

সেদিন সকালে হঠাৎ ওদের গান শেখানোর আসরে অসিতের কাছে এসে হাজির ওর এক আত্মীয় তথা ভক্ত। ছায়ার গান শুনে খুব তারিফ করল।

ছায়া খুসি হ'ল। কারণ সে-লোকটি সত্যিই গান বুঝত। কিন্তু একটু বাদে সে এসে আদর ক'রে ওর একটা হাত ধরেছে। ও কেমন যেন কুঁকড়ে গেল। তাড়াতাড়ি অসিতকে "আসছি" ব'লেই চলে গেল পাশের ঘরে।

সেদিন রাতে খুব বৃষ্টি। ওরা ধরল অসিতকে থাকতে। মস্ত খাটে ওর বিছানা ক'রে দিল ছায়া নিজে হাতে। অসিত ক্লান্ত ছিল সেদিন কারণ একটা গানের আসর ছিল সন্ধ্যাবেলা এক মস্ত সভায়। ছায়া ওর জন্যে বরফ দিয়ে এক গ্লাস জিঞ্জারেড নিয়ে এল।

"বড় ক্লান্ত লাগছে ভাই?"

"কেন রে?"

"এম্‌নি। ক্লান্ত হ'লে তুমি ঠাণ্ডা জিঞ্জারেড ভালোবাসো ভাই নিয়ে এলাম।"

অসিত খুসি হ'য়ে সবটুকু এক চুমুকেই নিঃশেষ ক'রে ফেলল। বলল : "আয়—বোস।"

ও বসল খাটে ওর মাথার কাছে। মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগল। ওঘরে তখন দেবদা খাচ্ছে প্রতিমা হাওয়া করছে আর প্রীতি পান খেতে খেতে গল্প করছে—ছায়াই বলল।

হঠাৎ অসিতের মনে হ'ল ওর মুখ যেন একটু ম্লান। মনে পড়ল সকালবেলা ওর "আসছি" ব'লে সেই চ'লে যাওয়ার কথা যতক্ষণ ওর আত্মীয়টি ছিল ও ফেরে নি। বলল হেসে : "কী হ'ল গো নয়নতারার? এখনো ভুলতে পারছেন না?"

বলতেই ওর বুকের 'পরে মাথা রেখে মেয়ের সেই ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কান্না। কান্নার মধ্যে কোনোমতে বলল : "তোমার আত্মীয় মানেই তুমি নয় অসিদা যে আমার হাতে হাত দেবে।"

ঠিক এই সময়ে দেবদা "কী অসিত," ব'লে ঢুকেই থমকে শুধায় : "এবার আবার কিসের পালা? ফের অভিমান?"

অসিত হেসে বলল : "আজকের মূর্তি একটু অভাবনীয়। অভিমান নয়—রাগ।"

দেবদা আশ্চর্য হ'য়ে বলল : "রাগ! সে কী?"

ছায়া ক্ষুব্ধ স্বরে বলল : "দেখলে না বাপী অসিদার সেই আত্মীয়টি আমার গায়ে হাত দিল!"

দেবদা স্বভাব উদার মানুষ, বলল : "তাতে হয়েছে কী রে? তুই ছেলেমানুষ—ভালোবাসে তোকে—"

"তুমি কী বলছ বাপী? ভালো কি অমনি বাসলেই হ'ল? না, সবাই অসিদা?"

সেদিন আনন্দ হয়েছিল ওর। কিন্তু আজ বিষণ্ণ কুণ্ঠা আসে ছেয়ে। ছায়া অসিতকে এত উঁচুতে স্থান দিত কেমন ক'রে? ও তো সে সময়ে

হ'ল প্রথম দিককার কথা—অসিতকে জানত না বেশি। না জানত ওর অতীত জীবনের কিছুই, না ওর নৈতিক ধারণা, না ওর ধরণ ধারণ। প্রতিভারই বা কতটুকু জানত—বিশেষ সে সময়ে? তখন তো ওর সবে হাতে খড়ি। তবু এই যে বিশ্বাস ওকে করেছিল ওর শুভ্র কুমারী হৃদয়ের পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে এ অর্ঘ ও গ্রহণ করল কোন্ মুখে? কেন ও বলে নি ছায়াকে যে এ-অর্ঘ তার প্রাপ্য নয়? কতবারই তো মনে হয়েছে বলা উচিত, কিন্তু তবু তো বলে নি! অবশ্য বললে যে ফল হ'ত তা নয়—কিন্তু অসিতের যে ছবি ছায়া তার সরল ভক্তির তুলি দিয়ে চিত্তপটে এঁকেছিল সে-ছবির সঙ্গে যে আসল অসিতের মিল নেই একথা কেন অসিত সাধ্যমত প্রতিবাদ করে বোঝাতে চেষ্টা করে নি?

শুধু করে নি নয়, ও যেন নিজের মনকে বুঝিয়েছিল যে অসিতকে ও প্রতিভাশালী গুণী ও কবি ভেবে নির্মাল্য দিচ্ছে। ব্যাপারটা যদি সত্যিই এর বেশি না হ'ত তাহলে আজ অসিতের চিত্তগ্লানি হ'ত না, কারণ এবিষয়ে ওর নিজেরও সংশয় ছিল না। ও জানত যে ওর বন্ধুদের সবার মিলিত চেষ্টার চেয়েও ওর নানামুখী প্রতিভা ও অধ্যবসায় বড়, কাজেই আজ যে যতই হাসুক, ওর প্রতিভার দীপ্তি ক্রমশ সবাইকেই স্বীকার করতে হবে। এ অভিমানের জন্যেও ওর কষ্ট হ'ত। কিন্তু খুব বেশি নয়। কারণ ও গুরুদেবের চরণে আশ্রয় নিয়েছিল তো অভিমানকে জয় করতেই। ও যদি রাজস আত্মাভিমানী প্রকৃতির মানুষ না হ'য়ে নিরভিমান সাত্ত্বিক প্রকৃতির মানুষ হ'ত তাহলে কি সাধনায় ওকে বেগ পেতে হত এত বেশি? না ওর চরিত্রের বহু ত্রুটি ওর নিত্যই চোখে পড়ত আশ্রমে—বহু দুঃখই পেয়েছে নিজের নানান্ অশুদ্ধি দেখে। নিজের প্রতিভার জন্যে অহঙ্কার তো এ বহু অশুদ্ধির মাত্র একটি। নিজের

বিজ্ঞাপন নিজে দেওয়া আর একটি। অসহিষ্ণুতা আর একটি। এরকম বহু দোষই ওর আছে। তাই তো ও সাধনার আশ্রয় নিয়েছিল—নিজের চরিত্রের হাজারো অশুদ্ধির জন্যে তীব্র বেদনা বোধ করত বলেই না পেয়েছিল নির্মল হবার তাগিদ। এ-বেদনার কাছে প্রতিভার অভিমানের দরুণ যে-বেদনা সে তো সামান্য। তাই ওকে ছায়া গুণী ও কবি ব'লে যখন পাদ্যঅর্ঘ দিত তখন ওর তত চিত্তগ্লানি হ'ত না। কিন্তু যখন ওকে সে মনে করত তা-ই যা ও সাধনা ক'রে হ'তে চেয়েছিল অথচ হ'তে পারে নি তখন কি ওর বলা উচিত ছিল না ওকে : "আমাকে এত বড় কোরো না এতে আমার ক্ষতি হয়, কারণ তুমি আমাকে যে-শ্রদ্ধার অঞ্জলি দাও আমি তার অযোগ্য।" নিশ্চয় উচিত ছিল। কিন্তু পারে নি ও একথা বলতে।

আজ গুরুদেবের কথা মনে হয়। এই জন্যেই তিনি এত ক'রে বলেন আগে তপস্যা ক'রে আলো পাও তবে আলো দিতে যেও—নিজে যে বদ্ধ সে অপরকে মুক্ত করবে কী ক'রে? কিন্তু এই যে ছায়া বলত অসিদা যা করে তা সবারই সাজে না একে ভক্তির অত্যুক্তি ছাড়া কী নাম দেবে? অথচ তবু এ অত্যুক্তির কেন তেমন প্রতিবাদ করে নি?

কিন্তু বিচিত্র মানুষের মন! এ-চিত্তগ্লানি সত্ত্বেও তবু ওর আজ আনন্দ হয়, গর্ব হয়—ভাবতে চোখের পাতা আজও ভিজে আসে : যে ওকে ছায়া যে জন্ম-অভিজাত ব'লে চিনেছিল সে তো শুধু এই জন্যেই যে আভিজাত্য ছিল তার মজ্জাগত? তবে? না-ই হ'ল সে যা ছায়া তাকে ভেবেছিল। এ-শ্রদ্ধা নেওয়া অসিতের পক্ষে অগৌরবজনক হ'তে পারে কিন্তু এতবড় শ্রদ্ধা যে করতে পারে তার গৌরবই সূচিত হয়। ছায়ার কাছে ও কৃতজ্ঞ বোধ করে। ছায়ার শ্রদ্ধা পেয়ে ওর গ্লানি হয়েছে একথা সত্য, কিন্তু শুধু এইটুকু বললেই কি সবটুকু বলা হবে? মনে পড়ে সেই চোরের গল্প। পুলিশ তাকে তাড়া করেছিল। সে ছাই মেখে কৌপীন

।'রে সাধু সেজে বসল গাছ তলায় চোখ বুজে। দেখে পুলিশ তো পুলিশ ।জা এসে তাকে গড় করলেন। চোরের চৈতন্য হ'ল যার ভেক দেখে ।জাও নতি করে তা হলে না জানি কী হয়। সে সাধু ব'নে গেল। ।রা কেবল দীনতা ও নম্রতার কথা বলে তারা সত্যের মাত্র একটা দিক দখে। শ্রদ্ধার একটা বড় কাজ যে শ্রদ্ধেয়কে গ'ড়ে তোলা—অনাবিল ।দ্ধা যে নিত্যই আমাদের মধ্যেকার সুপ্ত দেবত্ব জাগিয়ে তোলে এও তা একটা গভীর সত্য আর এখানে ছায়ার মতন শ্রদ্ধা ওকে কজন রেছে?

বুকের মধ্যেরও অশ্রুসাগর উঠে দুলে। বিশেষ ক'রে ওর "ভালো কি অমনি বাসলেই হল" কথাটি মনে ক'রে। ওর মনে পড়ে ছায়া একটা সেকেলে টপ্পা খুব ভালো বাসত—মাঝে মাঝে তার আস্থায়ীটা গাইত গুন গুন ক'রে :

"প্রেম করা কি মুখের কথা? পদে পদে সইতে হয়।"

কেন ওর এত ভালো লাগত এ গানটা? এ গানের মর্ম ও কী বুঝবে —নিজের মনই যে চিনত না। মনে পড়ে একদিন হঠাৎ বলেছিল : 'তোমার গান শুনে ভাই আমার বেশি আনন্দ হয় না কষ্ট ঠাউরে পাই না।"

"কষ্ট? কেন ছায়া?"

"কী জানি? আমি বো—ঝাতে পারি না। তবে হ—য়।"

কি রকম একটা আশ্চর্য মিড় দিয়ে টেনে বলত ও অনেক কথা—যখন জোর দিতে চাইত। যেমন হ—য়। একদিকে যেমন ভয়কাতুরে মুখ-'চোরা—বাইরের লোকের সামনে অপর দিকে কি তেমনি তেজস্বিনী বেপরোয়া!

হাসিও পায় দুঃখ হয় ছায়ার এরকম দু' একটা আত্মবিরোধের কথা ভেবে। ও আঠারো বছর বয়সেও ম্যাট্রিক পড়ার জন্যে ভারি লজ্জিত

বোধ করত। হয়ত সেই জন্যেই পড়াশুনোয় কোনো মেয়ে খুব ভালো শুনেই ও হায় হায় ক'রে উঠত। অসিতের এক মামিমা এম, এ, তে প্রথম হয়েছিলেন। তাঁর কথা বলতে ছায়ার চোখে শুধু জল আসতে বাকি। কাঁদ কাঁদ সুরে বলবে: "বড় দুঃখু হয় অসিদা যে চিরটাকাল মুখ্যুই থাকব।"

"কেন থাকবে? পড়লেই বিদুষী হবে।"

"পড়লে তবে তো হব। কিন্তু পড়তে যে ছাই ভালোই লাগে না।"

অসিত একথায় একটু দুঃখ পেত বৈ কি কিন্তু মুগ্ধও হ'ত এ সরল স্বীকারোক্তিতে। বলত হেসে: "তবে আবার দুঃখ কেন?"

"কী জানি? তবে হ—য়।"

ওর এক ফ্যাশনেবল্ বান্ধবী শুনে বলেছিলেন "ওর মাথায় কিছু নেই অসিদা।"

শুনে অসিতের ভারি কষ্ট হ'ত। একেবারে সোজাসুজি সেন্টিমেন্টাল কষ্ট। কী? এত বড় কথা! ও তাই বি-এ এম-এ পাশের প্রসঙ্গ উঠলে আরো রুখে উঠে বলত ওর আদরিণীকে: "কী হবে নয়নতারা তোমার প'ড়ে শুনে? শাস্ত্রে বলেছে অন্নদান বড়, তার চেয়েও বড় বিদ্যাদান তার চেয়েও বড় আনন্দ দান। তা'হলে বোঝো তুমি ফাশ্‌ট্ ক্লাশ ফাশ্‌ট্—দেবদার ভাষায় A I।

প্রতিমা থেকে থেকে ভারি রাগ করত অসিতের কথায়, বলত: "তোমরা ভাই এইরকম আদর দিয়েই খেলে ওর মাথাটি। ও কী এমন পীর শুনি যে ওকে A I বলা হচ্ছে সবাই মিলে? গায় তো মিউ মিউ ক'রে—তোমার আত্মীয়েরা রাগেন কি সাধে? আমিই রেগে উঠি। গলাটা একটু মিষ্টি এই তো মেয়ের মুরদ। তাই নিয়ে তুমি অজয়বাবু সবাই এমন করো যে মনে হয় ওর গানে ভূমিকম্প হ'ল বা! ঐ জন্যেই তো মেয়ের পড়াশুনো উঠল মাথায়। ওর প্রাইভেট টিউটর রোজ রাগ

করেন এসে। বলেন: "যার মনই নেই পড়া শুনোয়—তার হবে কোত্থেকে?"

অসিতও রুখে উঠত: "তা না হোক গে। আমাদের নয়নতারা নাকে চশমা এঁটে কুড়িতেই বুড়ি থুড়থুড়ি হ'য়ে কোনো মেয়ে স্কুলের মাষ্টারণী হ'তে চায় না। বিদ্যেদিগ্‌গজের নাম না কিনলেও বুলবুলের জন্ম বৃথা ব'লে আমি মনে করি না।"

দেবদা বলত খুসি হ'য়ে: "আচ্ছা অসিত, সত্যি তুমি মনে করো তোমার বুলবুল গানে একটা কিছু হবে?" (একথাটা দেবদার ত্বদিন অন্তর একবার ক'রে জিজ্ঞাসা করা চাই-ই চাই)।

"সন্দেহ হয় তোমার কেন শুনি?"

"কী জানি," বলত দেবদা।

"তবে হ—য়" পাদপূরণ করত অসিত।

এসব সময়ে হাসত সব চেয়ে প্রীতিই বেশি, বলত: "দাদার কথা কানে তোলো কেন ভাই? ও যেন জানে না ভাজা মাছটি উল্টে খেতে। মেয়ে যখন গায় ওর মুখখানি কি কেউ দেখতে পায় না না কি?"

"কী পায় শুনিই না সোনা!"

"কী আবার? হায় হায়, কী-মেয়েই-গর্ভে-ধরেছি-ভাব।"

প্রতিমা লজ্জা পেয়ে বলে: "যাঃ ছোটদের সামনে—কী যে তুই! দুম্‌দাম্ ক'রে যা মুখে আসে ব'লে দিলেই বুঝি হ'ল!" ব'লে প্রসঙ্গান্তরের চারণা করতে অসিতকে বলে: "কিন্তু কই বললে না তো তোমার নয়নতারার গান কী রকম দাঁড়াবে ভবিষ্যতে?"

অসিত হেসে বলল: "তোমাদের হয়েছে ভাই এ এক মন্দ শ্রুতিবিলাস নয়। দেবদা থেকে থেকে যে-ধুয়োয় ফিরে আসবেন—মেয়ে আমার কেমন গায় শুধিয়ে, তোমরা সাধবে তবে অন্তরা সঞ্চারী আভোগ—তালফের ক'রে। বলেছি তোমাদের হাজার বার যে এরকম প্রতিভা

গীতলক্ষ্মীদের মধ্যে আমি আর একটিও দেখি নি এ চল্লিশ বছর বয়সে, তবু তোমরা অবিশ্বাস করবে। অবিশ্যি কেন করো বুঝি: একই মুখ আয়নায় লক্ষবার দেখতে কে না ভালোবাসে? আর মেয়ের চেয়ে আত্মানন্দের সেরা আয়না কোথায় বলো?"

দেবদা আর যাই হোক কিল খেয়ে কিল চুরি করার পাত্র নয়, বলে: "তা আয়না-বিলাসে তুমিও যে নেহাৎ ফেলনা তা মনে কোরো না ভাই। আরো একটা সাধুবচন মনে পড়ল: আপ্তবাক্যের 'Those who live in glass houses had better not throw stones at others' তবে তোমার সাধা গলা তাই তার সামনে দাঁড়িয়ে কে বলবে বলো যে আদরিণীর বুলবুলিয়ানাকে ঠিক গান বলে না?"

অসিত হেসে বলল: আমাকে এত ভয়টা কিসের শুনি? আমি কি দুর্বাসা, না নবাব কোতোল খাঁ?"

প্রীতি বলল: "তাহ'লে তো বাঁচতাম ভাই! কিন্তু তুমি তো হাতে মারো না, মারো ভাতে। বোকা হ'লে কী হয়—শেয়ানা তো।"

অসিত বলল: "সাবধান! লাইবেল যদি করো প্রমাণ করতে হবে—নৈলে ফিরিয়ে নাও।"

প্রীতি বলল: "প্রমাণ তো ভাই প'ড়েই রয়েছে না জানে কোন্ ভুক্তভোগী বলো? জানেন তাঁরা বেশ ভালো ক'রেই যে তোমার বুলবুলের গানের নিন্দে করলে তুমি আর তাদের বাড়িমুখো হবে না। এ-কলঙ্ক তোমার ছেয়ে গেছে কলকাতায়। কিন্তু তুমি রোখের ময়ূর, কলঙ্কের মেঘগর্জনে পেখম মেলো—আর লোকে মুখে যা-ই বলুক না কেন, স্ক্যাণ্ডাল যারা করে তাদের একটু ভালো না বেসেও তো পারে না। তারা ছায়ার গানে বাহবা দেয়।

অসিত অসহিষ্ণু সুরে বলে: "তাই বই কি। তাহ'লে ওকে গৌহাটিতে অভিনন্দন—"

ছায়া সটাং ওর মুখ চেপে ধ'রে: "লক্ষীটি, তুমি একটু থামবে অসিদা? এসব ঘটাপটার না কি আবার কোনো মানে থাকে? তুমি শিখবে কবে বলো তো যে তিলকে যারা তাল করে তাদেরই নাম ভদ্র?"

ফের চমকে ওঠে অসিত। প্রবচনটা মনে পড়ে যায় শিশুর মুখে দৈববাণীর কিন্তু তবু ও বিরক্তি চাপতে পারে না। কেমন ক'রে ওদের বোঝাবে যে ছায়ার নাম সম্বন্ধে ও যা বলছে তা একেবারে অকাট্য সত্য? প্রকাশ করার যুক্তি খুঁজে পায় না তাই ঝাঁঝটা আরও প্রকট হয়ে ওঠে যখন বলে: "না এ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে শ্রীমতী ছায়া দেবী ছাড়া কেউ সত্য কথা বলে না—তাছাড়া আমরা গানের কী-ই বুঝি বলো, ওস্তাদ তো নই—"

নয়নতারার আলোভরা নয়ন বাদলে যায় ছেয়ে: "আমি কি তাই বলেছি অসিদা?" বলেই ও উঠে চ'লে যায় পাশের ঘরে।

তার পরে সেই old old story: প্রথমে প্রীতি, তারপর প্রতিমা, শেষে দেবদা এসে নিয়ে যায় ওকে রোরুদ্যমানার কাছে। একটার জায়গায় সেদিন ছুটো নতুন গান শেখাতে হ'ত নইলে ছায়া জলগ্রহণ করবে? ঈ—শ্!

অথচ কতই মাধুর্য ছিল মিশিয়ে এই সব নাট্যলীলার সঙ্গে!—ভুল বোঝাবুঝির মধ্যে দিয়েও কত ভাবেই না ও পেত আত্মপরিচয় যেন নতুন ক'রে! সবই সত্যি। তবু আজ অসিতের দুঃখ হয় একটি কথা ভেবে। সেটাও সেই old old story—যাকে মন দিই তাকে চাওয়া মনের মতন ক'রে। এইটেই ছিল ওর গলদ। সত্য কথা ওর স্বার্থ ছিল না—চাইত ও ছায়ারই মঙ্গলই বটে, কিন্তু তবু এ-ও তো সেই একই জোর করার কোঠায়ই পড়ে। সেই দুঃখ পেয়ে দুঃখ-দেওয়া ওকে যাতে ও

বেঁকে। মনে আছে অসিত যেত কলকাতায় চক্রধর ব'লে ওর এক ভাগনের বাড়ি প্রায়ই সেখানে বালগোপালের একটি অপূর্ব শ্বেতপাথরের মূর্তি ছিল ব'লে। ও কত প্রশংসা করেছে মূর্তিটির ছায়ার সাম্নে। কিন্তু যে-ছায়া ওর সব উৎসাহেই রঙিয়ে উঠত সে প্রতিমার কথা হ'লে একেবারে চুপ। না রাম না গঙ্গা। অসিত বুঝত ওর বাধে এখানে খুব প্রবলভাবে—বিশেষ করে শালগ্রামে আর বিগ্রহে। গির্জায় মসজিদে যেতেও ওর এত বাধত না—কিন্তু মাটির প্রতিমাকে প্রণাম করতে ও প্রাণ গেলেও পারবে না কোনোদিন, এধরণের কথা ওর মুখে না হোক ভাবভঙ্গিতে প্রকাশ হ'তই হ'ত। এতে অসিত দুঃখ পেত—কিন্তু কেন পেত? কেন কেন কেন চাইত ওর প্রতিমায় ভক্তি হোক? ওর ভালোর জন্যে? কিন্তু ফের সেই old old story: গুরুদেব কি অসংখ্যবার বলেন নি যে জ্ঞানসিদ্ধি না হ'লে এভাবে পরের ভালো করতে ছোটা ভালো নয়? তবু ও কেন ছায়ার সাম্নে প্রশংসা করত মন্দিরের তীর্থের সাধুসন্তদের? ও চেষ্টা করত এসব প্রসঙ্গ না তুলতে, কিন্তু বাল্যাবধি ও ঘোর পৌত্তলিক—বিশেষ ক'রে সুন্দর প্রতিমার। ছেলেবেলায় নিশুদার সঙ্গে কত যেত দক্ষিণেশ্বরে বেলুড়ে আরো কত কী মন্দিরে মঠে। ভগবান কৃষ্ণের মূর্তি ধ'রে দর্শন দেবেন ওকে এই-ই ছিল ওর সাধনার অন্তিম লক্ষ্য। নিরাকার ব্রহ্মনির্বাণ শুনতে না শুনতে ওর মন তুলত শিরপা। বাসনা থেকে মুক্তি আর রূপের মন্দিরে অরূপের সঙ্গে মিলন—এই-ই ছিল ওর স্বপ্ন আশৈশব। তাই পারত না এ-স্বপ্নের কথা না ব'লে থাকতে—চেষ্টা করত, কিন্তু মুখ ফসকে বেরিয়ে যেত। আর যখন বলত তখন বেশ গুছিয়েই বলত। কিন্তু ফল হ'ত না ছায়ার উপর একটুও। মনে মনে ও ঘা খেত। প্রতিজ্ঞা করত আর কখনো বলবে না ওর নিভৃত হৃদয়ের আরাধনার কথা। কেন ও রাখে বেদরদীর কাছে দরদের প্রত্যাশা?

বুঝত ও পরে যে এও অভিমান। নিজেরই পরে তখন হ'ত রাগ।

সে-রাগ বারবারই দমন করত জোর ক'রে। কিন্তু যা চেপে রাখত ক্ষোভবশে সে শোধ তুলত বাঁকা পথে: থেকে থেকে ছায়ার সংসর্গ কাটিয়ে দূরে দূরে থাকতে চাইত। জানত যে এতটুকু ব্যবধান আড়ালও টের পায়—কিন্তু তাইতো আনতো আড়াল টেনে, না-বলা ক্ষোভের আড়াল, নিখুঁৎ ভদ্রতার ব্যবধান। ছি ছি এভাবে ভোলাত ও কাকে—বিশেষ যখন এতে ক'রে বাজত তাকেই ওর কাছথেকে আঘাত পেলে যার ছিল না কোনো আপীলেরই দরবার? একদিনের কথা আজ ওর বিশেষ ক'রেই মনে পড়ে এ-প্রসঙ্গে।

সেদিন ঝুলন। চক্রধর খুব উৎসব করেছিল। অনেক লোকজনকে বলা হয়েছিল অসিতের গান হবে বিগ্রহের সামনে। চক্রধর ছায়াকেও বলেছিল—কিন্তু অসিত বলে নি যদিও জানত যে তার গান হবে শুনলে ছায়া শুনতে যাবেই। কিন্তু না—কেন বলবে যখন ও বিগ্রহ মানে না? তাতে ঠাকুরের অমর্যাদা হয় না?

ছায়া ওকে জিজ্ঞাসা করল গান কটার সময়ে হবে। ও বলল সন্ধ্যা ।টটা। কিন্তু একটিবার বলল না: "যাবে তো নয়নতারা?—না, ও যেতে চায় আসুক—আমি বলব না, কিছুতে না।"

ছায়া কেঁদেছিল ওর না-বলার জন্যে—চোখ দেখেই বুঝতে পেরেছিল অসিত বিকেল বেলা। কিন্তু তবু বলে নি। ঠিক সাড়ে সাতটার সময় ছায়া একটি নতুন বেনারসী প'রে এসেছিল ওর কাছে—অসিত একবার "চলো" বললেই যেত। ছায়ার মোটর ঘন ঘন হর্ণ দিচ্ছিল। কিন্তু অসিত বলল হঠাৎ: "কী ছায়া? হঠাৎ সেজেগুজে যে?"

ছায়ার মুখ অন্ধকার হ'য়ে গেল। বলল: "এম্‌নি।" ঘরে আর কেউ ছিল না। ছায়া চ'লে গেল একটু বাদে। ফিরে যখন এল তখন পরনে ওর আটপৌরে সাদা কাপড়। তখন অসিতের মনে হ'ল একটু

বাড়াবাড়ি হ'য়ে গেছে। বলল: "কী? হঠাৎ আবার এ-বেশ যাবে না?"

কিন্তু তখন আর হয় না। ছায়া মুখ নিচু ক'রে বলল: "না। ইচ্ছে করছে না।"

অসিতের গানে ছায়া যাবে না—ইচ্ছে করছে না এ অভাবনীয়। অসিত জানত কথাটা সত্য নয়। কিন্তু অভিমান ওর ফুলে উঠল, ও মুখের সত্যকেই সত্য ব'লে মেনে নিয়ে "তাহ'লে চলি" বলেই চ'লে গেল।

গেটে ছায়ার মোটর দাঁড়িয়ে ওর জন্যে। সারথি এসে দোর খুলেই বলল: "দিদিমণি?" অসিতের গান কোথাও হচ্ছে অথচ দিদিমণি সেখানে সহযাত্রিণী নন এ তার কাছে ছিল অভাবনীয়। অসিত বলল: "দিদিমণি আসবেন না—আর তুমি গাড়ি রাখো—আমি যাব খুব কাছেই।"

ব'লে হেঁটেই চ'লে গেল। ঠিক যখন রাস্তার ওপারে গেছে চোখ তুলতেই ছায়ার সঙ্গে চোখোচোখি সে বারান্দায় দাঁড়িয়ে ছিল। ছায়া হাত নেড়ে ওকে ডাকল, চেঁচিয়ে বলল: "মোটর!"

অসিত "দরকার নেই—কাছেই" বলেই হন্ হন্ ক'রে চ'লে গেল।

সেদিন বালগোপালের সামনে ও গেয়েছিল, ওর একটি প্রিয় গান···কতক্ষণ ধরে যে—কত আঁখর দিয়ে:

একেলার পথে বাজায়ো তোমার বাঁশি।
তাহ'লে মনের বনে জানি নাথ, ফুটিবে ফুলের হাসি।
সবে চায় সুখ সাথী
ঘনায় নিরালা রাতি
মিলনের মেলা ভাঙে অবেলায় আশা ঝরে উচ্ছ্বাসি'।

শুধু একেলার পথে বাজে বন বাঁশি
বিনা তব চিরসুধা
মিটে কি প্রাণের ক্ষুধা !
আজ শুধু করো চিরবৈরাগী, অমৃতের অভিলাষী
ব্যথা দিও—শুধু বাজায়ো তোমার বাঁশি।

* * * *

পরদিন ভোরে উঠেই অসিত রওনা হ'ল দক্ষিণেশ্বর। অনেকদিন বাদে ও সকালটা কাটাল ছায়াকে ছেড়ে।

দক্ষিণেশ্বরে পৌঁছে গঙ্গাস্নান ক'রে সামান্য একটু জলটল খেয়ে ব'সে রইল সারা দুপুর পরমহংসদেবের ঘরে : জগতে ওর সবচেয়ে প্রিয় তীর্থ। কত দিনই যে কেটেছে ওর বাল্যে ও কৈশোরে এই ঘরে। কত আনন্দ কত অশ্রু কত ব্যাকুলতা। আজ ওর যত মনে হয় সেকথা চোখে জল উপচে পড়ে।

কেন কেন কেন ও ফিরে আসছে এ বাঁধনে ধরা দিতে? কেন! ও কি জানে না যে ভগবানের পথ এ নয়—এ পথে যতই কেন না মাধুর্য উচ্ছলিত হ'য়ে পড়ুক শতধারে?

পরমহংসদেবের ছবির সামনে হাতজোড় ক'রে ওর পুরোনো প্রার্থনা জানালো অহৈতুকী ভক্তির জন্যে। মনে গভীর শান্তি গেল বিছিয়ে।

কিন্তু কী আশ্চর্য! তবু ওর মনটা কেন ব্যথিয়ে ওঠে একটি ম্লান মুখ মনে প'ড়ে? কেন ও ছায়াকে ডাকল না যখন ও সাধ ক'রে এসেছিল সেজেগুজে? এই যে আত্মাভিমান এ কিসের নিদর্শন? যার মনে এধরণের অভিমানের আচরণ আজো ঘন হ'য়ে সে কেমন ক'রে পাবে ভগবানের করুণাকিরণ? ওর মনে পড়ে গুরুদেবের একটি কথা যে ভগবানের করুণা যে আমাদের চারদিকেই উদ্বেল হ'য়ে রয়েছে নিরন্তর নিজেকে একটু খুলে

ধরতে শিখলেই দেখতে পাওয়া যায়। এই খুলে ধরার নামই আত্মসমর্পণ। তিনি বার বারই বলতেন সাধনার পথে দু'চারটে ভাবাবেশ উদ্দীপন হ'লেই আহ্লাদে আটখানা হওয়া কিছু নয়—কেন না এসবের মূল্য থাকলেও সাধনার আসল লক্ষ্য তো দু'চারটে বিচ্ছিন্ন অনুভূতি উপলব্ধি নয়—চাই মানব প্রকৃতির আমূল রূপান্তর, আমাদের প্রকৃতির সমস্ত প্রবৃত্তি প্রভাবকে পরম শুদ্ধির মধ্যে প্রতিষ্ঠা করে দিব্য চেতনায় বিধৃত হওয়া। কিন্তু এ-রূপান্তরের একটি প্রধান সর্ত হ'ল আত্মাভিমানের মোড় ফিরিয়ে দেওয়া—শুধু সংযম নয় স্বভাবকে ঢেলে সাজানো। কিন্তু যে-মানুষ নিজের তুচ্ছ আত্মাদরকে এভাবে প্রশ্রয় দেয়—অপরকে বুঝতে না চেয়ে বিচার করতেই সব আগে ব্যগ্র হ'য়ে ওঠে ভগবানের কাছে কাকুতি মিনতি জানিয়ে সে কতটুকু পেতে পারে তাঁর করুণা? প্রার্থনা করতে করতে একথা যেন ও আরও স্পষ্ট দেখতে পায়।

কিন্তু তবু ঠেলে ঠেলে ওঠে সেই বিপর্যয় অভিমান: না ছায়ার সঙ্গে মিশবে না.. কেন আর সাধ ক'রে নতুন বাঁধন পরা···এই সব মামুলি যুক্তি। কিন্তু বৃথা। ক্রমশ চোখের জলের মধ্যে দিয়েই ওর কাছে স্পষ্ট হ'য়ে উঠল সত্যের নির্দেশ: হৃদয় বৃত্তিকে এভাবে কেটে ছেঁটে মুক্তি নৈব নৈবচ: আসল সমস্যার সমাধান পেতে হ'লে পলায়নী বৃত্তির অনুশীলনে হবে না—সত্যিকার বীরত্বের পরীক্ষা দিতে হবে—যাকে বলে bearding the lion in his own den মুখোমুখি হ'তে হবে নিজের স্বভাবের নিম্ন প্রবণতার সঙ্গে, আত্মপ্রণয়ী অভিমানের সঙ্গে আর জয় করতে হবে তাকে বড় তৃষ্ণা বড় অভিমান দিয়ে ও স্থির করল ছায়ার কাছে ক্ষমা চাইতেই হবে অকুণ্ঠে। এ ছাড়া নিজের আত্মাদরকে লাঞ্ছিত করার পথ নেই।

চমকে উঠল হঠাৎ। ও কার হর্ণ! ও বাইরে বেরিয়ে এল তাড়াতাড়ি বুকের পাঁজরে ওর কে যেন তখন মৃদঙ্গ বাজাচ্ছে।

কিন্তু এ কী? ছায়া একা? এতদূরে একা এল? দেবদা অবশ্য নেক সময়েই ওদের মন-কষাকষি হ'লে এম্নি ব্যবস্থাই করত—তা 'লে কলকাতা থেকে দক্ষিণেশ্বর একা এল ও? ওর মুখ দেখেই বুঝতে ারল ও সারাদিন কেঁদেছে। পড়ন্ত রোদের আলোয় ওর ম্লান খে এমন এক বিষাদশ্রী ফুটে উঠেছিল! ওর বুকের মধ্যে কেমন 'রে ওঠে।

তাড়াতাড়ি গিয়ে ছায়াকে নামিয়ে নিয়ে বসাল গিয়ে পঞ্চমুণ্ডির আসনে যখানে বসতেন স্বামীজি। সেখানে গিয়ে ওর পাশে ব'সে ওকে কাছে টনে নিতেই ও চোখে আঁচল দিল। তারপরে সেই ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে । একদিন ও বলেছিল অসিতকে একান্তে যে ও কেবল ওর কাছেই ারে না চোখের জল রাখতে—কত চেষ্টা করে তবু কী যে হয়! এ ছবি ভসে উঠতে মনটা ওর আজও সেই পরিচিত কোমলতায় ছেয়ে আসে। নে পড়ে একদিন প্রীতি ওকে বলেছিল যে সেবারও প্রথম কলকাতায় াসে সেবার আশ্রমে ফেরার পর "রাত দুপুরে—জানো অসিদা, তোমার য়নতারার সে কী চাপা কান্না বিছানায়। আমি ঘুমের ভান ক'রে পড়ে-ছিলাম, বলি নি ওকে আজও যে আমি টের পেয়েছিলাম।"

ওর আজ ঠিক মনে পড়ে না তবে বোধ হয় সবশুদ্ধ ও বড় জোর াঁচ ছবারের বেশি এ ভাবে কাঁদে নি ওর কাছে—মানে নিজেকে ছেড়ে িয়ে, অনেক সময়েই সামলে নিত চোখে জল এলে। কেবল এক এক সময়ে যেন পারত না কিছুতে। কী করবে বেচারি? ওরও মনের মেজাজ বহুরূপী—গড়পড়তা মেয়ের মন তো নয় যে একটা বাঁধাধরা নির্দেশ মেনে চলতে পারবে।

অসিত ওকে অনেক ক'রে শান্ত করে সেদিন।

গাড়িতে ফিরবার পথে ও ওকে খুব কাছে টেনে নিল। বলল: "ছায়া, একটা কথা যদি বলি রাগ করবে না বলো ?"

"তোমার ওপর রাগ করতে কি আমি চেষ্টা করলেও পারি অসিদা ?"

এই মেয়েকে কি না ও কাল অমন করে রুখে উঠে দুঃখ দিল! মনে ওর অনুতাপ আরো গাঢ় হ'য়ে ওঠে, বলে: "আমি আজ দক্ষিণেশ্বরে পরমহংসদেবের ঘরে প্রার্থনা করেছিলাম যে এবার আশ্রমে ফিরে যেন আর কলকাতায় আসা আমার না হয়।"

ও অনুভব করল ছায়া স্পষ্ট কেঁপে উঠল, কিন্তু মুখে বলল একটু হাসি টেনেই: "পারবে ?"

অসিতের দুষ্টুমি চাপল: "যদি পারি ?"

ওর মুখখানি ম্লান হ'য়ে গেল: "আমার ভুল হয়েছিল অসিদা। তুমি পারবে না কেন ? না পারাটাই তো আশ্চর্য। তুমি তো আমরা নও।"

কোন্ কথাটা যে কখন কোন্ দিকে বেঁক নেয় কেউ কি জানে ? অসিত অনেক চেষ্টা করল কিন্তু তবু একথায় কোথায় যে একটু ঘা খায়!...

ছায়া ত্রস্ত সুরে বলে: "ফের কি কিছু অন্যায় বললাম অসিদা ?"

অসিত একটু চুপ ক'রে থেকে বললে: "না ছায়া। আমাকে নির্মম মনে হওয়া তো তোমাদের পক্ষে অস্বাভাবিক নয় একটুও।"

"ছি ভাই, আমি তো বলতে চাই নি—ঐ দেখ, আমি কি সাধে বলি আমি কিছুই বোঝাতে পারি না ? আমি কী বলতে গেলাম—তুমি কি ভাবে নিলে ?"

"কি বলতে গেলে শুনি ? বললে আমি তোমাদের ছেড়ে যেতে সহজেই পারব—"

"সহজে বলেছি ?—কিন্তু না, এ কথা নিয়ে মানে বের ক'রে ফের

নেই। অথচ···কী বলব বলো? আমি যে কথা বলতে শিখি নি তোমার মতন—তাই তো তুমি ভুল না বুঝেও পারো না।"

"এখানে কোথায় ভুল বুঝলাম বুঝিয়ে দিলে আমি সত্যি খুসি হব। বিশ্বাস করো ছায়ারাণী, তোমার মনে কষ্ট দিলে সে কষ্ট দ্বিগুণ হ'য়ে আমার কাছেই ফিরে আসে।"

"এ কথা আমি বিশ্বাস করি ভাই," বলল ও, কিন্তু তারপরই চুপ।

"কী ব্যাপার?"

"আমি বলতে চেয়েছিলাম কী, শুনবে?"

"কী?"

"তুমি যে আমরা নও এই জন্যেই তোমাকে এত ভালো—মানে বড় মনে হয়। এ বাপীর কথা—কাজেই কাটা চলে না।"

"কিন্তু তোমার কথাটা কী শুনতে চাই।"

"আমি কী বলব ভাই?" ব'লেই ও চুপ করে, তারপর বলে: তবে একটা কথা আমার মনে হয় অসিদা, বলব? নাঃ। বলব না। কী জানি আবার কী বুঝবে তুমি?"

"তুমি যা বোঝাতে চাইবে বললে আমি অবিশ্বাস করব না ছায়া, ভয় নেই বলো।"

"দেখ," ব'লে ও ফের চুপ করল, পরে যেন হঠাৎ বলল: "আমার মনে হয় না তোমার পরমহংসদেবের ঘরে ও প্রার্থনা করার কোনো দরকার ছিল।"

"কোন্? যে আমি যেন কলকাতায় ফের আর না আসি?"

"হ্যাঁ।"

"দরকার ছিল না?"

"না। কারণ—ব'লে ফেলব?"

"না বললে ছাড়ব না কি আমি?"

"কারণ" · ব'লে ও তাকালো সোজা ওর মুখের দিকে, "কারণ…তুমি …কী ক'রে বোঝাব?…মানে মানুষকে একটু অন্যভাবে ভালোবাসো… মানে, ভালোবেসে দুঃখ পেতে পারো কিন্তু…কী বোলবো ছাই, ঠিক্ কি দরকারের সময়েই পাইনে আমি কথা খুঁজে!"

"তবু?" অসিতের এত অবাক লাগে! এধরণের ভাবনা যে ওর মনে উদয় হ'তে পারে স্বকর্ণে না শুনলে ও বিশ্বাসই করতে পারত না।

"মানে"…ছায়া ভাবে ফের, "সেদিন মেমসাহেব পড়াচ্ছিলেন গুটি-পোকার কথা। বলছিলেন তারা গুটিতে বাস করে কিন্তু যখন ছেড়ে যায় তখন গুটির দিকে ফিরেও চায় না। আমার মনে পড়ল অম্‌নি কার কথা জানো?—তোমার।"

অসিত বিস্ময় গোপন ক'রে হাসি টেনে বলে: "এর পরেও কি বলবে আমাকে তোমার নির্মম মনে হয় না?"

ছায়া বলল: "না ভাই…কী যে মনে হয় আমার গুছিয়ে বলতে গেলে যেন আরো আমার গুলিয়ে যায়…তবু আমার মনে হয় না—এর নাম নির্মমতা…বরং মনে হয়—যারা বড় হয় তারা বুঝি খানিকটা এই রকমই হয় অথচ…"

"অথচ?"

"কী জানি, আমার কথা জোগায় না…তবে আমি বলতে চাচ্ছিলাম যে …কেন জানি না · আমার মনে হয় না তুমি আমাদের কারুর ছাঁচে গড়া।"

অসিতের মনের মধ্যে জেগে ওঠে এমন এক হরিষে বিষাদ…কী ক'রে অনুভব করে মেয়েটা এত গভীরে…অথচ কেন…কার কাছে· যে মনটা ওর মাথা খুঁড়ছে…ও জানে না। ওর একটি হাত ও টেনে নিয়ে চুপ ক'রে ব'সে থাকে খানিকক্ষণ। তারপর বলে "ছায়া, আমি শ্রীরামকৃষ্ণ-দেবের ঘরে যে-প্রার্থনা করছিলাম তার সবটা বলি নি এতক্ষণ…বলতে কুণ্ঠা আসছিল…কিন্তু এখন বলতেই হ'ল।"

ও বিস্মিতনেত্রে তাকালো ওর দিকে কিন্তু সে-দৃষ্টিতে কৌতূহলের সঙ্গে যেন কী একটা ভয়ের ভাবও ছিল মিশিয়ে। অসিত বলল স্নিগ্ধস্বরে: "ভয় নেই ছায়া, কথাটা আর কিছুই নয় শুধু এই যে তোমাকে আমি অনেক সময়ে হয়ত একটু তাচ্ছিল্য করি—তুমি অবুঝ ব'লে। তাতে আমার অপরাধ হয়।"

ও ব্যাকুল কণ্ঠে ব'লে ওঠে: "সে কী কথা ভাই, ছি!"

'না ছায়া," বলে অসিত, "আমাকে বলতে দাও আজ। শোনো—আমি বুঝতে পেরেছি যে তোমাকে আমি···কী বলব?···ঐ দেখ, তোমার ছোঁয়াচ লেগেছে, দরকারের সময় ঠিক কথাটি যাচ্ছে ফ'স্কে।"

ও হাসে, বলে: "সেই ভালো ভাই, শোধবোধ।" ব'লেই বলে: "কিন্তু আমি জানি তোমার কী মনে হচ্ছে···যদিও সেটা ভুল।"

"কী ভুল?"

ছায়া একটু চুপ ক'রে রইল তার পরে বলল: "আমার মনে হয়েছে অনেকবারই যে .."

"কী?"

"তোমাকে আমি খুব দুঃখ দেই যদিও মুখে তুমি বলো না কিছু।"

অসিতের কৌতূহল জেগে ওঠে: "কী দুঃখ দাও বলো দেখি?"

ছায়া ওর মুখের দিকে তাকিয়ে বলল: "বলতে পারি···যদি ঠিক হ'লে তুমি স্বীকার করবে কথা দাও।"

"দিচ্ছি কথা।"

"আমার মনে হয়···আমিই তোমার কাছে অপরাধী অসিদা, অথচ কী যে করব ভেবে পাই না।"

"কী জন্যে?"

"তুমি যা ভালোবাসো সবচেয়ে বেশি তাকে আমি ভালোবাসতে পারি না ব'লে।"

অসিত চম্‌কে ওঠে, কিন্তু বলে : তাতে কী ?

"কিন্তু বলো, দুঃখ পাও তো এইখানেই সবচেয়ে বেশি ?"

অসিত এড়িয়ে গেল প্রশ্নটা, বলল : "বাঃ, মতভেদ থাকবে না মানুষে মানুষে ?"

"তুমি কথা রাখলে না অসিদা।"

"কথা ?"

"হ্যাঁ। কারণ…তুমি বেশ জানো এ শুধুই…কী বলব ?…মানে মতভেদের ব্যাপারই নয়।"

"তবে ?" তবুও অসিতের স্বীকার করতে বাধে।

"কী জানি !…কিন্তু অসিদা…"

"ও কী রে ? আজ তোর হয়েছে কী ?"

ওর চোখ ছলছল ক'রে ওঠে ফের, বলে : "কী ক'রে বো—ঝাব অসিদা ?...তবে—"

"তবে কী ?"

"নিশ্চয় কোথাও একটা অপরাধ করি…কারণ…তুমি যখন চাও আমার জন্যে সেটা যে খারাপ হ'তে পারে না এতে তো সন্দেহই থাকতে পারে না।"

অসিত চুপ ক'রে থাকে · পরে বলে কোমল সান্ত্বনার সুরে : "না ছায়া, এ জন্যে মন খারাপ কোরো না, লক্ষ্মীটি। অপরাধ ক'রে যারা জানে না তাদের দলে তুমি পড়ো না।"

"মানে ?"

"মানে প্যাঁচ নেই তোমার মধ্যে।"

ছায়া বলে কোমল কণ্ঠে : "আমাকে তুমি অত ভালো ভেবো না অসিদা, আমার সত্যি বড় কষ্ট হয়।"

"সে কী রে ?"

"কী ক'রে বোঝাবো অসিদা, আমি যে মুখ্যু, লেখাপড়া জানিনে তো—বোঝাব কী ক'রে? তবে হয়।"

অসিত খুব আদর ক'রে বলে ওকে ফের খুব কাছে টেনে নিয়ে: ই বড় পাগলি। লেখাপড়া মানে কী—শুনি?"

"আমি কী জানি যে বলব?"

"তুই যা জানিস তা লেখাপড়ার চেয়ে ঢের বড়।—ওকী? তবু চোখে জল?"

ছায়া ওর বুকে মুখ লুকোয়।

"না লক্ষ্মী মেয়ে। ফের কাঁদলে—"

ও মুখ না তুলেই বলে: "কাঁদছি না অসিদা—চুপ করো।"

"কী ব্যাপার!"

"কিচ্ছু না। ভালো লাগছে। বড় আনন্দ। চুপ্।"

অসিত ওর রেশমের মতন নরম খোলাচুলে হাত বুলিয়ে দেয়, আজ ও চুল বাঁধে নি। বলল: "তাহ'লে সন্ধি তো ফের?"

ও মুখ তুলে হাসে: "ঝগড়াই হ'ল না—সন্ধি? বা রে!"

"ঝগড়া হয় নি তো কী হ'ল শুনি?"

"কষ্ট···না ভাই, তার পরে এত আনন্দ···এমন নির্মল···কেমন জানো অসিদা? খুব বড় বৃষ্টির পর তারা ফুটলে যেমন মনে হয় না তাদের আলোও স্নান ক'রে উঠেছে?"

অসিত হেসে বলে: "তবু নয়নতারা বলেন তিনি মুখচোরা।"

"মুখচোরা বলি না অসিদা, কারণ বলতে আমার প্রাণ আকুলি বিকুলি করে···যদিও যার তার কাছে নয় অবিশ্যি। না—আমি বলতে চাই, কিন্তু পারি না যে! কিন্তু কেন পারি না অসিদা? আমি মুখ্যু জানি, কিন্তু খুব বোকা কি?"

অসিত হেসে ওঠে, ছড়া কাটে:

"কে ধরেছে কে মেরেছে কে দিয়েছে গাল ?"

ছায়া ওর মুখ চেপে ধরে : "না এখন আদর না। আমি সত্যি জানতে চাই। বলবে তুমি আমাকে ?"

"কী ?"

"আচ্ছা, তুমি আমাকে ভালোবাসো ?"

"কী মনে হয় ?" হাসি পায় না।

"মনে হয় বাসো। কিন্তু কেন বাসো অসিদা ? আমার না আছে রূপ, না রঙ, না গুণ, না বিদ্যে না চটক। তুমি কত ক—ত ভালো ভালো মেয়ে দেখেছ এদেশে ওদেশে ! তবু আমার মধ্যে—"

"এবার মুখ চেপে ধরার পালা কার ?"

"কিছুতেই না" ছায়া ওর হাত থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নেয়। "সবচেয়ে বড় কথাটা এখনো বলাই হয় নি। আজ আমি বলবই—যা থাকে কপালে।"

"কী বলবি শুনি !"

"তুমি সে-জাতের মানুষ নও যার ডাকে মেয়েরা সাড়া দিতে ভয় পায়। কারণ তুমি·· ধার্মিক।"

"কী ক'রে জানলি ? যখন নিজেই বলিস ধর্মের তুই ধারও ধারিস না ?"

"আঃ ! একেই কথা আমার জোগায় না, তার ওপর তুমি জেরা ধরলে আমি কী ক'রে বলব যা বলতে চাই ?"

"আচ্ছা বল্।"

"আমি বলতে চাই···রোসো·· না আমার প্রশ্নটা এই···ঐ দেখ, ফের ফের ঘুলিয়ে গেল।"

"আচ্ছা, সময় দিচ্ছি। এক দুই—"

"হ্যাঁ মনে পড়েছে। আমি বলতে চাইছিলাম তুমি ক—ত ভালো ভালো মেয়ে দেখেছ।"

"অর্থাৎ আমার পাশে যে-মেয়েটা কথার মধ্যে গানের সুর আনছে সেটা ফেল্‌না ?"

"না, ফেল্‌না বলছি নি, কিন্তু—কী ক'রে বোঝাই ?—ধামিক মেয়ে তো নই—যা তুমি চাও।"

"কেমন ক'রে জানলি ?"

"না। মনরাখা কথা না। অন্তত আজ নয়।"

"আমি কী সব সময়ে মনরাখা কথাই বলি রে ?"

"ঐ তো। এত বলি, তবু তুমি কথার মানে ধ'রে মানে বুঝবে।"

অসিত ফের চমকে ওঠে। বলে: "এ ঢঙের কথা যিনি বলতে পারেন তিনি বো—ঝাতে পারেন না ?"

"পারলে তুমি এত ভুল বোঝো কেন ভাই ?"

"তোকে আমি ভুল বুঝব একি হয় রে ?"

"হওয়ার কথা নয় মানি। কিন্তু—"

"কী ?"

"হ—য়।"

ফের চোখে ধারা নামে অদৃশ্য ব্যথার মেঘ থেকে।···

আজ একথা ব্যবধানের আলোয় যেন আরো উজ্জ্বল হ'য়ে ওঠে ওর চিত্তলোকে। তাই তো আরো দুঃখ হয় কেমন ক'রে ও ছায়াকে ভুল বুঝত—কেমন ক'রে পারত এমন কথা বলতে যে ছায়ার সঙ্গে ওর কোনো মিলই ছিল না গভীরে। একথা ওর আজ আরো মনে হয় এইজন্যে যে এ বিষয়ে ওর ছেলেমানুষি গোছের ভুল হ'লেও ছায়ার তো এ ভুল কখনো

হয় নি! বলতে কি, ছায়ার একটা গভীর বেদনা ছিল এইখানেই যে অসিতের সঙ্গে এই যে মস্ত মিল ওর রয়েছে সেকথা অসিত অস্বীকার ক'রে কেমন এক ধরণের আনন্দ পেত। নানা খুঁটিনাটি নিয়ে ভুল বোঝাবুঝির মধ্যে দিয়েই ও বুঝেছিল একথা। তাই ও এত চেপে রাখতে চেষ্টা করত ওর আক্ষেপ যে অসিত বোঝে না ওস্তাদ হওয়া ওর পক্ষে অসম্ভব। অথচ অসিতের একটা দারুণ আশঙ্কা ছিল এইখানেই। সুর ও কথার মিলনে যে অপূর্ব কাব্যসঙ্গীত রচিত হয় তার সর্বশ্রেষ্ঠ স্রষ্টা বাঙালি। এই সৃষ্টির স্বাধিকার ছেড়ে দিয়ে যে ছায়ার মতন প্রতিভাময়ী হিন্দুস্থানী গান নিয়ে তা ন· না না ভাঁজবে ওস্তাদি গানকে বসাবে ওর হৃদয়মন্দিরে একথা ভাবতেও অসিত গভীর ব্যথা বোধ করত।

কিন্তু তবু এ ভুল বোঝাও সয়—সয় না যা সেটা এই যে ও কী ক'রে ভাবতে পারল ছায়ার মধ্যে পারমার্থিক তৃষ্ণা নেই? ওর কাছে ছায়া কদাচ বলত নিজের দুঃখের কথা—নিজের দুঃখ নিয়ে হাহুতাশ করা ও অত্যন্ত অপছন্দ করত, কিন্তু তবু কতবার কত ছন্দেই কি সে অসিতকে বলে নি যে সংসারের সুখে যদি সুখী হ'তে পারত তবে খুব স্বস্তি বোধ করতে পারত! ওর সম্বন্ধে অসিতই কি একবার লেখে নি:

ব্যথারে আড়াল রেখে আনন্দ যে বিলাত উছলি'
সুখ যে বাসে নি ভালো সুধা ভালোবেসেছিল বলি'।

তবে? তবে কেন ও এ ধরণের আক্ষেপকে মনে ঠাঁই দিত যে ছায়ার অন্তরের অতলে নেই সেই তৃষ্ণার তৃষ্ণা যা তাকে সাংসারিক তৃপ্তির মধ্যেও অতৃপ্তিই আনত বহন ক'রে? আজ ওর মনে এতটুকু সন্দেহ নেই যে যদিও গানই প্রথম ছায়াকে ওর কাছে টেনে এনেছিল কিন্তু সে শুধু প্রথম দিকে। বলতে কি, গান যে ছিল ওদের যোগসূত্রের একটা উপলক্ষ্য সেটা কি দুদিন যেতে না যেতে সবাই টের পায় নি?

অথচ তবু কে আনত ওদের মধ্যে দুস্তর ব্যবধান যার জন্যে ওরা দুঃখ

পেয়েছে বারবারই? এ তো শুধু ওর নিজের ধারণা নয়—ছায়াও তো টের পেয়েছিল।

এ-প্রশ্ন কতদিনই তো জেগেছে ওর মনে। আগে আগে এ-রহস্য ও ভেদ করতে পারত না। কিন্তু ক্রমশই আভাস পায় নি কি? বুঝতে পারে নি কি যে এই অনাম ব্যবধান ওদের মধ্যে শুধু দুঃখকেই নিবিড় ক'রে ধরে নি, মাধুর্যকেও অপরূপ ক'রে তুলেছিল? তবে এ-ও আর এক কম রহস্য নয় যে, যাকে মনে করে অবাঞ্ছনীয় সেই দূরত্বই এনে দেয় এক অবর্ণনীয় সামীপ্যের ইঙ্গিত। কথাটা শুনতে একটু উল্টো গোছের শোনালেও আসলে তো কাল্পনিক নয়। কেন না ওদের মধ্যে যত ভুল বোঝাবুঝিই ঘটুক না কেন, যত মনকষাকষিই বেড়ে উঠুক না কেন, যত সূক্ষ্ম ঘাতপ্রতিঘাতের অগোচর লীলাই অন্তঃশীলা ধারার মতন বইতে থাকুক না কেন, ওদের অন্তরে এ-ভ্রান্তি কবে ঠাঁই পেয়েছে যে ও ওর কাছে পর? সংসারে অবশ্য বড় পাওয়া বলতে যা বোঝায় তা হয়ত ওরা পরস্পরের কাছে পেত না—বছরে একবার বই দেখা হ'ত না —তাও মাত্র মাস দুই তিনের জন্যে। সংসারের দিক দিয়েই বলো, বা সম্পর্কের দিক দিয়েও বলো পরস্পরের কাছে ওরা অত্যাবশ্যক ছিল না। কিন্তু বাইরের পাওয়ার কথা তো হচ্ছে না এখানে। হাতিয়ে নেওয়া, লুঠতরাজ করা এসব নিয়ে যারা মাথা ঘামায় ঘামাক—কারণ বাইরের দিক থেকে দেখতে এরা যতই অতিকায় হোক না কেন মানুষের আসল ট্রাজিডি তো নয় বাইরের নাট্যলোকে, আসল ট্রাজিডি হ'ল অন্তরের অন্তঃপুরে। খতিয়ে, বাইরের উদগ্র উচ্চাশা ক্ষুধা তৃষ্ণা এসব কি অন্তরের অশান্তিরই একটা প্রতিচ্ছায়া নয়? ভিতরে যারা বড় কিছুর সন্ধান পেয়েছে তারা কবে তাড়াতাড়ি করেছে বাইরের প্রসাদ নিয়ে। জগতের বরেণ্যরা আবহমানকাল যে-বস্তু চেয়েছেন সে তো বাইরের কোনো সাম্রাজ্য নয়—তা জগতে এখন যতই কেন না জয়জয়কার রটুক বাইরের

অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠানের। শুধু অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠানের কথাই বা কেন? বাহ্য বলি কাকে? শুধু তাদেরই নয় কি যারা খানিকটা আকস্মিক? একথার সেরা প্রমাণ এই যে, সব চেয়ে বড় দুঃখ মরণের বিচ্ছেদ নয়—জীবনের বিচ্ছেদ। বিরোধের ব্যবধান বাজে বৈকি, খুবই বাজে, কিন্তু আরো বেশি বাজে যখন ব্যবধান আসে বিকাশধারার ভিন্ন গতিতে যখন তোমার জীবনের বিকাশ আমার জীবনে বিকাশমুখী হ'তে নারাজ—যখন অন্তরদেবতা বলেন: "অতএব তোমার পরম স্নেহাস্পদের কাছ থেকেও আজ বিদায় নাও।" এমন কি যে-দুঃখের নাটমঞ্চ স্থূলদৃষ্টিলোকে প্রতিষ্ঠিত—তার বেদনাও সবচেয়ে বড় হয় তো তখনই যখন জীবনের দুর্যোগে তার পাদপ্রদীপের আলো নিভে গেলে অন্তরের অন্তঃপুরেরও আলো যায় নিভে—অর্থাৎ যখন আঘাত আসে বাইরে থেকে নয় ভিতর থেকে—গভীর প্রত্যাশায় বঞ্চিত হওয়ার দরুণ। আজ তাই ও বুঝতে পারে যে ছায়া ওকে গভীর আনন্দ দিয়েছিলও যে-কারণে, গভীর দুঃখ দিয়েছিলও ঠিক সেই কারণেই: অর্থাৎ ওরা পরস্পরের কাছে যে-ধন চাইত সে বাইরের কোনো অভাবপূরণের নয়—অন্তরের তৃষ্ণা মেটানোর। একথায় রিয়ালিস্ট মহাপ্রভুরা হাজার তারস্বরে উপহাসের হাসি হাসলেও সত্য। এত সত্য যে তাদের উপহাস করবার চেষ্টাও পণ্ডশ্রম মনে হয়।

তবু আজও ওর মনে একটা প্রশ্ন কেবলই জবাব চায়: যখন বাইরে কোনো প্রতিকূলতাই ছিল না ওদের আদান প্রদানের—যখন সমস্ত পরিবারই করত ওদের স্নেহের আনুকূল্য—তখনও সে এসে পথ আগলে দাঁড়াত···ছাড়িয়ে নিত এর কাছ থেকে ওকে। কেউ কি জানে?

কিন্তু না—তাই কি জোর ক'রে বলা যায়? জীবনদেবতা কি হাজারো ছন্দে ওদের আদান প্রদানের আনুকূল্যও করেন নি? ছবির পরে ছবি ভেসে ওঠে এ-অনুকূলতার।

শিকারায় প্রীতি, ছায়া, অসিত। দেবদা পাঠিয়ে দিয়েছে ওদের, নিজে গেছে বাজারে প্রীতির জন্যে শাড়ি আর ছায়ার জন্যে দুল কিনতে এই-ই ওর স্বভাব, সংসারের নীরস গুরুভার কাজগুলো ও নিজেই বেছে নেয় যাতে বাকি সবাই অবকাশ পায় নিশ্চর্চায় রসচর্চা হ'তে। দুটো বজরায় ওরা পাশাপাশি আছে ঝিলমের তীরে নোঙর ক'রে। কিন্তু দেখাশোনার সব ভার ঐ একটি লোকের। নৈলে কি আর আহারবিহার চলে এমন এলাহি ঢঙে—রাজভিষক এসে করে পদসেবা? না অসিতের নয়—প্রীতির। ভাবতে আজও অসিতের হাসি আসে—যাকে বলে করুণ হাস্য। প্রীতি কেন যে জলপথে এত অসামাল হ'ত? এক বজরা থেকে অন্য বজরায় টপকে না যায় কে? লীনা যে লীনা যে সব কিছুতেই উঠত ডরিয়ে সেও কাঠবিড়ালি হ'য়ে উঠেছিল জলপথের লাফা-লাফিতে, নৌকা থেকে ডাঙায়, বজরা থেকে শিকারায়, শিকারা থেকে ওপারে। কিন্তু প্রীতি কিছুতেই পারে না যাকে জাহাজি ভাষায় বলে to have sea-legs থুড়ি, river-legs: টাল সামলাতে না পারাটাই যেন ছিল ওর একটা বিচিত্র আনন্দ। কতবার যে পড়ত! সময়ে সময়ে এ বৈচিত্র্যের জন্যে ওকে বেশ একটু দাম দিতে হ'ত বৈকি যেমন ঘটেছিল একদিন দুপুরবেলা। দেবদা খুব ভালো পেয়ারা আপেল স্ট্রবেরি আরো কি কি এনেছে বাজার থেকে শুনে প্রীতি এক বজরা থেকে অন্য বজরায় টপকে যেতে না যেতে পপাত তরণীতলে।

নিরুপায়ের উপায় সত্যযুগে ছিলেন জনার্দন, কলিযুগে অশীতিপর রাজভিষক্ কিষণচাঁদ; ওঁকে আভিজাত্য, দয়াশীলতা সহিষ্ণুতা ও শিভালরির মূর্ত বিগ্রহ। প্রীতির কলহাস্যে রসিকতায় গল্পালাপে সর্বো-পরি পান সাজায় বৃদ্ধের মাথা ঘুরে গেল। কাশ্মীরি সুন্দরী যতই লাবণ্য-ময়ী হোন্—সে বাইরে. রসালাপে তিনি প্রায় শূন্যের কোঠায়, অর্থাৎ

থেকেও না থাকারই সামিল। কাজেই কাশ্মীরি অভিজাত বঙ্গবালা লাবণ্যে মুগ্ধ না হয়ে করেন কি?

কিষণচাঁদকে অসিতই তার করেছিল। যদিও অনেক ভেবেচিন্তে কারণ রাকার* অন্তর্ধানের দরুণ যদি তিনি এখনো মনে ক্ষোভ পুষে রেখে থাকেন! কিন্তু অসিত লাহোরে খবর পায় যে কিষণচাঁদের রাকাকে ভুলতে বেশি দেরি হয় নি। তাই ও একটু আশ্বস্ত হ'য়ে তাঁকে লেখে কিষণচাঁদ গান সত্যিই ভালোবাসতেন তাই অসিতের সম্বন্ধে তাঁর যে একটু বিরুদ্ধভাব ছিল সহজেই উবে গিয়েছিল শ্রীনগরে ওদের বিশেষত ছায়ার মুখে অপরূপ গজল শুনে।

এহেন কিষণচাঁদ প্রীতির পদস্খলনে হাঁ হাঁ করে এলেন ছুটে। ওকে দাঁড় করাতেই হবে ফের। বিশেষ বিদেশে বিভূঁয়ে পদস্খলন। সে কী কথা! বৃদ্ধ দুবেলাই আসা সুরু করলেন এই অছিলায়। আর দেখতে দেখতে প্রীতির মচকানো পা ঋজু হ'য়ে উঠতে লাগল। "কলিতে ধন্বন্তরী আর নেই বলে কোন দুর্মুখ?"—বলত প্রীতি হেসে। অসিতকে চোখ ঠেরে দেবদা বলত একথার উত্তরে: "বটেই তো বিশেষ যদি রোগিণী হ'ন মধুকরী।"

এহেন ধন্বন্তরী মধুকরীকে বলেছেন এখন একটু আধটু শিকারা বিহার বাঞ্ছনীয়। তাই ওরা বেরিয়েছে তিনজন।

আজও ভুলতে পারে না অসিত ওদের সেই প্রিয় শিকারাটার কথা। কিষণচাঁদ রাজভিষক ব'লে ওদের সহজেই জোগাড় ক'রে দিয়েছিলেন একটি রাজকীয় শিকারা। যেমন সুন্দর দেখতে—ঝালর দেওয়া মখমলে-মোড়া—তেমনি আরাম বসতে। বিশেষ ব'সে গানবাজনা

* রাকা কিষণচাঁদের স্ত্রী—দুমেলের আশ্রমে আশ্রয় নেয় এই ঘটনার কয়েক বৎসর আগে। তার ও মালার কাহিনী গ্রন্থকারের "আশ্চর্য" উপন্যাসটিতে বর্ণিত হ'য়েছে।

করতে। অসিত প্রায়ই ছায়াকে গান শেখায় শিকারায় আর প্রীতি দোলে। থেকে থেকে বলে:

"দেখ্ দেখ্ ছায়া, ওখানটা কী সুন্দর! নদীর এই বাঁকটা।"

ছায়া মাত্র একটিবার তাকায়, বলে: "বাঃ"—ব'লেই অসিতের দিকে চেয়ে—"অসিদা ভাই কবে থেকে তোমাকে সাধছি তুমি কিছুতে গা করছ না সে-গানটা শেখাতে?"

"কোন্ গানটা রে?"

"সেই দীনদয়াল গোপাল হরি—ভজনটা।"

প্রীতি চেঁচিয়ে ওঠে: "ঐ ঐ ঐ:—যাঃ ঢেকে গেল মেঘে। বাঁদর মেয়ে কেবল গান আর গান একবার চেয়েও দেখে না—কী রকম যে ঝল্‌কে উঠল গৌরীশঙ্কর!"

"এখান থেকে গৌরীশঙ্কর দেখা যায় নাকি?" শুধায় অসিত।

"আহা না-ই হল গৌরীশঙ্কর—বরফের পাহাড় তো—কী চমৎকার দেখাচ্ছিল সূর্যের আলোয়!" ব'লেই ছায়াকে: "এমন দৃশ্যটা চেয়েও দেখলি নে। গান তো আছেই—"

ছায়া বলে অম্লানবদনে: "বরফই আছেই মাসিমা, গানই নেই।"

* * * *

দেখতে দেখতে শিখে নিল ছায়া। সকাল—তাতে কী! ওর কণ্ঠ সকালেই সান্ধ্যমায়া গ'ড়ে তুলতে পারে, সন্ধ্যায় প্রভাতী প্রফুল্লতা। আজও মনে পড়ে অসিতের শিকারায় সেদিন সকালে ওর পূরবী শেখা:

দীনদয়াল গোপাল হরি! বৃন্দাবন মো ভুলা তো সহি
রোলুঁ রজ চরণ পসার পলক চুক প্রেমপ্রসাদ চখ্ তো সহি।

মনে পড়ে আজও—কত কাছেই ওকে মনে হ'ত যখন ও গাইত এই সব গান—ভক্তি যখন ওর কণ্ঠে উঠত জেগে প্রবর্ধমান জোয়ারের জলের মত! আর কী দরদ দিয়েই না শিখত ও ভক্তির প্রতি ভাব অনুভাব!

"এখানটা হয় নি এখনো অসিদা, ঐ দেখ ফের তোমার চোখ গেছে বুঁজে এ রকম করলে কী করে শিখব ?"

অসিত তাকায়, বাজাতে বাজাতে বলে : চোখ বুঁজলে কান বুঁজে যায় একথা তো সাতজন্মেও শুনি নি। গা—থামিস নে—আমি খুব মন দিয়েই শুনছি।" ব'লে ফের চোখ বোঁজে ! ছায়া গায় পূরবীর অন্তরা :

"তোয় ছোড়কে কৌন কি আশ করু তেরে নগরমে নিত্য নিরাস করুঁ
দিন রাত যহি অরদাস করুঁ মোয় বনসি কি টের সুনা তো সহি।

আচ্ছা অসিদা এই যে 'নি—ত্য নিরাস করুঁ' এখানে নিত্য-র মিড়ে তারাসপ্তকে পুরো রে লাগছে। কিন্তু পূরবীতে তো শুধু কোমল রে লাগে, না ?"

অসিত খুশি হ'য়ে বলে : "হ্যাঁ। তবে এখানে নি-রে-সা এই মিড়ে ভক্তির কোমলতাটা ফোটে ব'লে আমি নি থেকে রে উঠবার সময় তারার শুদ্ধ রেখাব লাগিয়ে ঐ মিড়েরই ফিরতি পথে সা তে নেমে দাঁড়াই। এইজন্যেই তো ওস্তাদরা আমার ওপর চটা। তারা বলবে পূরবীতে যে কোমল রে না লাগিয়ে শুদ্ধ রে লাগায় সে গানে গণ্ডমূর্খ অর্বাচীন।"

ছায়া হাসে : "বলুক গে অসিদা। আমি তো দেখি এইখানেই তোমার বিশেষত্ব ! পুরো রে লাগিয়ে যদি পূরবীর রসটা তুমি এভাবে ফোটাতে পারো—এমন কি ধরো যদি সেটা পূরবীর রস না হ'য়ে হ'য়ে ওঠে—ধরো মুরবীর রস—কী যায় আসে ? না, তুমি ছেড়ো না তোমার নিজের ঢঙ। অর্বাচীন ! তুমি ! ঈ—শ্ ।" ব'লেই তাকায় ওর মাসিমার দিকে।

প্রীতি বলে হেসে : "দেখেছ অসিদা, একদিকে যেমন মেয়ের গুরুভক্তি অন্যদিকে ঠিক তেমনি মাসিমাকে মাসিরই টোনে ঈ-শ ব'লে ঠাট্টা ?"

ছায়া গুন গুন ক'রে ধরে ফের : "অরদাস করুঁ মোয়—অরদাস মানে কী যেন ?"

অসিত ফের চোখ খুলে ওর দিকে তাকায়: "অরদাস মানে আজি মাপীগ। হে হরি তোমাকে ছেড়ে কী আশা করতে পারি? তোমার ব্রজপুরীতেই বাস করব, শুনব তোমার বাঁশি এই মিনতি রেখো তোমার বাঁশির সুর শুনিও।"

"কী সুন্দর!" বলে ছায়া।

"কোন্‌টা?" শুধায় অসিত।

"সব!" বলে ছায়া ঘাড় নেড়ে।

"তবে যে তুই বলিস তুই ভাব বুঝিস নে?" শুধায় প্রীতি।

ছায়া বলে: "তর্ক থাক মাসিমা, এখন গানই হোক, লক্ষ্মীটি!" ব'লেই অসিতের দিকে চেয়ে: "হ্যাঁ ঐ অন্তরাটা আর একবার ধরো তো অসিদা—"

অসিত ধরে ছায়া দোয়ার দেয়:

ময় তো বনফল খায়কে বৈঠ রহুঁ তোসে ভূখ পিয়াস কি কুছ ন কহুঁ
তেরে প্রেমকে জলসে সদা ময় বহুঁ, মেরো দুঃখকো আন মিটা
তো সহি।

শুনতে শুনতে অসিতের শান্ত বুকের জলে জোয়ার ওঠে জেগে। চোখের জল সামলায় ও কষ্টে। বিশেষত যখন ছায়া আঁখর দেয়:

"হা কনৈয়া! হো কনৈয়া"

সঙ্গে সঙ্গে এক বিচিত্র অনুভূতি জাগে ওর মনের মধ্যে: কাকে এরা মনে করছে তাদের স্বজন? আত্মীয় হ'লেই কি স্বজন হয় সত্যি সত্যি? এ গান যে গায় এমনভাবে সে শুধু একজনেরই স্বজন—ভগবানের। আর গৌণভাবে—ভক্তের। অসিতের সঙ্গে ছায়ার যে-সম্বন্ধ নিত্য সে তো এই ভক্তের সঙ্গে ভক্তের সম্বন্ধ। কী? গুণীর সঙ্গে গুণীর? না, তা যদি হ'ত তাহ'লে অসিত ছায়ার জন্যে এতদিন

আশ্রম ছেড়ে বাইরে কোথাও থাকতে পারত না। অসিত হার্মোনিয়াম বাজানো বন্ধ করে।

"কী বাজানো বন্ধ করলে যে!"

অসিত বলে চক্ষু মুদে : "আহা, থামিস কেন দিদি? গেয়ে চল্ না—"

ছায়া ধরে :

তেরে দরশকা লাল ময় পিয়াসী হুঁ সুরদাস বহোত হিরাস হু
মেরি আশকি পিয়াস মিটা তো সহি মেরা জীবন মরণ ছুটা তো সহি

অসিত ডাকে : "কাছে আয় তো রে!"

ছায়া কাছ ঘেঁষেই বসেছিল, বলে হেসে : "আর কত কাছে আসব শুনি?"

অসিত ওর মাথাটা বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে গভীর স্নেহে ওর খোলা চুলে হাত বুলিয়ে দিতে থাকে···প্রীতি চোখ মোছে।

"ফের্ ধর্।"

"পারছি নে ভাই আর। একটু বাদে।"

অসিত তাকায় ওর চোখের দিকে···এ কী! চোখের পাতা ভিজে... ভগবানের গান গাইতে!

এ মেয়ে নাস্তিক!!

* * * *

"ও—হু—উ—উ—ডক্টর, হ্যালো ডক্টর!" প্রীতি চেঁচিয়ে ওঠে হাততালি দিয়ে।

কিষণচাঁদ! আর রক্ষে আছে?

অসিত বাধা দিয়ে বলে হেসে : "প্রীতি! রামপ্রসাদ বলেছেন বটে ডুব দেরে মন কালী ব'লে কিন্তু তা ব'লে প্রেমপ্রসাদও বলেন নি যে শিকারা উল্‌টিয়ে।"

প্রীতি: কী যে ঠাট্টা সব সময়ে! আমি যেন—

ছায়া: প্রায় উঠে দাঁড়িয়েছিলে যে মাসিমা—অসিদা তো মিথ্যে বলে নি—শিকারাটা টলমল ক'রে উঠেছিল।"

"তুইও গুরুর সুর ধরছিস মাসিমার খরচে? আমি ওঁকে ডাকলাম তো তোরই জন্যে—তোর গান উনি দারুণ ভালোবাসেন ব'লে।"

অসিত: দেখতে দেখতে উনি ধরলে প্রীতি। একটু তর সইলেও পারতে (প্রীতি অসিতকে কিল দেখায় খুব রেগে)

রাজভিষকের শিকারা এসে লাগল ওদের শিকারার পাশে। সংলাপ সুরু হ'ল (ইংরাজি উর্দু মিশিয়ে)

প্রীত: Hullo Doctor!

কিষণচাঁদ: Hullo Miss Delicate! And what's this? The great Nightingale! How serious!"

অসিত: And the great angel! How funny!"

প্রীতি অসিতকে ফের কিল দেখায়।

কিষণচাঁদ: But why object to anglehood—having attained it?

প্রীতি (কুপিত): You too, Doctor!

কিষণচাঁদ: But I am not Brutus!

প্রীতি: I would have taught you a lesson—

কিষণচাঁদ: O don't—at least not in a frail Shikara—wait till the house-boat is at hand—সবর্ তো কর্‌না চাহিয়ে।

অসিত: Do you know what is her silent answer?

কিষণচাঁদ: No.

অসিত: It is—সবুর? কৈসে করঁ সাব? বিবি হুঁ।

কিষণচাঁদ : কিসকি ?

ব'লেই হো হো ক'রে হাসি।

প্রীতি ধরে ভাঙা হিন্দি : "কাছে আইয়ে—ছায়া বহত আচ্ছা গাতা—ভজন।"

"গাতি তো—মগর সুনাতি নহি।"

প্রীতি (নিজের ভুল শুধরে) : হাঁ হাঁ সুনাতি তে—only বোলতি যে—

কিষণচাঁদ (হেসে) : Your Hindustani is too sw by half dear angel. At my age don't you know—(ব'লেই আবৃত্তির সুরে এক গজল ধরেন)

লোগ কহতে হঁয় "তুঝে ক্যা হো গয়া ?
মুহপে আঁখে রংকে অন্ধা হো গয়া ?"*

But alas the heart replies :

অবতো দিল্ পর্ উন্‌কা করজা হো গয়া
জো ন হোনা চাহিয়ে যা হো গয়া।
হো গয়ি অব তো মহব্বৎ হো গয়ি।

ছায়া (অসিতকে) : এ যে সেই গজলটা ভাই—অম্‌জদের না ?

কিষণচাঁদ : What ! You know this, Bulbul ?

অসিত : তব ক্যা ? শুনিয়ে গা ?

কিষণচাঁদ : (সোৎসাহে) : বেশক্।

অসিত (ছায়ার দিকে চেয়ে) : দে না শুনিয়ে।

ছায়া (ফিশ ফিশ ক'রে) : ও বাবা !

প্রীতি : গা না।

ছায়া : ডাক্তার সাহেবের সামনে ? উচ্চারণের—

প্রীতি : কিছু ভুল হয় না তোর উচ্চারণে।

ছায়া (হেসে): তোমার সার্টিফিকেট মাসিমা? তোমার উর্দুর
া যমুনা দিলে এই মাত্তর—

কিষণচাঁদ (একবার এর মুখ একবার ওর মুখের দিকে তাকিয়ে):
ক্যা য়াদি নহি।

অসিত: বুলবুল কভি ভুল সকতি?

কিষণচাঁদ: তব ? ডরতি? আরে? (ছায়াকে) বুলবুল হোকে
তুম ডরতি হো? ক্যা তাজ্জব! সুনাও সুনাও।

কী করে ধরে ছায়া ভয়ে ভয়ে:

নেকনামি সারি রোখসৎ হো গয়ি।
খুব বদ্‌নামিমে শোহরৎ হো গয়ি।
অপনে বেগনেসে বহশৎ হো গয়ি।
দীনো দুনিয়াসে ফরাগৎ হো গয়ি।
হো গয়ি অব্ তো মহব্বৎ হো গয়ি॥

রাজভিষক ঘন ঘন ঘাড় নাড়েন আর থেকে থেকে অস্ফুটধ্বনি করেন:
'মহাশাল্লা! কেয়া খুব!"

গান শেষ হ'ল। ডাক্তার হাত বাড়িয়ে দিলেন। ছায়া সসঙ্কোচে
রমর্দন করে। কিষণচাঁদ হেসে বলেন: "আরে বুল্‌বুল! তুম ক্যোঁ
ডরতি হো বতাও তো সহি। (অসিতকে) She can pronounce
n the guttural গয়েন—and how perfectly?—I could
never have believed that a Bengali mademoiselle could
pronounce ফরাগৎ comme it faut

প্রীতি (অসিতের দিকে কটাক্ষ হেনে): But you forget
who her guru is.

কিষণচাঁদ (ও-শিকারা থেকে হাত বাড়িয়ে অসিতের করমর্দন
করে): "It is true, what our angel has said: now I

know sing bhajans or ghazls with such a tenderness for their bhava. Congratnlations for your brilliant pupil. I have never heard this song so beautifully rendered, it sounds like a bhajan, really."

* * * *

আজও মনে পড়ে অসিতের একথাটি। কারণ কিষণচাঁদ সচরাচর গজল ভালোবাসতেন না—ভালোবাসতেন ভজন। কিন্তু গানে তাঁর একটি সহজ অন্তর্দৃষ্টি ছিল ত ই তিনি ধরেছিলেন যে অসিত গজল গায়ও খানিকটা ভজনের ঢঙে, অর্থাৎ আরাধনার। অথচ এ নিয়ে ওকে কত কথাই শুনতে হয়েছে বাংলা দেশে—যে ও সুরের মাধুর্য ইঙ্গিত আবেশ বোঝে না, কথার ভারে সুরকে রাখে চেপে, অত্যধিক ধর্মভাব এনে গানের আর্ট নষ্ট ক'রে ফেলে···কলকাতায় একটি গীতশ্রী কিশোরী বিজ্ঞভাবে প্রীতিকে এমন কথাও বলেছিল যে ছায়ার যে-রকম অসামান্য গীতিপ্রতিভা তাতে মনে হয় কোনো "ভালো লোকের" কাছে খেয়াল শেখালে সেও "গীতশ্রী" হ'য়ে উঠতে পারত। মনে পড়ে ছায়ার একথায়: "তোমরা খুব বড় হও ভাই গীতশ্রী হ'য়ে খেয়াল গেয়ে——আমাদের বাংলা গানই ভালো!"

গীতশ্রী তাতে উচ্চাঙ্গের হাসি হেসে বলেছিলেন: "বাংলা গান আবার গান না কি? তাহলে তো তেলাপোকাও পাখি।"

ছায়া বলেছিল মুচকে হেসে: "সবাইয়েরই যদি পাখা ওঠে তবে ধুলোয় লুটোবে কে ভাই? বেচারি ধুলোর কথাও তো ভাবতে হয়—তারও তো সাথী চাই।"

ওর মনে পড়ে প্রতিমার কথা যে ছায়া দরকার হ'লে বেশ দুকথা শুনিয়ে দিতে পারে।

কিন্তু আরো মনে হয় বাঙালির এই মুরুব্বিয়ানার কথা। কথায়

স হিন্দু যখন মুসলমান হয় তখন গোমাংস হয় তার দৈনন্দিন খাবার। বাঙালি যখন ওস্তাদ হয় তখন তার চেয়ে শোচনীয় দৃশ্য ই দেখা যায়। প্রায় বাঙালি সাহেবের মতনই শোচনীয় যাঁরা ফাঁক ক'রে সিগারেট খেতে বড়ই ভালবাসেন"। ঐ একরত্তি তশ্রীদের দল—মস্ত সাড়ে পাঁচখানি রাগের ও আড়াইখানি তাল নিয়ে দের চলাফেরা—তাঁরাও দুদিন তবলা নিয়ে দুএকটা মামুলি ঠুংরির কা বা খেয়ালের একসপ্তকী মূর্ছনা দিতে না দিতে বলেন কিনা বাংলা ানেই নয়'!' শুনে হাসি পায়, না কান্না? কারণ যারা কাব্য ও শেষ করে ভক্তির মধ্যে রস না পেয়ে বিজ্ঞভাবে এ-সব গানকেও কষতে য় নিছক আর্টের কষ্টিপাথরে ক'ষে শুধু সুরের কারদানি বিচার করে দের এ অন্ধতার, খুড়ি ভাববধিরতার যে-গভীর ট্রাজিডি তার তলস্পর্শ কে? যে-গানে অন্তরের গভীরতম স্বপ্ন আশা ও তৃষ্ণার কলি া মেলে তাঁর পানে "যস্য ভাসা সর্বমিদং বিভাতি" যিনি সব সুষমার াধার, সব পথের পাথেয় সব অন্বেষণের অন্তিম লক্ষ্য যে-গানের ঝঙ্কারে বনের গভীরতম শোকের মূলে পৌঁছয় শান্তি, মরুবুকে জাগে সাচ্ছলতা, নির্ভরসার বুকে বিছায় শক্তি: যে-গানে শুধু সৌন্দর্যের রণার নয় জীবনের মূল চাহিদার মধ্যে ঘটে যায় অন্তর্বিপ্লব তাকে না এরা যাচাই করতে যায় কয়েকটি মামুলি এস্থেটিক বিধিবিধান য়ে কোড ভগমা দিয়ে! ওর মনে পড়ে আজও ছায়ার একটি বাউল:

যাচিয়ে নিবি এমন নিকষ আঁধার পুরে কোথায় তোর?
অশ্রু যদি মালা না হয় বেদনা রয় শুষ্ক ডোর।

সত্যি কী দিয়ে যাচাই করবে ওরা সে-ঐশ্বর্যকে যাকে দেখা যায় মর্ত্য সুরের দৃষ্টিপ্রদীপ দিয়ে? ভজন বলতে যারা বোঝে ওস্তাদি ায়দায়-গাওয়া কয়েকটা পদাবলী তারা কী ক'রে জপবে ভজনের জমন্ত্র? আশ্রমের বাইরে এসে এইখানে ওর শুধু দুঃখ না—কষ্ট হ'ত

এ বলে বালগন্ধর্ব কী সুন্দর ভজন গায় "কৃষ্ণ মুরারি বিনতি করত কা হারি। ও বলে কেসর বাই হাসতে হাসতে কী অপরূপ ভজন গাইলে 'দ্রৌপদী পুকারি', সে বলে হীরাবাই যা ভজন গাইলে রাধাকৃষ্ণের অমুক কনফারেন্সে—উঃ! এ-জাতের সমজদারদের ও কেমন ক'রে বোঝাবে ভজন কী বস্তু? বলতে কি, ভজন যাদের কানের জিনিষ আর ভজন যাদের প্রাণের জিনিষ তাদের মধ্যে কি ভাষার কোনো সেতু থাকতে পারে? কিষণচাঁদ তো তবু পদে আছেন কিন্তু মাত্রা ছাড়িয়ে যেতেন বাঙালি সমজদাররা যাঁরা ভক্তির মর্ম না বুঝে গম্ভীরভাবে মতামত প্রকাশ করতেন ছায়ার ভজনের কীর্তনের রসমূল্য সম্বন্ধে। ভজন তো সুরের ফেরি নিয়ে হেঁকে বেড়ায় না দোরে দোরে। ভজন হ'ল আত্মনিবেদন তাই ক্রমশই ওর মনে হত ভজন কোনো মজলিশে গাওয়া আদৌ সম্ভব কিনা! ভজনের আসন শুধু ভক্তের হৃদয়—পূজার লগ্নেই যার আলো জ্বলে, কনফারেন্সের পাদপ্রদীপের সামনে নয়। আট বৎসর আশ্রমবাসের পর এই চেতনা ওর গভীর হ'য়ে উঠেছিল আরো—যার সুরু হয় বাসন্তীপুরে পীতবাসের দীক্ষায়। বিশেষ ক'রে সম্প্রতি দু'চারটি তথাকথিত এস্থেটিক জলশায়—যেখানে ওকে গাইতে হয়েছিল ও কয়েকটি ভজন উপরোধে প'ড়ে—(হা চতুরানন!) একটার ছবি আজ ফুটে ওঠে ওর মানসপটে আরো উজ্জ্বল হ'য়ে। আসরটা ছিল যাকে বলে তরুণদের। বসেছিল ওদের কাশ্মীর রওনা হওয়ার মাত্র কয়েক দিন আগে। ওর এক আগেকার আলাপী সাহিত্যিক রসিক বন্ধুর অনুরোধেই ঘটেছিল এ দুর্দৈব। তাকে যদি ও বলতে পারত স্পষ্টবাদী হ'য়ে যে তার ওখানে ভজন গান ক'রে ভক্তের চিত্তগ্লানি হয়! হায় রে কত যে ভুগেছে অসিত এই যেখানে না বলা উচিত সেখানে হাঁ বলে ছবিটা ভেসে ওঠে।

বালিগঞ্জে থাকতেন এ ফ্যাশনেবল্ সাহিত্যিক বন্ধুটি। নাম রঙ্গলাল। তরুণ বয়সেই খুব নাম ডাক। অনেকের মতে—মানে তাঁর সাঙ্গোপাঙ্গদের মধ্যে—রঙ্গলাল হ'লেন অধুনাতন "প্রগতি সাহিত্যের" এক অদ্বিতীয় ধূমকেতু! যেমন তাঁর ডিকশন, তেমনি ওরিজিন্যালিটি, তেমনি দলাদলির প্রতিভা। নিজের দল ছাড়া আর সব দলই যে নগণ্য কী আশ্চর্য্য যুক্তি দিয়ে যে তিনি প্রমাণ ক'রে দিতেন—আর কী ক্ষুরধার ভাষায়! তাঁর সাঙ্গোপাঙ্গেরা সবাই জয়ধ্বনি করত যে যাকে নিয়ে রঙ্গলালবাবু রঙ্গ করেন তাঁর বিখ্যাত "চাবুক" পত্রিকায় তার উত্থানশক্তি লোপ পায়। গুজবটা সত্য কি না তদন্ত ক'রে দেখার কথা তাদের কারুরই মনে হয় নি অবশ্য কারণ খবরটা (তাঁদের কাছে) খোষ খবর হওয়ার দরুণ বোধহয় সবাই-ই ধ'রে নিয়েছিল যে এর ঝুটোও ভালো।

এহেন ধনুর্ধরের সঙ্গে অসিতের যোগসূত্র ছিল কোথায় এ প্রশ্ন অনেকেরই মনে উদয় হ'ত থেকে থেকে। তবু জীবন বিচিত্র—তাই ছিল একটা যোগসূত্র—যদিও কোথায়-যে বলা মুস্কিল। তবে রোগের নিদান না জানলেও সিম্‌টম্‌কে চাক্ষুষ করা শক্ত নয়—তাই অসিতের বন্ধুরা অনেকেই ব্যথিত হ'ত দেখে যে রঙ্গলালের সঙ্গে ওর সৌহার্দ্যের না হোক একটা প্রীতির সম্বন্ধ ছিল। অবশ্য অসিতের 'পরে গুরুদেবের প্রভাব যতই সক্রিয় হচ্ছিল ততই এ-সম্বন্ধটুকু দুর্বল হ'য়ে পড়েছিল বটে কিন্তু তবু কলকাতায় গেলে অসিত রঙ্গলালের সঙ্গে দেখাশুনো ক'রে তৃপ্তি বা আরাম না পেলেও নিজের গানের আসরে তাকে নিমন্ত্রণ করত সপরিবারে। রঙ্গলালও আসত - যদিও কেন যে তা-ও বোঝা একটু কঠিন। প্রথম প্রথম অসিত ভাবত হয়ত ওর গান শুনতে রঙ্গলালের সত্যিই ভালো লাগে। ক্রমশ এ-বিশ্বাসের মূল দুর্বল হ'য়ে পড়েছিল কেন না যেহেতু অসিতের গানে এস্থেটিক প্যাঁচ বিশেষ ছিল না, সেহেতু এ ধরণের গান—বিশেষ আধ্যাত্মিক গান—ভালো লাগা রঙ্গলালের পক্ষে

অসম্ভব। তবু ওর মনে হ'ত যে হয়ত একটু ভালো লাগে কোথাও নৈলে রঙ্গলাল কেনই বা আসে ওর গানের আসরে, আর কেনই বা ওকে ডাকে প্রতিবার তার বাড়িতে গান করতে! শুধু তাই নয় কারণ খুঁজে না পেলেও অসিত স্পষ্ট দেখত যে রঙ্গলালের সঙ্গোপাঙ্গদেরকে না হোক রঙ্গলালকে ওর ভালো লাগত। তার মধ্যে একটা সহজ ঘরোয়া ঘনিষ্ঠতার ভাব ওকে আরাম দিত—যে ঘনিষ্ঠতার ভাব কলকাতায় কম সাহিত্যিকের মজলিশই পেয়ে উঠত। দু'একটি উন্নাসিক সাহিত্য সভায় ও গিয়েছিল দু'একবার কিন্তু কই ভালো লাগে নি তো! না, রঙ্গলালের মধ্যে ছিল না উন্নাসিকতা যাকে ইংরাজিতে বলে snobbism তাই হয়ত রঙ্গলালকে ওর ভালো লাগত। অথচ কেন জানি না ওর মনে হ'ত ওদের মধ্যে হৃদ্যতা টিকবে না, দুজনের মধ্যে মিল এত কম যে টিকতে পারে না। ভাবতে কেন দুঃখ হ'ত ওর, ও জানে না আজও। কেন যে ও রঙ্গলালকে—(কথাটা স্বীকার করতে কুণ্ঠা এলেও সত্য যখন বলতেই হয়) —একটু ভালোবেসে ফেলেছিল বুঝতে পারে না। শুনত রঙ্গলাল নানা স্থলেই ওকে নিয়ে হাসাহাসি করে। কাগজেও ওর ধর্ম বিশ্বাসকে নিয়ে গায়ে প'ড়েই করেছে তীরন্দাজি—তবু অসিত পারে কই রঙ্গলালকে অপছন্দ করতে? রঙ্গলাল ওকে একবার একটি কলেজের চাকরির জন্যে লিখে। কলেজের কর্তৃপক্ষ ছিল ওর আত্মীয়—তাকে অসিত ওর জন্যে বলার ফলে রঙ্গলালের চাকরিটি হয়। কিন্তু এজন্যে ওর আত্মীয়টি পরে অসিতকে ভংসনা করেছিলেন কেন না রঙ্গলাল অনেক সময়েই না কি কাজ ফাঁকি দিত।

এ উপকারের প্রতিদানে কিন্তু রঙ্গলাল নানা দিক দিয়েই অসিতকে হাস্যাস্পদ করবার চেষ্টা করেছিল। তবু কেন অসিত ওকে অপছন্দ করতে পারত না? কেনই বা ওর আক্ষেপ হ'ত ভাবতে যে রঙ্গলাল অদূর ভবিষ্যতে তার শত্রু হ'য়ে উঠবেই উঠবে যেমন শত্রু হয়ে উঠেছে

রঙ্গলালের বন্ধু সমীহ বাবু। সে ওর গুরুদেবের নামে যা তা বলে কাগজে লিখেও ছিল যদিও কাগজওয়ালারা ছাপায় নি ওকেই ফেরৎ দিয়েছিল সে-অকথ্য কুৎসা। রঙ্গলালের ওখানে সমীহর সঙ্গে ওর দেখা হ'ত এ ছিল ওর কাছে আর এক অপ্রীতিকর ব্যাপার। অথচ তবুও তো ও যেত সেখানে!

এবার কলকাতায় এসে ও স্থির করেছিল যাবে না। ও ছায়াকে শিখিয়েছিল একটি গান মনে পড়ে আজও :

বিদায়-বাঁশি বাজে ··বাজে···

বিদায় দিতে শিখব কবে?

না—এসব এস্থেটিক আসর ওর স্বচ্ছন্দের সঙ্গে মেলে না মিলতে পারে না। অতএব বিদায় দেওয়াই তো ভালো নির্মম হ'য়ে। অথচ এই নির্মম হওয়ার কঠোর সংকল্প বার বার করলেও পারত না তো সে-সংকল্প কার্যক্ষেত্রে মেনে চলতে। তাই এবারও ও রঙ্গলালের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করল—শুধু নিজে যাওয়া নয়—ছায়াকেও নিয়ে যেতে রাজি হ'ল, কারণ রঙ্গলালের না হোক ওর স্ত্রী অতসীর বড় ইচ্ছা ছায়াও আসে অসিতের সঙ্গে। অতসীর সঙ্গে অসিতের আলাপ অনেকদিনের। অতসীর মধ্যে এমন একটি নির্ভীক সরল স্নেহশীলতা ছিল যে অসিত ওর নিমন্ত্রণ সহজে উপেক্ষা করতে পারত না! আরো এই জন্যে যে অতসীর বাবা মা-ও অসিতকে স্নেহ করতেন আন্তরিক। স্নেহের দাবি অসিত পারৎপক্ষে উপেক্ষা করতে পারত না।

বেশ মনে পড়ে ওর রঙ্গলালের ওখানে সেদিনকার আসর। ওর সঙ্গে ছিল প্রীতি ও কান্তি। ছায়া এসব তরুণ তীরন্দাজদের আসরে যেতে একটু ভয় পেয়েছিল ব'লেই অতসী করেছিল প্রীতিকে নিমন্ত্রণ, রঙ্গলাল—কান্তিকে।

ছায়ার প্রকাণ্ড মোটর রঙ্গলালের গাড়িবারান্দার সামনে দাঁড়াতেই

অতসী ও রঙ্গলাল তাড়াতাড়ি নিচে নেমে এল। অতসী ভারি খুসি ছায়া এসেছে ব'লে।

ঘরভরা লোক। তরুণদের জনতায় দু-একজন প্রবীণ আছেন এই যা ভরসা। অসিতের কেমন যেন সম্প্রতি "তরুণ" কথাটা বরদাস্ত হয় না। যত দিন যায় ততই ওর মনে হয় সব বড় সাধনাই তারুণ্যের নাগালের বাইরে।

সোমেশ (তরুণ কবি): আসুন আসুন অসিত বাবু। সেদিন ছায়াদেবীদের বাড়ি আমাকে রঙ্গলালবাবু নিয়ে গিয়েছিলেন যদিও ঐ ভিড়ে আলাপ করার সুবিধে হয় নি।

অসিত (নমস্কার করে): আপনি ?

রঙ্গলাল: তরুণ কবি সোমেশের নাম শোনেন নি!—এখন ইনি তরুণতম।

অসিত: ও। শুনেছি।

রঙ্গলাল: আর ইনি তরুণতর সমীহ বাবু। ইনি কিন্তু তরুণ না, authentic প্রবীণ তারাপদ বাবু। ইনি, মীনাক্ষীমোহন বাংলার কবি কিশোরদের মধ্যে উদীয়মান ধূমকেতু। ইনি কমলারঞ্জন—কী সুন্দর যে ঠুংরি বাজান সেতারে—এনায়েৎ খাঁর কাছে তালিম নিয়েছেন।

অসিত: বটে! নমস্কার।

(চা কেক পরিবেশন করা হয়)

তারাপদ: আপনার নাম শুনেছি অনেকদিনই অসিত বাবু। তবে আপনি না কি আজকাল ভজনে স্পেশালাইজ করেছেন কান্তিবাবুর কাছে শুনলাম।

কান্তি: সে কি! স্পেশালাইজ করার কথা তো আমি বলি নি। বলেছিলাম উনি ভজন ছাড়া অন্য কোন গান আজকাল গান না।

তারাপদ: আই বেগ্ ইয়োর পার্ডন্। নো অফেন্স।

অসিত : না না—সে কী কথা।

তারাপদ বাবু প্রীতির সঙ্গে আলাপ করতে সুরু করতেই অসিত কান্তিকে জনান্তিকে জিজ্ঞাসা করল ওঁর কীর্তিকলাপের কাহিনী।

কান্তি (জনান্তিকে) : জানেন না! বাঃ পচা ডিম, পিঠে ঘা, বাসি মাছ, ডিমের খোলা জাতীয় রিয়ালিস্‌মে উনি না কি বিলেতের লরেন্স ইলিয়টদেরও হার মানিয়েছেন। এক সমীহ বাবু আছেন তাই রক্ষে, নৈলে মডার্ণ পোএটরা হেরে যেতেন এনশেণ্টদের কাছে।

মীনাক্ষীমোহন (অসিতের দিকে কচুরির দানিটা এগিয়ে) : আপনার শিষ্যার মুখে একটি ঠুংরি গান শুনব কিন্তু অসিত বাবু, ওসব বাংলা গান ফান আমরা বুঝি না।

কমলারঞ্জন : আঃ তুমি বড় বেরসিক মীনাক্ষী, বাংলা গানও চমৎকার গান ছায়া দেবী—অবশ্য ঐসিতি ঢঙে।

ছায়া (জনান্তিকে অসিতকে) : কোথায় এসেছ ভাই গাইতে? চলো বাড়ি যাই।

অতসী (ছায়াকে) : আর একটু সর্বৎ!

ছায়া (কুণ্ঠিত) : না। আমি খেয়েছি দু গেলাস।

রঙ্গলাল : তবে একটু চা?

ছায়া : না (অসিতের মুখের দিকে তাকিয়ে)—ধন্যবাদ।

সমীহ : অসিত বাবু! আমরা কিন্তু বড় আশা ক'রে আছি আপনার ছাত্রীর মুখে একটি ঝরা পাতার গান শুনব কিম্বা ভুলে যাওয়া দীর্ঘ নিশ্বাসের। গাইবেন তো ছায়াদেবী?

ছায়া (অবাক) : ওসব গান তো আমি জানি না।

রঙ্গলাল : আছা অসিতবাবুকে এনে ওরকম ক'রে ফর্মাস করলে চলবে কেন! ওঁর কাছে ওঁর গানই শুনতে হবে।

সোমেশ : তা কেন! আমরা চাই বৈচিত্র্য। Variety is the spice of lip—বলেছেন এস্কাইলাস।

অসিত : এস্কাইলাস ?—হবে। (ভেবে) আমার যেন মনে হচ্ছিল কাউপার।

অতসী (অসিতকে চা দিয়ে) : সোমেশ বাবুর কথা কানে তুলবেন না অসিতবাবু। ওর এক মস্ত দোষ উনি ক্রমাগত ফর্মাস করবেন আর্টিস্টের কাছে—

অসিত (বাধা দিয়ে হেসে) : অতসী ! মুঠোর মধ্যে পেয়ে আমাকে আর্টিস্ট বলিস্ নি ভাই।

মৃণালিনী (অতসীর মা) : না না বাবা, তুমি তোমার গান গাইবে —কীর্তন। কী যে সব হয়েছে আজকাল খালি ফর্মাস আর তর্ক।

তারাপদ : তা ভালো। কিন্তু ভজন না অসিত বাবু, দোহাই। কীর্তন পর্যন্ত তবু বরদাস্ত হয়।

ছায়া (অসিতের পাঞ্জাবির আস্তিনে টান দিয়ে) : বলো না অসিদা ! এ আসরে তুমি গাইতে পারবে ?

অতসী (কাছে এসে হেসে) : গুরু শিষ্যায় কী কথা হচ্ছে ভাই অত গোপনে ? আমরা একটু ভাগ পাইনে ?

অসিত : ছায়া বলছে ওর একটু শরীর—

ছায়া : না শরীর বেশ আছে। তবে আমার বড্ড বাড়ি ফিরতে ইচ্ছে করছে।

রঙ্গলাল (শুনতে পেয়ে কাছে এসে) : সে কি হয় ছায়া দেবী ! কত লোক এসেছেন আপনার সঙ্গে অসিতবাবুর ঐ ডুয়েটটা শুনতে— অকূলে সদাই—যেটা গ্রামোফোনে গেয়েছেন—

সোমেশ : আর আমরা ব'সে আছি আপনার মুখে একটি রবীন্দ্রসঙ্গীত শুনতে।

ছায়া : রবীন্দ্রসঙ্গীত! (অসিতের মুখের দিকে তাকিয়ে) আমার তো একটারও কথা পুরো মনে নেই অসিদা। রবীন্দ্রনাথের গান কতদিন যে গাইনি –

সমীহ : কেন? গুরুভক্তির দরুণ?

ছায়া : কী বলছেন?

মীনাক্ষী : কে না জানে বলুন যে অসিত বাবু রবীন্দ্রনাথের গান তেমন —মানে high class মনে করেন না। আপনারও কি তাই মত? মিস্?

ছায়া : ওঁর ঢঙ আলাদা—রবীন্দ্রনাথের ঢঙ আলাদা।

সমীহ : অমন আড়াল দিয়ে লুকিয়ে গেলে চলবে না ছায়া দেবী! বলতে হবে সঙ্গীতে রবীন্দ্রনাথের অপূর্ব দান আপনি স্বীকার করেন কি না।

ছায়া (অসিতকে) : আমাকে এসব জেরা কেন অসিদা?

প্রীতি (নরমস্বরে শান্তি আনতে) : আহা জেরা তো নয়—ওরা জানতে চাইছেন রবীন্দ্রনাথের গান তোর ভালো লাগে কি না।

ছায়া সমীহের দিকে তাকিয়ে মৃদু অথচ দৃঢ় কণ্ঠে) : আগে যতটা লাগত এখন ততটা লাগে না। (অসিতকে জনান্তিকে) চলো না ভাই। আমার একটুও ভালো লাগছে না।

মীনাক্ষী : এটা আপনার প্রেজুডিস নয় ত!

ছায়া (বিরক্ত) : জানি না। আমার তেমন ভালো লাগে না আর এইটুকুই জানি। অসিদা!

অসিত (মীনাক্ষীকে ঈষৎ তীক্ষ্ণ সুরে) : ওকে কেন জেরা করছেন সবাই মিলে বলুন তো? চেপে ধরতে হয় chief offender কে ধরুন। কী বলিয়ে নিতে চান আপনি! হ্যাঁ আমি মনে করি—

(গোলমাল দেখে রঙ্গলাল ও অতসী মিষ্টান্নের পাত্রটা নিয়ে এসে পড়ল ওদের মাঝে)

কান্তি (অসিতের হাঁটুতে টোকা দিয়ে): এ সব কথা এখানে বলো না অসিদা! এখনো রবীন্দ্রনাথ বেঁচে, মনে রেখো। তুমি যা বলবে তাঁর কানে তো উঠবেই, যা না বলবে তাও উঠবে সাতখানা হ'য়ে।

ছায়া (কান্তিকে): চলো যাই মামা!

কান্তি (জনান্তিকে): আমি বলি কি অসিদা, আমি ছায়াকে নিয়ে যাই—পৌঁছেই তোমাকে পাঠিয়ে দিব মোটরটা।

তারাপদ (চায়ের পেয়ালা হাতে ক'রে অসিতের কাছে স'রে এসে): আপনি রবীন্দ্রসঙ্গীত সম্বন্ধে কী যেন বলতে চাচ্ছিলেন অসিতবাবু!

অসিত: না। রবীন্দ্রনাথ এখন অসুস্থ, তাঁর গানের সম্বন্ধে ভালো মন্দ কোনো কথাই আমি বলতে চাই না। তাঁর শেষ জীবনে তাঁকে আমি ব্যথা দিতে চাই নে।

সোমেশ: কিন্তু ব্যথার প্রশ্ন আসে কেন? স্বাধীন মত বলবার অধিকার প্রত্যেকেরই আছে।

অসিত (আতপ্ত সুরে): তাহ'লে শুনুন, আমার স্বাধীন মত হচ্ছে এই যে যাঁকে বরাবর আন্তরিক শ্রদ্ধা ক'রে এসেছি তাঁর অসুস্থ অবস্থায় এমন কোনো কথা বলতে আমার বাধে যাতে তিনি মনে কষ্ট পেতে পারেন। জীবনে নির্ভীক সমালোচনা বড় জিনিষ। কিন্তু সবচেয়ে বড় জিনিষ নয় এ আমার স্বাধীন মত।

মীনাক্ষী: কিন্তু তাহ'লে মুখ ফসকে প্রায় যে ব'লে ফেলেছিলেন?

রঙ্গলাল: মীনাক্ষী —please!

মীনাক্ষী (উদ্দীপ্ত): কেন, please কেন? উনি কেন মনে করবেন রবীন্দ্রনাথের গান গানই নয়? তাঁর মতন প্রতিভা জগতে আজ কোথায়?—কি গদ্যে, পদ্যে, গানে, সুরে, গল্পে, ছবিতে—

অসিত : আপনি ছবিরও কি একজন বিশেষজ্ঞ যে তাঁর ছবি সম্বন্ধে ায় দিচ্ছেন ?

প্রীতি (অসিতের কনুয়ে আঙুল দিয়ে ঠেলে সাবধান করে) : কিছু াদি মনে না করেন মানাক্ষীবাবু, তবে একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে চাই।

মীনাক্ষী (অত্যধিক ভদ্রতার স্বরে) : করবেন বই কি।

প্রীতি : আপনারা ওকে ডেকেছেন আজ কি গান শুনতে না তর্ক াদতে ?

মীনাক্ষী (সবিনয়ে) : আপনাকে আমিও humbly জিজ্ঞাসা করতে াই যে বন্ধুভাবে আলোচনার নাম কি তর্ক ? কি বলেন মিস সোম ?

ছায়া : না। কিন্তু যা হচ্ছিল সেটাকে ঠিক বন্ধুভাবে আলোচনা বলা লে না।

সোমেশ : আপনার সঙ্গে আমি fully agree করি মিস সোম— অসিতবাবু রবীন্দ্রনাথের গান কি ছবির প্রশংসা শুনলেই—

রঙ্গলাল : সোমেশ, please—

সোমেশ (কানে না তুলে) : কিন্তু আপনাকে যদি জিজ্ঞাসা করি মিস—

ছায়া : আমাকে মিস্ বলবেন না—আমি বাঙালি—

সোমেশ : বটে বটে—আমি জানতে চাই ছায়া দেবী আপনি কী বলেন ?

প্রীতি : এসব তর্কে ও কী বলবে—ছেলেমানুষ ?

সোমেশ (শিভালরির স্বরে) : Certainly not. এ হল বিংশ তাব্দী—তার উপর ছায়া দেবী তরুণী, তার উপর famous গায়িকা। মা করবেন মিস্—থুড়ি ছায়া দেবী—তবে আশা করি এটা আপনি ঠিক স্পিরিটেই নেবেন এবং বিশ্বাস করবেন যে আপনার গানের আমি একজন rdent admirer ?

ছায়া : না।

সোমেশ : সে কি ? আপনার গানের আমি ভক্ত নই ?

ছায়া (শান্ত দৃঢ় কণ্ঠে) : না। হ'লে অসিদার গান আপনি ভালোবাসতেন—কারণ আপনারা যা-ই বলুন। আমি তো জানি আমা গান কী—ওঁর গানের একটু ছায়া বৈতো কিছুই নয়—

সোমেশ : I protest—ছায়া কিছুতেই বলা যায় না। মানি, ওঁর গান আপনি অনেকটা ওঁর ঢঙেই গেয়ে থাকেন, কিন্তু ওঁর গানের মধ্যে আপনি যে প্রাণসঞ্চার করেছেন সে আপনার নিজের প্রতিভায় কারু শেখানোর জন্যে নয়। কিন্তু যাক সে তর্ক, যখন আপনি তর্ক ভালোবাসেন না দেখা যাচ্ছে। কেবল একটা কথা – অসিতবাবুর গান আমিও ভাঁলোবাসি না তা নয়—

ছায়া (বিরস কণ্ঠে) : ধন্যবাদ।

সোমেশ (বিপন্ন) : কিন্তু—মানে—ইয়ে—I mean তাই ব'লে, বি বলা চলে যে রবীন্দ্রনাথের গান কিছুই নয় !

অসিত : আমাকে দিয়ে কেন এমন কথা বলিয়ে নিতে চান সোমেশ বাবু যা আমি কোনোদিনও বলিনি ?

তারপদ (বিজ্ঞভাবে) : আচ্ছা যেতে দিন। কিন্তু আপনি ছায়াদেবী —আজ আমরা আপনার মত শুনবই শুনব। রবীন্দ্রনাথের গা কিছুই নয় ?

অসিত : আমাকে দিয়ে কেন এমন কথা বলিয়ে নিতে চান সোমে বাবু যা আমি কোনোদিনও বলিনি ?

তারাপদ (বিজ্ঞভাবে) : আচ্ছা যেতে দিন। কিন্তু আপনি—ছায়া দেবী—আজ আমরা আপনার মত শুনবই শুনব। রবীন্দ্রনাথের গা কি ভালো নয় ?

সোমেশ: Your impartial judgment কিন্তু I mean নিরপেক্ষ মত।

ছায়া (বিরক্ত): নিরপেক্ষ কাকে বলে আমি জানি না। তবে এটা জানি যে অসিতদার বাংলা গ নে আমি যে ভাবে সাড়া দিতে পারি সেভাবে সাড়া দিতে পারি না আর কারুর গানে।

সোমেশ: I am sorry—কিন্তু আপনি impartial নিরপেক্ষ হ'তে ান না এ কি একটা কথা হ'ল ছায়া দেবী?

ছায়া (অসিতকে): অসিদা, ওঁকে একটু বুঝিয়ে দাও না ভাই যে আমি নিরপেক্ষ বলতে কী বোঝায় ভালো বুঝি না—

সোমেশ: তবু।

ছায়া (বিরক্ত): দেখুন আমার ভালো লাগে না এ ধরণের তর্কাতর্কি —বিশেষ রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে যাঁকে আমি ভক্তি করি। তাছাড়া আমার ়তের কীই বা মূল্য? কীই বা বুঝি আমি গানের যে মত দেব ়িরপেক্ষ হ'য়ে।

সমীহ: সে কি? আপনি আমাদের দেশের একজন নামকরা গায়িকা rima donna—যাঁকে মহাত্মাজির মতন বেরসিকেও nightingale থতাব দিয়েছেন—

ছায়া: অসিদা, তুমি না যাও তো আমি যাচ্ছি চ'লে। মামা—

তারাপদ: না না সে কি হয়?

রঙ্গলাল: এসব আলোচনা কেন গানের আসরে?

কমলারঞ্জন: ঠিক। এটা তো debating club নয়। আমরা ়সেছি আজ ওঁদের দুজনার গান শুনতে।

রঙ্গলাল: ব্যস্। তবে আজ বিতণ্ডার ইতি হোক। তবলা বাঁধা হাক। (অসিতকে মৃদু সুরে): বিশ্বাস করবেন অসিতবাবু আমার ়কেবারেই ইণ্টেনশন ছিল না—

তারাপদ : যেতে দিন। না অসিতবাবু, ধরুন প্রথমে আপনিই —মধুরেণ সমাপয়েৎ হবে ছায়া দেবীর অপূর্ব কণ্ঠে।

ছায়া : আমার গাইতে ইচ্ছে করছে না।

সোমেশ : জানি জানি মিস্—থুড়ি ছায়া দেবী। ওস্তাদদের, থুড়ি নাইটিংগেলদের গলা কবে ভালো থাকে বলুন? তবে আমরা সাধতে নারাজ নই একটুও—

ছায়া : আমি গলা ভালো নেই বলিনি—গাইতে ইচ্ছে নেই বলেছি। নমস্কার রঙ্গলাল বাবু—(উঠল দাঁড়িয়ে)

অতসী (একটা ছোট ট্রেতে কয়েক পেয়ালা চা নিয়ে প্রবেশ): এ কী?

রঙ্গলাল : ছায়া দেবী থাকতে চাইছেন না আর!

অতসী : সে কি হয় ভাই? (কাছে এসে ওর দুটি হাত ধ'রে কো[মল] কণ্ঠে) : আমরা সবাই ভারি দুঃখিত হব যদি তুমি গান না গাও আজ এই দেখ ওই মেয়েটি টা[ল]া থেকে এসেছে বাসে তোমার গান শুনবে ব'লে।

ছায়া (নমস্কার ক'রে): আপনার নাম কি?

সে : রমা। আমি ম্যাট্রিক ক্লাসে পড়ি। আপনার গান আমার কী যে ভালো লাগে—

ছায়া : আমার গান শুনেছেন?

রমা : শুনি নি? ওমা!—না শুধু গ্রামোফোন নয়—এলাহাবাদে শুনেছি যে আসরে জহরলাল এসেছিলেন আপনার গান শুনতে। আপনার কণ্ঠ শুনে তাঁর মুখের চেহারা আপনি হয়ত লক্ষ্য করেন নি কিন্তু আমি করেছিলাম।

অতসী : রমা গাইতেও পারে বেশ চমৎকার। তুমি গাইলে ও-ও শোনাবে। (হেসে) আর তোমারই গান।

ছায়া : আমারই ?

রমা (কুণ্ঠিত) : না না। আপনার সামনে আমি গাইব এতবড় সাহস আমার নেই।

অতসী : না না শোনো কেন ছায়া ? ও তোমার কয়েকটি গ্রামোফোনের গান এমন সুন্দর তুলেছে—এমন কি রেডিওতেও গেয়েছে—

অসিত : বটে ? কোন্ গান ?

রমা (সসঙ্কোচে) : না না কিছুই পারি না আমি—অতসীদির কথা শোনেন কেন ? (ছায়াকে) তবে আপনাকে আমার খু-ব হিংসে হয়।

ছায়া : কেন ?

রমা : অসিতবাবুর মতন গুরু পেয়েছেন ব'লে।

ছায়া (অসিতের দিকে তাকিয়ে বিরক্তি ভুলে) : কী অসিদা ? এবার ?

রঙ্গলাল (হেসে) : কিন্তু অসিতবাবুকেও আমরা অনেকে হিংসে করি ছায়া দেবীর মতন শিষ্যা পেয়েছেন ব'লে। কলিযুগে দেখেনি কেউ এমন নিটোল 'লয়ালটি'।

অসিত (প্রসন্ন কণ্ঠে) : At long last we agree.

রঙ্গলাল (হেসে) : আপনার সঙ্গে আরও অনেক agreement আছে আমার অসিত বাবু হয়ত একদিন সেটা আপনারও চোখে পড়বে।

অতসী : কিন্তু আর না, এবার গান হোক। যত সব বাজে তর্কাতর্কি কী যে !

একটি যুবক তবলা কোলের কাছে নিয়ে বসেছিল—মেলাল সুর এতক্ষণে তারপর অসিত গাইল একটি মিশ্র কীর্তন ধামার ঠেকায় :

জীবনে সহচারী, মরণে কাণ্ডারী, বন্ধু তোমা সম কে আর আছে ?
হাস্যে অতুলন, লাস্যে বিমোহন—তোমারে প্রিয় কার হিয়া না যাচে ?

প্রভাতে স্নেহারুণ দিবসে দিশারি যে, নিশীথে চন্দ্রমা তিমির নাশে,
বিয়োগে সান্ত্বনা, মিলনে মুরছনা, চাহনি-তারামণি নয়নাকাশে।
বিশ্বরাজ হ'য়ে নিঃস্বসখা, বলো নিরুপমের কোথা উপমা ভবে?
যা কিছু ধরণীর কাটায় ধূলিটান—ধেয়ানে তৃষ্ণায় বুনি' নীরবে
ছন্দ-বরষায় বসুন্ধরা বুকে ফিরিয়া আসো চির-শ্যামল গুণী!
তোমারি জপি' নাম অবনী অভিরাম, গগন নীল তব শঙ্খ শুনি।

তোমারি নিশ্বাসে স্বপন-সৌরভ উছলে হৃদয়ের কমলদলে:
অন্তরঙ্গ যে সবার চেয়ে—তারে কেমনে দুর্লভ বলে সকলে!
তোমারি লাবনিরে কল্পনায় রঙি' শিল্পী আঁকে তার প্রাণের ছবি।
তোমারি মর্মরে তরুরা গায় গান, তোমারি বিদ্যুতে জলদ কবি।
তোমারি কিংকিনি শুনিয়া সাধে গ্রহতারকা অগ্নির উধাও গতি।
তোমারি মুরলীর শুনিয়া 'আয় আয়' দুরভিসারে ধায় সতী অসতী।
কী দিয়ে দীন আমি পূজিব হেন নাথে—দয়াল তুমি, এই ভরসা শুধু।
যাদের সব আছে তাদের নও তুমি, যাদের কেহ নাই তাদেরি বঁধু॥

তবু কী মোহ মেঘ ঘনায় খনে খনে! তারে ডাকার পথে সাগর প্রায়
বাধার ব্যবধান কেমনে সহে—যার পরশ বিনা তনু বিধবা হায়!
মানস বুনি' কোন্ চিন্তাজাল করে আকাশ-প্রার্থনা মলিন কালো!
ভালো যে নিখিলেশে বাসে নি, কেমনে সে নিখিলে অন্তরে বাসিবে ভালো
যেটুকু সাধি প্রেম—তোমারি প্রণয়ের প্রতিধ্বনি, কেন বুঝি না প্রভু?
তুমি না সাথে সাথে চলিলে সন্ধানে আঁধারে পথদিশা মিলিত কভু?
স্তব্ধ করো আজ বাসনা মুখরতা বাজায়ে সাধনার নীরব বাঁশি:
বিরহ-বেদনাও মধুর হবে—যদি তোমারি তরে প্রাণ রহে উদাসী॥

গান গাইতে গাইতে থেকে থেকে অসিতের চোখ পড়ে ছায়ার মুখে

ওপর। ও চোখ নিচু ক'রে একটু একটু দুলছে—একেবারে তন্ময় হ'য়ে! খানিক আগের বিরক্তির চিহ্নও নেই ওর মুখে। না—আরও দুজন অন্তত শুনছে মন দিয়ে অতসী আর রমা।

ওদিকে অবশ্য দুচারজন তরুণ গল্প করছে—হাসাহাসিও, ('এখনো ভগবান্' বলেই বোধ হয়) গাইতে গাইতে দুঃখ ওর হয় বৈ কি—আরো খানিক আগে ছায়ার কথা মনে ক'রে যে, এ ধরণের আসরে ও কেন আসে নিমন্ত্রণ রাখতে? কিন্তু তবু দুএকজন তো শোনে। না—রঙ্গলালও শুনছে সাগ্রহে। মনে ওর প্রশ্ন জাগে—সত্যিই কি রঙ্গলালের এ ধরণের ভক্তির কীর্তন ভালো লাগতে পারে?—কিন্তু রঙ্গলালের কাছে ও এক ধরণের অনামী কৃতজ্ঞতা বোধ করে: বাস্তবিক ও তো আর তারুণিক হাঙ্গাহাঙ্গামায় শড়কি ধরে নি!

এবার ছায়ার পালা।

ছায়া: আমার গান আজ থাক।

অতসী: কেন ভাই?

রমা: একটা গানও গাইবেন না? অন্তত আপনার সেই "আধফোটা ছোট তারা" গানটি—কিম্বা "বুল বুল মন ফুল"?

ছায়া (শান্ত অথচ দৃঢ়কণ্ঠে): এখানে না—কিছু মনে করবেন না—আপনার বাড়ি কোথায় বলুন, আমি সেখানে গিয়ে গান শুনিয়ে আসব।

অতসী (প্রীতিকে): একটা গাইতেই হবে বলুন না।

প্রীতি: একটা অন্তত গা ছায়া। সবাই যখন বলছেন—

ছায়া: না মাসিমা। আমার ইচ্ছে করছে না।

রঙ্গলাল: সে কি হয়? একটা অন্তত—

ছায়া: কেন? অসিদারই তো আসর এটা।

রমা : না — আপনারও। এখানে সবাই আপনার গানেরও ভক্ত বিশ্বাস করছেন না ?

ছায়া : না।

প্রীতি : কী যে দুম্‌দাম্ ক'রে কথা বলিস তুই !

ছায়া : মাসিমা, আমার মাথা ধরে গেছে সত্যি বলছি।

কান্তি: সে কি রে ? কখন ?

ছায়া : ঐ তর্কাতর্কির সময়।

রঙ্গলাল : একটু সর্বৎ খাবেন ? কি আইস ক্রীম ?

রমা : একটি গান অন্তত—আমি কতদূর থেকে এসেছি কত কষ্ট ক'রে যে জানেন না।

ছায়া (অগত্যা) : কী বলো অসিদা ? গাইব ?

অসিত : তোর মাথা ধরলে গাইবি কেমন ক'রে ?

ছায়া : মাথা ধরলেও গান গাওয়া কি আর যায় না ?

রমা : বড় খুসি হ'লাম !

ছায়া (অসিতকে) : তুমি যদি মনে করো এ আসরে আমার গাওয়া উচিত তবে গাইব।

সোমেশ : Bravo I say--

রঙ্গলাল : কী করেন সোমেশ বাবু ? দেখলেন না এইমাত্র এরকম করলে উনি কী রকম upset হন ? গান যদি শুনতে চান একটু চুপ করুন আজ I beg of you—please

অসিত (ছায়াকে) : গাইবি। ইচ্ছে করছে ?

ছায়া : না। তবে তুমি যদি বলো তো গাইব।

অসিত (ওর মুখের দিকে একটু চেয়ে) : আচ্ছা গা একটা।

ছায়া : কোন্‌টা ?

অসিত : ভজন টজনই একটা গা না হয়।

ছায়া (বিস্মিত): ভজন ! এ আসরে।

(অসিত চম্‌কে ওঠে)

কমলারঞ্জন : কেন ? ভজনও ভালো গাইতে পারলে beautiful—

ছায়া : অসিদা, "আধফোটা ছোট তারা"টাই গাই। (রমাকে) কী ভাই, খুসি তো ?

রমা (উজ্জ্বলকণ্ঠে) : কী ব'লে যে ধন্যবাদ দেব—

ছায়া ধরল : ঐ তারার মালার কুঞ্জে
আমি আধফোটা ছোট তারা
ঐ চাঁদের আলোর পুঞ্জে
হই আবেশে আপন হারা—

মনে পড়ে আজও অসিতের এ গানটি ধরতে না ধরতে ছায়ার মুখের সেই ভাবান্তর। বিরক্তি, অধৈর্য, বিতৃষ্ণা সবই গেছে উবে—মুহূর্তে। ঘরের মধ্যে শুধু ওর অপরূপ কণ্ঠে বেজে উঠছিল কত ভঙ্গিতে তান :

আমি আধফোটা ছোট তারা।

সুদূর কাশ্মীরে মনে পড়ে আজও—গান বলতে অসিত যা যা চাইত কী সহজেই না ফুটে উঠত ওর ভাবকোমল সুরদরদী কণ্ঠে। সঙ্গে সঙ্গে আলো যেন যেত বিছিয়ে···আর কি স্নিগ্ধ আলো সে ! এত তান দিচ্ছে, এত ছন্দের কারুশিল্প—(তবলচি তো মুগ্ধ !)—অথচ কোথাও কি এতটুকু প্রয়াস আছে, এতটুকু কষ্ট কল্পনা !

আবার মনে পড়ে আসরে নানা লোকের মুখে নানা রকমের ছবি ফুটে ওঠা : কারুর মুখে প্রীতি, কারুর প্রসন্নতা, কারুর বিস্ময়, কারুর আনন্দ। রমার তো কথাই নেই—অমন যে দুর্ধর্ষ তরুণ সোমেশ সেও এসে ক্ষমা চেয়েছিল বলেছিল যে বাংলা গানে যে তান মানায় না এ রাবীন্দ্রিক মত সে বদলাতে বাধ্য হয়েছে।

এ ধরণের অঘটন ঘটত আরো ছায়ার মুখভাবের দরুন। ওর ছায়াভ

রঙেও যেন একটা আলো ফুটে উঠত। ওর মনে পড়ে শ্রীনগরে ওর আলাপ হয়েছিল একটি চমৎকার ইংরাজ পরিবারের সঙ্গে। তাদের মধ্যে ছিল একটি আশ্চর্য চিত্রী রুডলফ। সে নানা ছবি দেখত অন্ধকারেও। সেই সব রূপ সে আঁকত তার ছবিতে। চোখে তার এক অপূর্ব দৃষ্টি উঠত ফুটে যখন সে কিছু একমনে দেখত চেয়ে চেয়ে ; সে মুগ্ধ হয়েছিল ছায়ার গানে—বিশেষ ক'রে গানের সঙ্গে ওর মুখের ভাবান্তরে। একদিন বলেছিল সে অসিতকে যে ছায়া যখন গান গায় তখন আর একটা মানুষ ব'নে যায়। মনে হয় "She is a born devotee !" সেই রূপটিই ও একদিন এঁকেছিল—যখন ছায়া গাইছিল তন্ময় হ'য়ে। সে ছবি ছিল কি একটি নাস্তিক মেয়ের, না পূজারিণীর ?

কেন ওর মনে আজও আসে এই নাস্তিক কথাটা ফিরে ফিরে ? কত সূত্রে কত ভাবেই তো ছায়াকে ও দেখেছে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে। বাজিয়ে নিয়েছে বললেও হয়ত অত্যুক্তি হবে না। কিন্তু কখনো কি ওর মধ্যে এতটুকু হাল্কামি মিথ্যাচার বা ভান দেখেছে ? অসম্ভব। বরং দেখেছে ওর মধ্যে এমন বিষাদ যা ওর অবস্থায় ওর মতন মেয়ের মধ্যে অনুমান করাও চলে না। অসিতের মনে পড়ে আজ বেশি ক'রেই ওর এই বিষাদের কথা। শত আনন্দোচ্ছলতার মধ্যেও রুডল্‌ফের চোখেও পড়েছিল ওর মুখের ওই গহন বিষাদের প্রচ্ছন্ন আভা ! মনে পড়ে সে ওকে প্রায়ই বলত : "ছায়া গভীর জলের মীন," বলত : "ওকে ওর পরিবারের কেউ চেনেনা অসিত। ও ও:দের দলের কেউ নয়। আমি ওকে জানি সামান্যই, কিন্তু তবু আমার মনে হয় আমার এ ধারণা ভুল নয়।"

আজ অসিতের মনে হয় আরো বেশি ক'রে এই কথাগুলি। প্রথম দিনের কথা মনে পড়ে—তখন ওরও মনে হয়েছিল এই কথাই : মেয়েটির

মুখে কিসের একটা বিষাদের আভা লেগে! কী যেন ও ভাবে কত সময়ে। থেকে থেকে হঠাৎ ওর চোখ চেয়ে থাকে শূন্যদৃষ্টিতে—কিসের দিকে! যখন দেবদা রাজুকে ও হারায়নি তখনো। মনে পড়ে ওর একটি কথা, হঠাৎ একদিন ও ব'লে ফেলেছিল যেন মুখ ফসকেই: "আমার বাঁচতে ইচ্ছে করে না অসিদা, কেন জানি না!" অথচ তখন ও তো সংসারের আদরিণী মেয়ে "নয়নতারা" সবাইকারই। কেন ও নিজেকে এমন নিঃস্ব মনে করত সে সময়েও—চারদিকে সব কিছুরই প্রাচুর্যের মধ্যে? গুরুদেব ওকে বলতেন বড় সাত্ত্বিক স্বভাবের মেয়ে। বলতেন ওকে বাঁচানো শক্ত হবে। গুরুদেবের কাছে ও তো কতবারই শুনেছে যাদের ভিতরটা বেশি বিকাশ পায় তাদের বাইরের কাঠামোটা, মানে দেহটা, প্রায়ই সে-বিকাশের চাপ সহ্য করতে পারে না। এই জন্যেই কি ও এত বিষণ্ণ বোধ করত এমন অকারণ? আর এ-বিষাদ যে বোধ করে এমন গভীর ভাবে সে কি সত্যি নাস্তিক হ'তে পারে কখনো! হ'লে গুরুদেব তাঁর তদ্‌গত সাধনা সত্ত্বেও কেন ওকে বাঁচাতে চেষ্টা পাবেন এত ক'রে? একবার যখন ও খুব খারাপ বাতে শয্যাশায়ী তাঁর শক্তিপ্রয়োগ ক'রে ওর সঙ্কট অবস্থায় ওকে সারিয়ে তুলেছিলেন একথাও অসিত শুনেছিল তাঁর মুখেই! অবশ্য একথার বৈজ্ঞানিক প্রমাণ প্রয়োগের প্রশ্নই ওঠে না—তার দরকারই বা কী যখন তিনি নিজের মুখে একথা বলেছেন? তবু শেষবারে ওকে এত চেষ্টা ক'রেও যে বাঁচানো গেল না ভাবতে ওর মন আজও ব্যথিয়ে ওঠে। কী আর হবে? আরোগ্যের শক্তি সব সময়ে রোগের শক্তিকে হটিয়ে দিতে পারে না এ তো জানা কথা। কিন্তু আরোগ্যলাভের কথা খানিকটা অবান্তর! ও গুরুদেবের করুণা স্নেহ আশীর্বাদ পেয়েছিল এইটেই তো সবচেয়ে বড় কথা। কেন পেল? নাস্তিক হ'লে অন্তত এভাবে পেত না এ তো নিশ্চিত। ভাগবত করুণা অবশ্য নাস্তিক আস্তিক বিচার করে না সত্য, কিন্তু তবু এও তো অসত্য নয় যে

ভগবানের করুণা সবাই সমান ধারণ করতে পারে না—সকলের মধ্যে তাঁর আলো সমান নির্মল হ'য়ে ফোটে না। সবাই যেমন সমান শক্তিধর নয়, তেমনি সবাই নয় সমান করুণা-সার্থক। ছায়া তো ছিল এই করুণাসার্থকদেরই দলে। নৈলে কি আর ভক্তির আলো ওর কণ্ঠে চরিত্রে মুখে অমন ভাবে প্রকাশ পেত কথায়, হাবভাবে, সুরে? মনে পড়ে সেদিন রঙ্গলালের ওখানে ওর শেষের গানটি :

তব চির চরণে
দাও শরণাগতি
এস ফুলসারথি,
আলো ধরিতে বনে।
আমি চাহি গভীরে
তব অকূল স্বনে
ঘন তুফান তীরে
ধ্রুব তারা স্বপনে!

আহা, মনে পড়ে আজও রমার চোখ দুটি কেমন ছলছলিয়ে উঠেছিল, অতসীর মুখ কোমল হ'য়ে এসেছিল—বিশেষ যখন ও গাইল এর সঞ্চারী ও আভোগ :

তুমি জানো তো প্রিয়,
মম প্রাণ দুরাশা :
যাচি শুধু অমিয়,
তাই বহি পিপাসা।
এসো ছায়া পাথারে,
দলি মায়া-আঁধারে
লহ দুরভিসারে
তব দুখ-বরণে।

এই-ই তো ছিল ওর প্রাণের পিপাসা। ওর একটি চিঠির কথা মনে পড়ে। ও সহজে লিখত না ওর মনের গভীর কথা। তবু এক আধটা ছত্রে কিছু প্রকাশ হ'য়ে পড়ত। যেমন যখন ও লিখেছিল: সংসার আমি ভালোবাসি তোমার মনে হয় অসিদা?—যদি ভালোবাসতে পারতাম—আহা! ব্যস্। কিন্তু এই "আহা" শব্দটির মিড় যেন ও আজও স্পষ্ট শুনতে পায় কানে। ও চেয়েছিল ভালোবাসতে সংসারকে কিন্তু পারেনি—আহা! তাই না ওর অহেতুক বিষাদ কাটে নি। আর একবার ও লিখেছিল "জগতে নীচতা হিংসা ও ঈর্ষা এত বেশি দেখি অসিদা যে মনে হয় কেন এ-জগতে এখনো মানুষ জন্মায়?"

অথচ তবু তো ও প্রায়ই বলত যে ভগবানকে চাওয়া কাকে বলে ও জানে না! কিন্তু যে একথা বলত গদ্যে সে কি সে-ই মানুষ যে গাইত সুরে:

লহ দুরভিসারে
তব দুখ-বরণে!

হয় কখনো?

না হয় না, হ'তে পারে না, বলে ও নিশ্চিতির সুরে। কিন্তু তবু প্রশ্ন হানা দেয় যে: কেমন ক'রে প্রায়ই আসত ব্যবধান গুরুশিষ্যার মধ্যে এই ভগবানকে নিয়েই? এ ব্যবধানের আভাস পেলেও ছায়া কী মর্মান্তিক দুঃখ পেত অসিতের চেয়ে ভালো ক'রে জানে কে। অথচ তবু এই ব্যবধানকে ও তো অস্বীকার করেনি—ওর মনরাখা কথা বলতে চেয়ে তখনো তো বলে নি যে অসিত যা চায় ও তা-ই। বলবে কী ক'রে?

মিথ্যা বলতে তো ও জানত না। বোধহয় চেষ্টা করলেও মিথ্যাচরণ করতে ও পারত না। একথার কত প্রমাণ ও পেয়েছে: মনে পড়ে এই কাশ্মীরেই একটি ছোট্ট ড্রামা যার কথা ছায়া ও অসিত ছাড়া আর কেউ জানত না।

ঘটনাটি ঘটেছিল সুরেশ্বরকে নিয়ে। সুরেশ্বর ছায়াকে হিন্দুস্থানি গান শেখাত অসিতেরই অনুরোধে। অপূর্ব খেয়াল গাইত সে। এরকম প্রতিভাবান্ খেয়ালী অসিত বাংলাদেশে তরুণদের মধ্যে আর দেখেনি। সুরেশ্বরের চরিত্রও ছিল বড় মধুর।

হঠাৎ ও চিঠি পেল, শ্রীনগরেই, যে সুরেশ্বর হুমেলে এসেছে গুরুদেবের আশ্রমে। অসিত জানত সুরেশ্বরের মনে বৈরাগ্য দেখা দিয়েছিল, কিন্তু সে বিবাহিত এবং বিবাহে মোটের উপর সুখীই হয়েছিল। তাই অসিত শুনে একটু আশ্চর্য হয়েছিল বৈ কি যে, সুরেশ্বর দোটানা কাটিয়ে হঠাৎ জীবনের মোড় ফেরাতে পারল একমুখী সাধনার দিকে। কিন্তু এদিকে সুরেশ্বরের স্ত্রী শুভার সঙ্গে ছায়ার আলাপ ছিল! সে ছায়াকে লিখেছিল এই নিয়ে দুঃখ ক'রে যে-জন্যে ছায়া চোখের জল ফেলেছিল।

সেদিন যখন ও বজরায় ব'সে একা ছায়াকে গান শেখাচ্ছে তখন ছায়া বলল ওকে শুভার দুঃখভরা চিঠির কথা। অসিতও শুনে মেয়েটির ব্যথা কল্পনা করে তার সঙ্গে সমবেদনা বোধ না ক'রে পারে নি। কিন্তু এ প্রশ্নের সমাধান কোথায়? ওদিকে সুরেশ্বরের কথাও মনে হ'ল—বৈরাগ্য প্রবল হ'লে যে দুকূল বজায় রাখা যায় না—এ কথারও তো মার নেই। ছায়াকে একথা বলতে সে একটু চুপ ক'রে থাকল—পরে শুধু বলল: "আহা অসিদা, শুভার মুখখানি কী যে মিষ্টি—দেখলে মায়া করে।" ব্যস্।

একথার উত্তরে অসিত কী বলবে ভেবে পেল না। একটু চুপ ক'রে থেকে প্রশ্ন করল: "সুরেশ্বর কি সংসার ছেড়ে গেছে বরাবরের জন্যে—লিখেছে শুভা?"

ছায়া ম্লানকণ্ঠে বলল: "ঠিক তা লেখেনি—তবে ভয় তো হয়ই।" ব'লে একটু চুপ ক'রে থেকে: "আশা করি সুরেশ্বর বাবু অতটা নির্মম

হ'তে পারবেন না। আহা, শুভার তাহ'লে কী যে গতি হবে ভাবতেও কষ্ট লাগে।"

অসিত কোনো কথা বলল না। কারণ এ যুগে ভগবানের জন্যে প্রিয় পরিজন ছাড়া যে সবার কাছেই নির্মমতার চূড়ান্ত মনে হয় একথা ও হাড়ে হাড়ে জানত। তার উপরে যে বিবাহিত তার এ-ধরণের ব্যবহার যে লোকের কাছে কি রকম অক্ষমনীয় মনে হতে বাধ্য বুঝতে তো আর বেগ পেতে হয় না কাউকেই। অথচ ওর মনে তবু প্রশ্ন জাগে—তাহ'লে কেন লোকে সর্বত্যাগীকে ভক্তি করে? কেন বলে—সাধু সন্ন্যাসীর সংস্পর্শ বহু ভাগ্যে লাভ হয়? বইয়ে-পড়া ত্যাগে মানুষ ওঠে উচ্ছ্বসিত হ'য়ে সহজেই—কিন্তু ঠিক সেই ত্যাগই চোখে দেখলে ওঠে ডরিয়ে—সুরু করে দোষারোপ। সুরেশ্বরকে ও জানত। সে খাঁটি মানুষ। ভগবানের জন্যে মন তার অত্যন্ত ব্যাকুল না হ'লে সে কখনই শুভার মনে ব্যথা দিত না। কারণ শুভাকে সে যে অত্যন্ত ভালোবাসত সবাই জানত। কিন্তু এ-বিচ্ছেদের দুঃখ একতরফা না-হওয়া সত্ত্বেও সুরেশ্বরের তরফের কথাটা ছায়াকে বোঝাবার ভাষা ও খুঁজে পেল না। অথচ মনে পড়ল ছায়ার নিজেরই আক্ষেপ: "সংসারকে যদি ভালোবাসতে পারতাম অসিদা—আহা।" দুঃখের মধ্যেও দেখা দেয় করুণ হাসি: লীলাময়ের লীলার অন্ত পাওয়া ভার!—নৈলে সংসারে যে-মেয়ে সব থেকেও অতৃপ্তিকেই সম্বল ক'রে চলল সে-ও কি না কাউকে সংসার-বিমুখ দেখলে ব্যথিত হয়—মনে প্রাণে চায় সে এই অসার্থকতারই তল্পি ব'য়ে চলুক, সংসারের গণ্ডীর মধ্যেই থাকুক আমরণ শুভার জন্যে, বেশ জোর দিয়েই বলে—ভগবানের জন্যে স্ত্রীকে ত্যাগ করা যদি না নির্মমতা হয় তবে নির্মমতা কার নাম?

অবশ্য অসিতের পূর্ণ সহানুভূতি ছিল সুরেশ্বরেরই সঙ্গে, শুভার সঙ্গে

নয়। শুভার দুঃখ ও বুঝত না এমন নয় অবশ্য, কিন্তু কী করা যাবে? বড়র জন্যে ছোটকে ছাড়তে হবেই তো।

ছায়ার সঙ্গে স্নেহের সেই ব্যবধান দিল দেখা। দুঃখ হয় এত। ও চুপ ক'রে থাকে। ছায়া উশখুশ করছে। একটু বাদে বলল: "কী অসিদা?"

"কিছু না তো?"

"কথা কচ্ছ না যে?"

অসিত একটু চুপ ক'রে থেকে বলে: "কী কথা কইব বলো? তুমি তো জানো।"

ছায়া একটু চুপ ক'রে থেকে বলে: "আমার অন্যায় হয়েছে অসিদা।"

"অন্যায়? কিসের?"

ছায়া মৃদুকণ্ঠে বলল: "সুরেশ্বর বাবু যেন সংসারেই থাকেন একথা তোমাকে কেন বলতে গেলাম মিথ্যে মিথ্যে?"

"মিথ্যে মিথ্যে কেন? কথাটা তোমার কাছে তো অক্ষরে অক্ষরে সত্যি। সংসার যখন ভগবানের চেয়ে বড় ব'লে মনে করো তুমি।"

ছায়া ক্লিষ্টকণ্ঠে বলে: "সেকথা আমি বলিনি ভাই।"

"বলো নি?"

"কী ক'রে বলব? ভগবান কী আমি জানিই না—অথচ বলব আর একটা কিছু তার চেয়ে বড়?"

"তাহ'লে সুরেশ্বর বাবুকে দুষলে কেন?"

ছায়া ব্যথিত নেত্রে ওর দিকে খানিকক্ষণ চেয়ে রইল, তার পরে শুধু বলল: "বুঝতে পারো না—কেন?"

অসিত উত্তর দিল না।

"কী ভাবছ?"

"থাক গে।"

"বল্‌বে না?"

"ব'লে কী হবে ছায়া? তুমি বুঝবে না।" ওর মনে গুনগুনিয়ে উঠল ওর এক প্রিয় কবি বন্ধুর To the Lesser Love ব'লে একটি কবিতার কয়েকটি চরণ তার স্ত্রীর উদ্দেশে লেখা:

I have left yours eyes and sought
The calm eyes of the divine
Once upon a time I thought
Yours alone were meant for mine···

When the white stars gleam above
Growing with my life at one
I am sorry for you, Love!
Lesser Love, now dead and done!

এই সময়ে দেবদা এসে হাজির মহাত্মা গান্ধির চিঠি নিয়ে। তিনি পেশোয়ারে—কাজেই কাশ্মীর থেকে পেশোয়ারেই যাওয়া স্থির। অসিত বলল: "বেশ।"

কিন্তু ওর ভালো লাগছিল না এ সব প্ল্যান।

সেদিন সন্ধ্যায় অসিত একলাই বেরিয়ে পড়ল বজরা থেকে। ঝিলমের ধার দিয়ে চলল বেড়াতে উদাসভাবে। প্রতিদিন ছায়াকে ডেকে নিত—অর্থাৎ যেদিন শিকারায় বেরুনো না হত। তখনো প্রীতি সঙ্গ নিত ওদের কিন্তু পদব্রজের ও বড় পক্ষপাতী ছিল না। তাই সান্ধ্য ভ্রমণে অসিত যখন বেরুত ওর সঙ্গে আসত হয় দেবদা না হয় ছায়া। সেদিন সকালে স্থির হয়েছিল যে ছায়াকে অসিত ডেকে নেবে একটু হেঁটে বেড়াতে। কারণ ছায়া হেঁটে বেড়াতে ভালোবাসত—বিশেষ সুন্দর

রাস্তায়। কিন্তু যখন অসিত বেরুল ও ছায়াকে ডাকল না ইচ্ছে ক'রেই। বজরার তক্তা বেয়ে পাড়ে নামতেই বজরার ভিতর থেকে ছায়ার ডাক কানে এল: "একটু দাঁড়াও ভাই লক্ষ্মীটি—আমি এলাম ব'লে।"

কিন্তু অসিত কান দিল না। হন্ হন্ ক'রে চলল ডান দিকে ঝিলমের পাড় দিয়ে। মনে হ'ল একবার ছায়া দুঃখ পাবে। কিন্তু তবু পারল না। চলল ওকে ফেলে। কী? অভিমান? কক্ষনো না। এম্‌নিই। সব সময়েই কি সবার সঙ্গ ভালো লাগে? "সবার" কথাটার 'পরে একটু বেশি ঝোঁক দিল। হায় রে হৃদয়!

ব্যাপারটা ছিল আসলে ক্ষোভের—একথা অসিত আজ বোঝে স্পষ্ট ক'রে। সে সময়ে পুরো বুঝতে পারে নি—না, পারে নি নয়—চায় নি। ক্ষোভের স্ফুলিঙ্গকে ফুঁ দিয়ে দিয়ে গনগনে আগুন ক'রে তুলতেই চাইত সে সময়ে।

কিন্তু তবু ছায়ার ম্লান মুখখানি যতই মনে পড়ে সর্পিল ঝিলমের পাড় দিয়ে একেবেঁকে চলতে চলতে ততই গ্লানি জ'মে ওঠে। ও প্রসাধন সেরে বাইরে এসে দেখবে অসিত নেই—আর তখন কী রকম দুঃখ পাবে! হয়ত ও কিছু বলতে চেয়েছিল, তাই বলেছিল দাঁড়াও। কেন দাঁড়াল না? একবার মনে হ'ল ফেরে। কিন্তু না, হয়ত ও শিকারায় বেরিয়ে গেছে প্রীতির সঙ্গে, কি দেবদার সঙ্গে গেছে বাজারে কি আর কোথাও। There is a tide in the affairs of heart—যে-মুহূর্তে মেঘ ঠিক কেটেছিল সে পেরিয়ে গেছে। এখন শুভদৃষ্টি হবে কি ক'রে যখন আঁধার এসেছে ফের ঘনিয়ে?

কিন্তু মন যত ওর কালো হ'য়ে আসতে থাকে, যতই ও বুঝতে পারে ও অকারণ ছায়াকে আঘাত করতে চেয়েছে তার স্বাধীন মতামতে

জন্যে, যতই ওর মন ওকে বলে ছায়ার পক্ষে সুরেশ্বরের বৈরাগ্য একটু নির্মম মনে না হওয়াই অস্বাভাবিক ততই ও আরো সমর্থন করে সুরেশ্বরকে। যদি কোন দেশসেবক দেশের জন্যে জেলে যায় কি ঘর ছাড়ে, প্রিয়জনের কাছ থেকে চিরবিদায় নিয়ে হ'তে হয় চিরপ্রবাসী তাহ'লেও কই কেউ তো বলে না যে সেটা নির্মমতা। কেন বলে না? কারণ দেশ যে গৃহসুখ, প্রিয়সুখের চেয়ে বড়, এ-চেতনা জাতীয় মনে আজ চারিয়ে গেছে। কিন্তু ভগবানের ডাক এত কম লোকের হৃদয়ে প্রবল-ভাবে বেজে ওঠে, ভগবানের অস্তিত্ব এত ছায়াময়, এককথায় ঘরছাড়া পারমার্থিকতার ছন্দের সঙ্গে আমাদের ঘরোয়া আর্থিকতার ছন্দের এতই বেশি গরমিল যে ভগবানের জন্যে গৃহত্যাগ মনে হয় উদ্ভট। ঐতিহাসিক দুএকটা চরিত্রের প্রিয়জনত্যাগ প'ড়ে গেল ক্লাসিকের কোঠায় অর্থাৎ নমস্য, প্রশস্য নয়—স্মরণীয়, বরণীয় নয়। অসিতের মনে পড়ে ওকেও কি ওর আত্মীয় স্বজন বন্ধুবান্ধব সবাই একবাক্যে তিরস্কার করে নি যখন ও সংসার ত্যাগ ক'রে গুরুদেবের শরণ নেয়? বলে নি পলাতক রণছোড়—আরও কত কী জঘন্য কুৎসা রটায় নি? সে সময়ে ও কী গভীর বেদনাই না পেয়েছিল এই সব রটনায়! আজ সে সব অনেকে ভুলে গিয়েছে তাই ও কলকাতায় ফিরে এলে ওকে আদর যত্নই করে। কিন্তু তাই ব'লে একথা তো আর সত্য নয় যে গৃহীরা কোনো দিন চেয়েছে তাদের আপন জন অসিতের ম'ত হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলে নিরুদ্দেশ যাত্রা করুক ভগবানের নামে। ভগবানকে নিয়ে ওঁ নমো নমো করা চলে, কিন্তু বাড়াবাড়ি করার নাম পাগলামি না হয় নির্মমতা—এই মনোভাবই বিশ্বজনীন। তবে? তবে ছায়ার কী দোষ যদি শুভার ম্লান মুখ দেখে ওর হৃদয়ে ব্যথা বেজে ওঠে, মনে হয় সুরেশ্বর বিবাহিতা স্ত্রীকে ত্যাগ ক'রে অনাচারের দোষে দোষী? যা সবারই মনে হয়, ও শুধু মুখ ফুটে বলেছে। এ ওর স্বভাব: কোনো কথা ও লুকোয় না,

করে না অসত্য আচরণ। ওই দোষের জন্যেই কি অসিত ওকে শাস্তি দিল আজ? ওর মনে পড়ে সেদিনই দুপুরে ছায়া ওর ঘরে এসেছিল ফের হঠাৎ। কেন এসেছিল ও কি টের পায় নি? কিছু একটা বলতেই তো এসেছিল—কেন সুরেশ্বরের নির্মমতা সম্বন্ধে মত দিয়েছিল ওভাবে। কিন্তু ও আমল দেয় নি তাকে। মনে পড়ে ঘরে ঢুকেই ছায়া ওর কাঁধের কাছে এসে দাঁড়িয়েছিল বাঁদিকে। এভাবে দাঁড়ালেই অসিত ওকে আদর ক'রে কাছে টেনে নিত—ছায়াও ওর কণ্ঠবেষ্টন ক'রে ওর মাথার 'পরে রাখত ওর ছোট্ট চিবুক। ওর আদর কাড়বার এ ভঙ্গি জানত—রাজু লীলা তো প্রায়ই ঠাট্টা করত ওকে "আদুরী" ব'লে এই সব কারণেই। ও ছিল সেই জাতের ফুল যাকে অতি সন্তর্পণে অন্দরের ফুলদানি রাখতে হয়—নৈলে দেখতে দেখতে যায় মিইয়ে। কিন্তু অসিত সব জেনে শুনেও ওকে কাছে ডাকে নি—সরসর করে চিঠি লিখতে লিখতেই বলল: চিঠিটা জরুরি।"

তবু ছায়া দাঁড়িয়ে ছিল খানিকক্ষণ। তখনো সময় ছিল ভুল শোধরাবার। কিন্তু অসিত চলেছিল লিখেই ওর "জরুরি" চিঠি।

"তাহলে এখন যাই অসিদা?"

অসিত মুখ না তুলেই ঘাড় নাড়ল। ও মাথা ঝাঁকিয়ে চ'লে গেল দৌড়ে। হঠাৎ চোখে জল এলে ও এইভাবে দৌড়ে পালিয়ে যেত—মাথাটা একটু যেন ঝাঁকি দিয়ে।

ঝিলমের ম্লানাভ সর্পিল জলের দিকে চেয়ে অসিতের কেবলই মনে জাগে সেই একই প্রশ্ন: বার বার ও পণ নেয় এ মায়াময়ীকে দুঃখ দেবে না তবু বার বারই দুঃখ না দিয়ে পারে না কেন? বিশেষ যখন ও জানে যে অসিতের কাছ থেকে ও কোনো আঘাত পেলে কারুর কাছেই নালিশ জানাবে না, যদিও অন্যের কাছে দুঃখ পেলে আপীল জানাত অসিতকে—কেবল অসিতকেই।

আজ অসিত একটু স্পষ্ট দেখতে পায় কেন এমন করত। দেখতে পায় নিজের নানা অশুদ্ধি, নিষ্ঠার অভাব, ভক্তির দৈন্য। কিন্তু নিজের এ দোষের জন্যে ও দায়িক করত মনে মনে ছায়াকেই। ছায়াকে অত্যধিক স্নেহ ক'রেই তো ও বাঁধা পড়ছে। অন্য কত বন্ধনই তো ও কাটিয়েছে অথচ এ-বন্ধন কাটাতে এত ব্যথা বাজে কেন? জানত অবশ্য যে কোনো বন্ধনই ওকে বাঁধতে পারবে না—ছায়া ধরেছিল ঠিকই—কিন্তু তবু দেরি তো হ'য়ে যায়, শক্তির বৃথা ক্ষয় তো হয় এই সব গড়িমসি ক'রেই। তাই ওর ক্ষোভ হ'ত এই একরত্তি মেয়েটার পরে। ছায়া কেন পারে খানিকক্ষণের জন্যেও ওর মন ভুলোতে? ওরই জন্যে তো ভাগবত লক্ষ্যে অসিতের অভিনিবেশ শিথিল হ'য়ে আসে? রাগ ক'রে ওর প্রতি মনটা কঠিন করতে চেয়েই বলত—ছায়া ভগবৎদ্রোহী, নাস্তিক, অবুঝ আরও কত কী। ভাবটা এই যে এহেন মেয়ের সঙ্গ ওর পক্ষে শুভ হ'তে পারে না।

অনুতাপ আনে আলো: তাই অসিত দেখতে পায় নিজের অপরাধ। মনে পড়ে ওর কণ্ঠ: "তাহ'লে এখন যাই অসিদা?"—আর চোখের সামনে ঝিলমের দৃশ্য ঝাপসা হয়ে আসে! কিন্তু এখন উপায় কী? ওকে পাবে কোথায়?

এমন সময়ে হঠাৎ—ও কে! ওর বুকের রক্ত চঞ্চল হ'য়ে ওঠে। দাঁড়ানোর এ-ভঙ্গি তো ভুল হবার নয়। আর দু পা যেতেই চোখাচোখি হ'য়ে গেল। একটা কাঠের পৈঠের উপর ছায়া ব'সে পাড়ের দিকেই চেয়ে —কার জন্যে অসিত কি জানে না?

শ্রীনগরে ঝিলমের গতি ঠিক সাপের মতন। অনেক সময় প্রায় নানাভাবে এঁকে বেঁকে হঠাৎ এসে মেলে—প্রায় যেখান থেকে রওনা হয়েছে সেখানকার কাছেই। তখন একটি শিকারা ক'রে বজরায় ফেরা যায় চট ক'রে। রুডল্‌ফ্ ওদের এসব শর্টকাটের ভঙ্গি বুঝিয়ে দিত

নানা ভাবে ছায়া তাই মাঝে মাঝে শিকারা ক'রে অসিতের পিছু নিত—যখন অসিত একটু বেশি হাঁটতে চাইত। অনেক ঘুরে যখন অসিত বজরার কাছ বরাবর ফিরে এসেছে অপর পারে ছায়া ওকে টুক্ ক'রে নিয়ে আসত। আজ অবশ্য ও জানত না যে অসিতের দেখা পাবেই ঝিলমের পাড়ে—কারণ অসিত ঝিলমের দিক ছেড়ে শহরের দিকে চ'লে গেলে দেখা হ'তে পারে না ও জানত। তবু ও বেরিয়েছিল যদি দেখা হয়—হঠাৎ। শিকারাটা অদূরে, ছায়া পাড়ে একটা উইলো গাছের নিচে ব'সে—একেবারে একা। শিকারায় ছিল কেবল ওদের পুরোনো চাকর গঙ্গাধর যে ওকে মানুষ করেছিল। সে চেঁচিয়ে উঠল: "হু-ই দিদিমণি সাধুদাদা গো—হোথাকে !"

ছায়া চমকে ওঠে। ফিরে দাঁড়াতেই অসিতের সঙ্গে চোখোচোখি। তার পরেই উঠে দাঁড়াল পৈঠাটার উপরে।

অসিত গঙ্গাধরকে বল্‌ল: "তুই শিকারা নিয়ে ফিরে যা—আমরা ঘণ্টাখানেক বাদে ফিরছি।"

গঙ্গাধর করুণনেত্রে দিদিমণি "বেচারি"র দিকে একবার তাকিয়ে মাঝিকে হুকুম দিল ফিরতে। কিন্তু শিকারা ঘুরবার মুখে বলল চেঁচিয়ে "হু-ই সাধুদাদা গো! আজ একটু সকাল সকাল ফিরবা—দিদিমণি দুপুর বেলা খায় নি—মা বক্‌তেছিল।"

ছায়া মুখ ফিরিয়ে রোষ কটাক্ষে বলে: "আচ্ছা, আচ্ছা হয়েছে।"

ওর বুকের মধ্যে কেমন যেন ক'রে ওঠে। আহা, কিছু খায় নি মাঝে মাঝে অসিত উপবাস করত—আশ্রমে আসার আগেও। দেবদা[illegible] খাওয়া দাওয়ার চাল ছিল নবাবি গোছের তাই ওকে থেকে থেকে আপত্তি করতে হ'ত আরো বেশি করে। ও সময়ে সময়ে দুপুরবেল[illegible]

খাওয়ার ঘরের দিকে ভিড়োতোই না। সেদিন ওর মনটাও তো খারাপ ছিল একটু, কাজেই ও নিজের ঘরে আশ্রয় নিয়েছিল—নির্জনতার আশায়। প্রতিমা ওকে ডাকতে এসেছিল কিন্তু দেবদা এসে তাকে সরিয়ে নিয়ে যায়। ওদের মধ্যে কেবল দেবদাই বুঝত অসিতের ভাবগতিক, জানত বেশি আদরের পীড়াপীড়িও ওর সয় না।

কাজেই অসিত জানত না দুপুরে ছায়া খেয়েছে কি না। আহা, উপবাসী মেয়ে ওর কাছে এসেছিল কিছু বলতে ও তাকে বলবার সুযোগ পর্যন্ত দেয় নি!

তাড়াতাড়ি ও ছায়ার কাছে গিয়ে ওর কাঁধে হাত রেখে বলল: "সে কি ছায়া! খাওনি কেন আজ?"

ছায়া মুখ নিচু ক'রে ওর আঁচলের একটি প্রান্ত ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে বাঁধতে লাগল ওর তর্জনীর চারদিকে। বলল: "এম্‌নি।"

"এম্‌নি মানে? শরীর খারাপ হয় নি?"

"শরীর খারাপ হ'তে যাবে কেন?"

"তবে?"

ছায়া উত্তর দিল না। উল্টো দিকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে আঁচলের প্রান্তটা আঙুল থেকে খোলে।

অসিত একটু হাসি টেনে আনল জোর ক'রে, বলল: "কী হয়েছে আঙুলে? কেটে গেছে?"

"দূর্।" আঁচল ও ফেলে দিয়ে ঈষৎ হাসল নামমাত্র।

"তবে?"

"তবে কি?"

"দুপুরে খাওনি কেন?"

ওর ঠোঁট দুখানি থর থর ক'রে কেঁপে উঠল। ওর অভ্যস্ত ভঙ্গিতে দাঁতে ঠোঁট চেপে রইল দাঁড়িয়ে।

সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। একটা আবছা কুয়াশার উত্তরীয় ভাসছে ঝিলমের জলের বুকে—জল ছাড়িয়ে একটু। ওদিকে ঠিক সামনে একটা শিখরের 'পরে পড়েছে অস্ত সূর্যের সোনার আভা। হঠাৎ সেই আভার একটা টুকরো গাছের পাতার ফাঁকে দিয়ে এসে পড়ল ছায়ার মুখে। ঘাটের ত্রিসীমানায় জনমানব নেই। এদিকটা একটু নির্জন, সহর থেকে অনেক দূরে কি না। শিকারাও ক্বচিৎ দেখা যায় বজরা তো একটি কাছাকাছি।

হঠাৎ ডেকে উঠল গাছে—বুলবুল!

অসিত স্নিগ্ধ কণ্ঠে বলল: "শুনছ? বুলবুল।"

ছায়া ম্লান হাসল। ও ভেবেছে ওকেই বুঝি ডাকছে অসিত। কাশ্মীরে ওর বুলবুল নামটারই চল হ'য়ে গিয়েছিল—আরো রুডল্ফ ও কিষণচাঁদের দেখাদেখি। এ নামটা ছায়া পছন্দ করত না ব'লে ওকে রাগাতে রাজু ও লীনা আরো বেশি বেশি ক'রে ডাকত "তারপর বুলবুলদি" ব'লে। অসিত আজ সত্যি ওকে ডাকে নি—বুলবুল শিস দিচ্ছে এই কথাটাই বলতে চেয়েছিল। কিন্তু ছায়া ভাবল অসিত ওকে ঠাট্টা করছে। তাই মুখ ওর আরো ম্লান দেখাল। "এ সময়েও ঠাট্টা?"

অসিত বুঝল, বলল শুধু কাঁধে হাত রেখে: "না ঠাট্টা করি নি ভাই তুমি দুপুরে খাওনি তবু ঠাট্টা করব এত নির্মম আমাকে ভাবতে পারলে দিদি?"

ছায়ার চোখ ছলছল ক'রে উঠল, তাই আরো চোখ নিচু ক'রে রইল. শুধু বলল: "তবে?"

"ঐ যে একটা বুলবুল শিস দিচ্ছে ওপারের ঐ বীচ গাছটায় শুনছ না?"

এখানে ঝিলম পরিসরে খুবই ছোট—প্রায় কেম্ব্রিজের ক্যাম নদীর মতন। ছায়া ওপারে বীচ গাছটার পানে তাকিয়ে বলল: "কই?"

বুলবুল তখন থেমে গেছে। অসিত ক্ষুণ্ণ বোধ করে—ঐ—ঐ—শুনতে পাচ্ছ ?"

ছায়া হরিণশিশুর মতন উৎকর্ণ হ'য়ে থাকে—না ফের থেমে গেছে—তার পরেই ঐ ফের—

"কী সুন্দর অসিদা! এরই নাম বুলবুল যার এত নাম ডাক গজলে ?"

"তুমি কি শোনো নি এর ডাক আগে ?"

"না তো। কত চেষ্টা করেছি—"

অসিত হাসে : "বুলবুলের অমনি ধারা। সাধলে সে গায় না তো।"

ছায়া এবার চোখ তুলল, কিন্তু এক পলক, ফের চোখ নিচু করল।

"ঐ—উড়ে গেল—যাঃ !"

শেষে আর একটা ঝঙ্কার দিয়ে ওপরে বুলবুলটা উড়ে অদৃশ্য হ'য়ে গেল। ছায়া কিন্তু এবার তাকালো না ওদিকে। মুখ নিচু ক'রেই দাঁড়িয়ে থাকে।

অসিত ওকে কাছে টেনে নেয় : "রাগ হয়েছে নয়নতারা ?"

আর ও পারল না নয়নতারা ডাক শুনে। এই নামটিই ছিল ওর সবচেয়ে প্রিয়। ওর বুকে মুখ লুকিয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে সেই কান্না—চিরপরিচিত অথচ চির-নূতন!

অসিত ওকে সন্তর্পণে বসালো পৈঠের উপরেই। তারপরে নিজে ওর পাশে ব'সে অশ্রুময়ীকে টেনে নিল বাহুবন্ধনে। কিছু বলল না কিন্তু।

"আর কাঁদে না মণিমালা !"

ছায়া চোখ মুছে মুখ তুলল।

"তাকাবে না আমার দিকে ?"

ও একটিবার মাত্র তাকালো--তারপরেই দৃষ্টি সামনে দিকে—সেই তুষার শিখরে।

সূর্য নেমেছে পাটে। মাথার উপরের ছাইচাপা আকাশের মধ্যে থেকেও সোনার আগুন জলে ওঠে।...কাশ্মীরের আকাশ বড় মেজাজি··· এই এখানে আগুন, ঐ ওখানে। দেখতে দেখতে এক রাশ কোদালে মেঘ দোয়ার ধরল অগ্নিকীর্তনে।

ধীরে ধীরে কিরণ-কীর্তনের রেশ যায় মিলিয়ে—কেবল ঝিলমের বুকে এক টুকরো অন্তিম আভা লেগে, আর সেই আভা ঠিকরে এসে পড়েছে ছায়ার মুখে। অসিত চেয়ে দেখে এক দৃষ্টে।

কী আশ্চর্য! মুখে ওর বিষাদ কই? না—প্রফুল্লতা নয়—ম্লানমুখ···তবু বিষণ্ণ বলা চলে না তো আর। ও কি পেয়েছে ক্ষতিপূরণ? অথচ অসিত ওকে কী বা দিয়েছে? ওর আত্মগ্লানির কথা তো বলে নি একবারও। শুধু যে ওর বুকে মুখ লুকিয়ে একটু কাঁদতে পেরেছে তাইতেই ও খুসি। এমন আশ্চর্য মেয়ে ও কবে দেখেছে—দাবি করতে যে জানে না—কিম্বা শেখে নি এখনো। ভুলেও কি কোনোদিন ও অসিতকে একটুকু ভর্ৎসনা করেছে?—বরং অসিত নিজেকে তিরস্কার করলে মুখ চেপে ধরেছে। অথচ বার বার কত দুঃখই না পেয়েছে বেচারি মেয়ে! কিন্তু একটু আদর পেতে না পেতে গেছে সব বেদনা ভুলে। শিশু নয়?

অসিত মুগ্ধ নেত্রে চেয়ে চেয়ে দেখে। কী সুন্দর মুখখানি! শ্রী ছিল ওর মুখে বরাবরই কিন্তু এত সুন্দর ওকে এর আগে অসিতের কই লাগে নি তো। কালো? কিন্তু কালোয় আলো নেই বলে কে?—শুধু যার চোখ নেই সে।

অসিত ওর মাথাটি সন্তর্পণে টেনে নেয়—বাঁ কাঁধের ওপরে রাখে। ও মুখ ফিরিয়ে ডুবিয়ে রাখে ওর কপালটা অসিতের বুকে। একেবারে

নিশ্চুপ। শুধু ধীরছন্দে নিশ্বাস পড়ছে সমতালে। থেকে থেকে একটা দীর্ঘশ্বাস···তাও এত শান্ত...ভীরু!

*　　　*　　　*　　　*

কাছের শিবমন্দিরে বেজে উঠল: পোঁ—

ছায়া মুখ তুলল: "কী সুন্দর!"

"কী?"

"শাঁক।"

"সে কি ছায়া? মন্দিরের শাঁক যে!"

ব'লেই ও ভুল বুঝল...কিন্তু তখন আর উপায় কি? বলা কথা হ'ল ছোঁড়া তীর .....ফেরায় কে?

ছায়া ছোট্ট একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে। তারপর একটু সরে বসে।

"ওদিকে যে জল! কাছে আয়।"

কিন্তু বৃথা। দেহটা আসে কাছে··

কিন্তু মনটা ফের ফ'স্কে গেছে। কেন এমন হয়? অথচ একটু আগেই মনে হয়েছে ওদের মধ্যে নেই এতটুকু ব্যবধান। কিন্তু এক্ষনি এ কী ঘ'টে গেল? স্বচ্ছ নীলিমার নীল রঙ ঝাপসা হ'ল কোন্ মেঘে?

*　　　*　　　*　　　*

অসিতই নিস্তব্ধতা ভাঙল—জোর ক'রেই:

"কী ভাবছ ছায়া?"

"কী আর এমন?" কী-তে ছায়ার সেই সুন্দর বিষণ্ণ মিড়টি বেজে ওঠে।

অসিত ওর চিবুক ধ'রে মুখ তুলে ধরে।

"এ কী?"

চোখের জল আর বাধা মানে না।

অসিতের বুকের মধ্যে এবার গভীর আত্মগ্লানি জেগে ওঠে .....

ফুলের মত নরম যার মন তাকে দুঃখ দেয় ও কী ব'লে ? ছি।

"শোনো মণি—লক্ষ্মী মেয়ে," বলে অসিত ক্লিষ্ট কণ্ঠে, "তোমার সঙ্গে দেখা হ'ল এখানে, ভালোই হ'ল। সুরেশ্বর সম্বন্ধে তোমার যা যা মনে হয়েছে তোমার পক্ষে সেসব মনে হওয়া অস্বাভাবিক নয়। আজ সকালে আমি এজন্যে অকারণ তোমার পরে বিরূপ হয়েছি। এজন্যে আমি ভারি দুঃখ পেয়েছি। তুমি আমাকে এবারটি ক্ষমা করো—আর কক্ষনো এমন অবুঝ হব না আমি—"

ছায়া ওর মুখ চেপে ধরল ব্যস্ত হ'য়েঃ "ছি ছি এমন কথা বলে ?"

"না ব'লে করি কী বলো ? তোমাকে দুঃখ দেই যে বারবারই। অথচ বিশ্বাস করো, দুঃখ দিতে চাই না।"

"জানি।"

"কী জানো ?"

"যে— "ছায়া কথা খুঁজে পায় না—"তুমি যা বললে।"

"কী বললাম ?"

"যাও।"

"যাই কী ক'রে বলো দুঃখ দিই যখন ফিরে ফিরে ? কিন্তু এর একটা উপায় করতেই হবে ছায়া—তোমাকেই।"

"আমি করব উপায় ?" ছায়া কৌতুকভরা হাসি হাসে।

"নৈলে আমার অপরাধ যে বেড়েই চলে ভাই।"

"ছি ছি অসিদা ! কী বলছ তুমি ?"

অসিত চুপ ক'রে শুনতে চায় আরো। ছায়ার আরো যেন বেধে যায়। বলেঃ "আর বোলো না ওসব।"

"কী সব ?"

"যাও।"

"একটা বোঝাপড়া আজ না হ'লেই নয়।"

ছায়া হেসে ফেলে ফের, ওর মুখের মেঘ অনেকটা কেটে এসেছে, বলে : "তোমার তো দোষ নয় অসিদা। আমার—"

"তোমার দোষ ?"

মেয়ে মিথ্যা বলবে না তো, বলে : "না আমারও দোষ দেখতে পাই নে! অথচ—"

"কী!"

"কী—তা যদি বুঝতেই পারব ভাই তা'হলে এমনটা হবে কেন ?"

"কেমন ?"

"কেন অমন করো ভাই—যাও। আমি কি বলতে পারি গুছিয়ে কোন কথা ? জানো তো সবই। তবু—"

"তবু কী ?"

ছায়া ভাবে একটু পরে বলে : "মনে হয়—কিন্তু না—কী করব ভাই, সত্যিই বুঝতে পারি না। তুমি বুঝিয়ে দাও।"

অসিত মুগ্ধ হয় ওর শিশুসরল নির্ভরে, বলে আদর ক'রে : "কী বুঝিয়ে দেব আগে সেটাই বলো ?"

"কী করলে ঠিক হয়।"

"তার মানে ?"

"কী জানি।" ও মুখ নিচু ক'রে ফের আঙুলে আঁচল জড়ায় একমনে তার পরে তাকায় হঠাৎ ওর মুখের পানে। অসিত তখন সামনে ঝিলমের দিকে চেয়ে অন্যমনস্ক।

"অসিদা।"

"কী ছায়া!"

"না। ডাকো—নয়নতারা!"

অসিত ওর কণ্ঠবেষ্টন ক'রে কাছে টেনে এনে আদর ক'রে বলে : "উঁশ। মেয়ের আদরে অরুচি নেই।"

ছায়া চলে যায়, বলে : "আদরে আবার না কি কারুর অরুচি হয়।"

"কারুর আদরেই হয় না।"

"যাও। তুমি ভারি দুষ্টু। বেশ জানো—"

"থামলি যে ?"

"না বলব না।"

"কী বলবি না সেটা অন্ততঃ বল্।"

ছায়া হাসে : "যেন জানো না। আদর বলতে বুঝি বোঝায় যার তার আদর ?"

এমন সরল সাড়া অসিত জীবনে কবার শুনেছে! বলে : "তা তো বুঝি নয়নতারা, কিন্তু—"

"কিন্তু আবার কী ? এখানে কিন্তু নেই।"

"আছে। আমি আদরই তো শুধু করি না—কষ্টও দেই যে তোকে।"

ও ঘাড় নাড়ে বিজ্ঞভাবে : "না। কষ্ট তুমি দাও।"

"তবে ?"

"কী জানি ? কেমন যেন জট পাকিয়ে যায় কথায় কথায়। কেন যায় অসিদা ?

"বুঝি না ভাই।"

"তুমি বোঝো না ?" বলে ও চোখ ডাগর করে।

"বাপী বলে তোমার মধ্যে জ্ঞান যে কত খুব কম লোকেই জানে।"

"আর বুলবুলের সম্বন্ধে কী বলে ? যে তার মধ্যে অভিমান যে কত খুব কম লোকেই জানে।"

"ফে—র ?"

"ফের কী !" অসিত আরো আদর করে ওকে "অভিমানে টইটুম্বুর নোস তুই ?"

"হল'ই বা। অভিমান তো আর জ্ঞান নয়।"

"কে বললে?"

"আহা! আমি অত ছেলেমানুষ নই তা ব'লে।—কী দেখছ?"

"যা বড় বেশি দেখা যায় না রে—দিনদুনিয়ার।"

"কী?"

"কী জানি।"

ছায়া হেসে ওঠে…অসিত যোগ দেয়।

* * * *

খানিকক্ষণ কেউই কথা কয় না। অসিতের মনের মধ্যে সব তাপ গ'লে আলো হ'য়ে গেছে…স্নিগ্ধ তরল আলো। আকাশে রাঙা আলো নিভে এসেছে…এক দুই ক'রে ফুটছে তারা এখানে ওখানে। ও আকাশের দিকে চেয়ে থাকে একদৃষ্টে। ছায়া ওর কোলে প্রায় এলিয়ে শুয়ে। খানিক চেয়ে থাকে সেও আকাশের দিকে। তারপর ডান পাশে শঙ্করাচার্য পাহাড়ের মন্দিরটির পানে। তারপর ফিরে আসে ওর দৃষ্টি অসিতেরই মুখে। অসিত তখনো নিবিষ্টভাবে আকাশের দিকে চেয়ে।

"আচ্ছা। অসিদা!"

অসিত তাকায় ওর দিকে—ওর এলো চুলে হাত বুলোয়।

"আচ্ছা তারারা কী অসিদা? এক একটা জগৎ!"

"হুঁ।"

"জগৎ যদি—তাহ'লে ওখানে মানুষ আছে?"

"থাকলে ঠেকায় কে?"

"তারা হাসে, কাঁদে, গান গায়?"

অসিত ছায়ার সুরে বলে ফের: "কী জানি।"

"যা—ও। তুমি আমাকে একটুও গ্রাহ্য করো না—" ব'লে ছায়া রেগে

উঠে বসতে যায়। অসিত ওকে চেপে ধরে, ইচ্ছা হ'ল বলে কথাটা সত্য হ'লে ও কতটা হাল্কা বোধ করত।

ছায়া অনুযোগের সুরে বলে: "অত চুপ ক'রে থাকলে কী করব আমি বলো তো?"

অসিত হাসে: "কী বলি বল্ দেখি? তারালোকে মানুষ আছে কি না তারা ছায়া দেবীর মতন সুন্দর গান গায় কি না—অপরূপ হাসে কাঁদে কি না—

"অমন ঠাট্টা করলে কথাই কইব না তোমার সঙ্গে। আমি কেন জিজ্ঞাসা করছিলাম ওকথা যেন তুমি জানো না?"

"কেন?"

"কেন এমন হয়?" ওর কণ্ঠের সুরে হঠাৎ ওর অত্যন্ত শান্ত দৃ ফুটে ওঠে, বলে: "না অসিদা, এড়িয়ে যেতে পারবে না। আমি জানতে চাই—বুঝতে চাই। কেন মানুষ ভুল বোঝে এত বেশি। তারাদের মানুষরাও কি ভুল বোঝে?"

"নিজের কথাই জানি না—তা তারাদের মানুষ?"

ও ঘাড় নাড়ে নৈশ্চিত্যের ভঙ্গিমায়: "জানো। কেবল—"

"কেবল?"

"ধরা দাও না।"

"কে বলল?"

"বাপী।"

অসিতের মনটা ওঠে দুলে। কী ভক্তিই করে ও ওর বাপীকে। ভক্তি যে ওর পক্ষে সহজ...

* * *

"এত কী ভাবো অসিদা?"

অসিত ওর দিকে তাকায় একটু চমকে।

'বাবা রে বাবা! এত চমকাতেও পারো।—এরকম করলে না কি
মানুষ কোনো কথা জিজ্ঞাসা করতে পারে।"

"কি কথা জিজ্ঞাসা করছিলি? সত্যি ভুলে গেছি দিদি—রাগ
করিস নি!"

"সেইটে পারি নে বলেই তো রাগ হয় নিজের ওপর।"

অসিত হেসে বলে: "অথচ নয়নতারার আমার ধারণা উনি
একেবারে মুখচোরা—কথাটি কইতে পারেন না।"

"মুখচোরা আমি বলিনি অসিদা। তবে কথা যে গুছিয়ে বলতে
পারি না এ তো মানতেই হবে।"

"যদি না মানি?"

"না শোনো অসিদা—ঐরকম ক'রে তুমি আমাকে আরো ঘুলিয়ে
দাও। একটা কথা তোমাকে আজ বলতেই হবে। বলবে ঠিক
করে?"

"তোকেও যদি বেঠিক বলব মণি, তবে ঠিক কথা ভাঙিয়ে খাব
কার দোরে শুনি?"

"তাহ'লে বলো—আমার ওপর কেন এত রাগ করো তুমি?"

অসিত ওকে আদর ক'রে বলে হেসে: "তোর ওপর যদি রাগ সত্যি
করতে পারতাম রে তাহ'লে হয়ত ভালোই হ'ত তোর দিক দিয়ে।"

"থেকে থেকে তুমি আবার এ যে কী এক ধরণের সুর ধরো!"

"কী এক ধরণের সুর নয় নয়নতারা! আমার বলার উদ্দেশ্য ছিল—
রাগ যদি খুব বেশি হ'ত তাহ'লে ছাড়াছাড়ি হ'ত সহজে—হানাহানি
হওয়াই হ'ত তখন কঠিন।"

"ছাড়াছাড়ি কি হানাহানির চেয়ে ভালো?"

"ভালো নয়? বস্তুত তুই তো দুঃখ পাওয়া থেকে বেঁচে যেতিস
রোজ রোজ।

ছায়ার কণ্ঠস্বর গাঢ় হ'য়ে আসে হঠাৎ—"ছি—অমন কথা কেন বলো ভাই? আমার বড় দুঃখ হয়।"

অসিত কোমলকণ্ঠে বলে: "ঐ দেখ দিদি—দুঃখ দিতে না চাইলেও কেমন করে তোকে আমি দুঃখ দেই।"

ছায়া বলে আস্তে আস্তে: "দুঃখ তো তুমি দাও না ভাই।"

"তবে কে দেয়?"

"কেউ না। দুঃখ পাওয়া আমার স্বভাব।"

"আর আমার স্বভাব? দুঃখ না দিয়েও দুঃখ পাওয়ানো?"

"আচ্ছা তুমি এত ক্ষেপাতে শিখলে কোথেকে অসিদা?—জানো তোমার জন্যে সবচেয়ে মন কেমন করে কখন? যখন অনেক দিন তোমার ক্ষেপানো না শুনি। মানে যখন তুমি থাকো আশ্রমে একলাটি।"

অসিত হাসে: "এবার যে নয়নতারা মনের কথা ব'লে ফেললেন?"

"আহা যেন জানো না।"

"না জানালে জানব কোথেকে।"

"তবে তুমি কিসের যোগী? বেশ হয়েছে" ব'লে হঠাৎ খুশি হ'য়ে: "বাপীকে গিয়ে আজ বলব—দেখো।"

অসিত অবাক হ'য়ে বলে: "বাপীকে কি বলবি রে আবার?"

"বলব: ভুল বাপী, তোমার সব ভুল। অসিদা আমাদেরই দলে।"

অসিত আশ্চর্য হয়ে বলে: "দেবদা কি বলে না কি যে আমি দল-ছাড়া উদ্ভট একটা কিছু?"

"আহা উদ্ভট কেন হ'তে যাবে?—কিন্তু ঐ দেখ," ব'লে ও হঠাৎ "বাপী যে তোমাকে একথা বলতে পই পই ক'রে মানা ক'রে দিয়েছিল। কী হবে?"

"কী?"

"যে সে জানে—তুমি আমাদের একজন নও।"

"বলে না কি ?"

"না বললে কি আমার এত লাগে ?"

"অবাক্ করলি তুই। এতেও লাগল !"

"লাগবে না ?—নাঃ অসিদা বাপীরই ভুল। এতেও লাগে, কেন মানুষের এ যে বোঝে না সে আবার জ্ঞানী কিসে ?"

"কী বোঝে না ?

"ধরো আমি তোমাকে ভালোবাসি—ভালোবাসি না অবশ্য, কিন্তু ধরো যদি ভালোবাসতাম তাহ'লে কী চাইতাম বলো তো ? চাইতাম তো যে তুমি আমাদেরই গোয়ালে মাথা মুড়োও ? আচ্ছা বেশ। তা'হলে যদি হঠাৎ কেউ এসে একদিন আমাকে বলে : ওরে, তোর অসিদার খুঁটি এখানে নেই—তাহ'লে দুঃখ পাব না আমি ?"

"তবু না কি মণিমালা আমার কথার মণি ছড়াতে পারেন না" বলে অসিত স্নিগ্ধ কণ্ঠে।

"না না—এখন আদর নয়—তাহ'লে ফের আমার কথাটি ফুরবে। জানো অসিদা, এক এক সময়ে যখন চুপচাপ ব'সে ব'সে ভাবি দেখি কত কথা সব গজ গজ করছে মাথার মধ্যে—কিন্তু যেই তোমাকে গুছিয়ে বলতে যাই দেখি স—ব ভেস্তে গেছে।"

"কিন্তু আজ কথার ঘুঁটি চলছে একেবারে সাতচিতে গোলোকধামের পথে।"

"আজ কেমন যেন হঠাৎ—তোমার ভাষায়—ইন্‌সপিরেসন এসে গেছে।"

"কেন এল বল্ তো ?"

"তোমার ছোঁয়াচ লেগে বোধহয়।"

অসিত হাসে খোলা হাসি। ছায়া বলে : "কিন্তু অত হেসো না—

ফের আমার খেই যাবে হারিয়ে। একটা বোঝাপড়া আজ করতেই হবে —"তুমিই বলছিলে না এই মাত্র ?

"হয় এম্পার না ওম্পার ?"

"ও বাবা! অতটা নয় তাই ব'লে। এম্পারেই থাকা চাই।"

"মানে ? তোদের দলে ?"

"তা নয় ভাই," বলে ও অনুতপ্ত কণ্ঠে, "আমাদের দলে কেমন ক'রে হবে ? তবে আমাদের কাছে।"

"তোর এক একটা কথায় চমকে উঠতে হয় মণি জানিস ?"

ছায়ার উন্মুক্ত মুখে হঠাৎ যেন ফের মেঘ দেখা দিল, বলল: "কিন্তু—"

"কী রে ?"

"না থাক্ অসিদা—কা বলতে কী বলে ফেলব। বাপী বলে তুমি যে-অভিমানী, একটুতেই বিষম দুঃখু পাও।"

অসিত হাসে: "দুঃখ আর পাব না—যদি কেবল আমাকে অভিমানী না বলিস।"

"তা কখনো হয় ? জলকে বলা যায় সে গড়ায় না ?"

"কিন্তু একথা তো বলা যায় তাতে দাগ কাটা যায় না ?"

"ঈশ্—গঙ্গামাটির চরে দাগ আবার না কি কাটা না ?"

"আমার মন গঙ্গামাটির চর ?"

"আমি বুলবুল ?"

অসিত ওর গালে টোকা দিয়ে বলে: "আমিও বলি ঈ-শ—এ মেয়ে না কি আবার ভাজা মাছটি উল্টে খেতে জানে না।"

ছায়াও হাসে: "মাসিমার কথা তুমি বড্ড নাও। কোনদিন হয়ত এবার ব'লে বসবে আমি হলাম এক নম্বরের চণ্ডী।"

"বলব না যদি তুই না বলিস আমি এক নম্বরের "অভিমানী।"

ছায়া খুব হাসে : "শোধ তুলেছ এবার—মানছি। তবে আজকাল তামারই অত্যাচারে মেয়ের কাছে ইংরিজি পড়ি ভুলো না।"

"তাই কী ?"

"বলতে ইচ্ছা হচ্ছিল এটা unfair"

"কেনটা ?"

"আমাকে কথায় কাবু করা। যাও না নীলাক্ষী না সোমেশ াবুর কাছে।"

অসিত খুব হাসে : "কী তুমুল কাণ্ডই হ'ল সেদিন ?"

ছায়া টপ ক'রে বলে : "কিন্তু সামলে নিল কে ? আমি যদি না ক্রমাগত ফোঁশ ফোঁশ ক'রে উঠতাম "চললাম চললাম' ক'রে—ওরা তামার কী হালটা করত সেদিন ভেবে দেখেছ কি একবার ?"

"তোর কাছেই শুনি নাহয়।"

"কী আবার ? বলত—'বা বা অসিত বাবু, কী চমৎকারই গান করেন আপনি !' আর তুমি ওদের ধর্মপুত্তুর যুধিষ্ঠির ভেবে গানের পর গান গেয়ে চলতে।"

"অর্থাৎ ? ওরা আমার গান ভালোবাসে না ?"

"ক্ষেপেছ তুমি ? যারা বোঝে শুধু তোমারই ভাষায় ঝরাপাতার গান আর টকির নাকি সুর ?"

"নাঃ। এ-সংসারে অঝরা পাতার গান বোঝেন শুধু আমাদের বুলবুল।"

"আমার গুরু কে সেটা তো বুঝতে হবে।"

অসিত ওর চুল টেনে দেয় হেসে।

"আঃ লাগে না ?"

"কিন্তু রাগে না তো ?"

"বুলবুল কি রাগে ?"

"রাগার চোদ্দপুরুষ। গান থামালেই বাড়ি শুদ্ধু সবাই অস্থির।"

"আহা। অত কিছু নয়। তুমি আদর দাও ব'লেই। মা তো বলেই স্পষ্ট—কী মিনমিনে গায় মেয়ে কেউ শুনতেই পায় না পিনড্রপ সাইলেন্স না হ'লে।"

"আমাকে রাগাচ্ছিস ফের?"

ছায়া ওর দুটো হাতই টেনে নেয় নিজের হাতের মধ্যে: "এরকম রাগাতে আমি খুব রাজি কিন্তু।"

"কী রকম রাগাতে গররাজি সেটাও না হয় শুনে রাখি।"

"বলব—সত্যি?"

"না বললে আজ আর নিস্তার নেই।"

"না ভাই," বলে ছায়া হঠাৎ, "মাসিমার একটা কথা মনে পড়ে কেঁচো খুঁড়তে সাপ বেরুলো।"

অসিত চমকে ওঠে···কথার পিঠে তখন কী কথা যে এসে পড়ে! ওর মনে প'ড়ে যায় সকাল বেলাকার কথা। বলে গম্ভীর হ'য়ে: "না ছায়া, আর বেরুবে না। আমি আর অবুঝ হব না। কিন্তু কী হয় জানিস দিদি। বলব!"

"বলো" বলে ও সাগ্রহে।

"আগে হ'লে বলতাম না—কিন্তু এই এক বছরেই তোর মন অনেকটা বেড়ে উঠেছে। মনে পড়ে সেই দক্ষিণেশ্বরের কথা?"

"পড়ে না?"

"মনে আছে আমি সেই ঝুলনের দিন তোকে নিয়ে যেতে চেয়েছিলাম কোথায়—সেই বিগ্রহের সামনে আমার গানের আসরে?"

"মনে নেই? সেই তো প্রথম হ'ল যে তোমার গানের আসরে আমি গেলাম না। একি ভুলবার?"

অসিত ওর দুটো হাত গভীর স্নেহে চেপে ধরে: "তোর কথা শুনে

ত্যি সময়ে সময়ে বড় দুঃখ হয় দিদি। কারণ দেখছি এমন সব দুঃখ আমি তোকে অকারণে দিই যা মনে তোর দাগ কেটে রেখে যায়। তুই থ্যে বলিস নি। হয়ত আমরা—অন্তত আমি একটু নির্মম না হ'য়েই পারি না।"

ছায়া দুঃখিত সুরে বলে: "অমন কথা বলো না। তোমাকে যে যাই লুক নির্মম বলতে পারবে না কক্ষনো।"

সিত প্রীতকণ্ঠে বলে: "আজ তোর মুখে কথার যেন খই ফুটছে রে! –তবু কি জানিস দিদি? আমার স্বভাবের একটা মস্ত দোষ হচ্ছে এইযে, আমি ভালোবাসি তাকে অপরেও ভালোবাসুক এটা আমি বড্ড বেশি ই—"

"কে না চায়"?

"না—আমি এটা বড্ড বেশি চাই—বিশেষ ক'রে তাদের জন্যে যাদের" –ব'লে ওর গালে হাত দিয়ে—"যাদের আমি দুচক্ষু পেড়ে দেখতে পারি না!"

ছায়া একটু হেসেই গম্ভীর হয়, বলে: "তা জানি ভাই। আর জানো আমার দুঃখ ঐখানে।"

"কোন্‌খানে বুঝলাম না ঠিক।"

"যে ভালোবেসে তুমি যা চাও তা সব সময়ে ভালোবাসতে আমি পারি না।"

"আজ সকালের কথাটা মনে পড়েছে বুঝি?"

"শুধু আজ সকালেরই নয় অসিদা। আমাকে তুমি যত ছেলেমানুষ ভাবো তত ছেলেমানুষ আমি নই। আমি বুঝি তুমি কেন চাও এত ক'রে যে আমি ভগবানের দিকে ফিরি। কিন্তু—"

"কী?"

"না থাক্ ভাই। হয়ত ফের দুঃখ দিয়ে ফেলব অজান্তে।"

"না, বল্। আমি আর অবুঝ হব না, কথা দিচ্ছি।

ছায়া ম্লান হাসে: "এ কি বোঝার কথা ভাই? দুঃখ তোমার বে বাজে ব'লেই না তুমি লুকোতে পারো না।"

"নাঃ। তুই ছেলেমানুষ আর রইলি না মানতেই হ'ল।"

ছায়া প্রীতকণ্ঠে বলে: "এ কে না বোঝে বলো? মা যে তোমা সব চেয়ে কম জানে সেও বোঝে।"

"বোঝে?"

"বোঝে না? কতবারই তো আমাকে বলেছে ভগবান্ সম্বন্ধে তোমা সঙ্গে তর্কাতর্কির ছায়াও না মাড়াতে।"

অসিতের বুক ভ'রে ওঠে……এ পরিবারের সবাই ওর ব্যথা এ বুঝে চলে অথচ তবুও ও কেন ক্ষুব্ধ হয় এদের নাস্তিক ভাব দেখে?

ছায়া বলে: 'বাপী আরো বেশিদূর যায়। বলে: যদি কেউ সংসা ছেড়ে ভগবানকে চায় তার ব্যথার ব্যথী হওয়া চারটিখানি কথা নয়।"

"বলে?"

ছায়ার কণ্ঠ আভাময় হ'য়ে ওঠে: "বাপীর তোমার সম্বন্ধে কত উ ধারণা অসিদা। সেদিনই তো একজনকে বলছিল তুমি আমাকে এ সহজে আদর করো যে সে—মানে তোমার পক্ষেই সম্ভব—যে পারে না।"

অসিতের মনে কৃতজ্ঞতা উপচে পড়ে……এত শ্রদ্ধা…… এত বিশ্বা …অথচ কোথায় বাজে একটা আত্মগ্লানি নয় ভয়ও। এত শ্রদ্ধা পাও কি ওর মানস স্বাস্থ্যের পক্ষে ভালো। মনে পড়ে হঠাৎ অপ্রতিগ্র কথাটা। সাধকের পক্ষে বাইরের শ্রদ্ধা সমীহ বেশি না পাওয়াই ভালো ওরা যা-ই ভাবুক অসিত তো জানে তার এখনো চিত্তশুদ্ধির কত দেরি কত সূক্ষ্ম আত্মাভিমানকে প্রশ্রয় দেয় নিত্যনিয়ত! জানে অবশ্য ও দেখছে বড় ক'রে ভগবানের নামে সম্পত্তি সমধানের কথা। কিন্তু এ বে

সত্যি বড় কথা নয়। যেখানে যাকে বাজে না সেটা তো তার কাছে ত্যাগ নয়। তাছাড়া যা আমার আছে তাকে দান কী এমন কথা? সে তো আর আত্মদান নয়। আসল কথা ভগবানের চরণে নিজের সমস্ত সত্তাকে সমর্পণ। আজই একটি গান ওর মনে গুনগুনিয়ে উঠছিল খানিক আগে

করুণা-কিরণে করো মোরে নাথ নিরভিমান
আপন কণ্ঠে নাহি যেন করি মাল্যদান!

অথচ এ-ই-ই তো ও ক'রে এসেছে—কত ছলে। নিজের সম্বন্ধে ওর কত উচ্চ ধারণাকেই ও প্রশ্রয় দিয়েছে সাধ ক'রে। এ যে করে সে ভগবানের চরণে আত্মসমর্পণ করবে কেমন ক'রে? অথচ ওরা ধ'রেই নিয়েছে—ও খাঁটি ভক্ত। বাজে তো এইখানেই সবচেয়ে বেশি।

"কী ভাবছ অসিদা"?

ও চম্‌কে ওঠে, বলে: "ছায়া! তোমরা আমাকে যা ভাবো আমি তা নই—আমার মধ্যে অনেক ত্রুটি আছে……আত্মপ্রতারণা……"

"অসম্ভব" ছায়ার কণ্ঠে বেজে ওঠে শান্ত অথচ অটল প্রতিবাদ "মানে, ত্রুটি থাকতে পারে মানি—মানুষ মাত্রেরই আছে—কিন্তু প্রতারণা—অসম্ভব।"

অসিত অবাক্ হ'য়ে চেয়ে থাকে ওর মুখের পানে।

"কী দেখছ অমন ক'রে?"

"দেখছি না-ভাবছি।

"কী?"

"মানুষে যার এত ভক্তি ভগবানে তার—"

"দিদিমণি গো—হু-ই—"

ওরা চমকে উঠল—শিকারাটা এত কাছে কেউই দেখতে পায়নি আশ্চর্য! বাইরে গঙ্গাধর—ভিতরে প্রীতি।

"কী অসিদা ?" বলে প্রীতি একগাল হেসে, "হোলো বোঝাপড়া তোমার নয়নতারার সঙ্গে ? কী রে মেয়ে ? উঃ ! হাওয়াটা আজ বেশ জোর ছিল দেখছি।"

ছায়া আকাশের দিকে চেয়ে আশ্চর্য হ'য়ে বলে : "কই ? না তো !"

প্রীতি ব'লে : "তবু বলবে—'না তো !' না হ'লে কি আর মুখের ঘনঘটা কাটত এমন ক'রে দেখতে দেখতে ? কিন্তু অসিদা, একটা কথা—তোমার আদুরীকে আদর দিয়ে যদি খুব বেশি বাড়াও ফল ভুগতে হবে তোমাকেই মনে রেখো।"

অসিত শিকারায় উঠতে উঠতে বলে : "ভুগতে যে একেবারেই চায় না প্রীতি, ভোগ থেকেও সে বঞ্চিত থাকে।"

প্রীতি ওর হাত ধরে : "সঞ্চয়ের দিকে তো পা বাড়াও নি ভাই, এখন 'ভোগ থেকে বঞ্চিত হব না' বায়না নিলে শুনবে কে ?"

গঙ্গাধর ধরে ছায়ার হাত। ছায়া টলমল করতে করতে এসে বসে শিকারার মধ্যে।

প্রীতি বলে : "কী রে আদুরী ! তোর ভাবখানা কী শুনি ?"

ছায়া শুধু একটু হাসে……তাকায় অসিতের দিকে। অসিত বলে : "আরো কাছে স'রে আয়।"

প্রীতি বলে : "ও কী ? আরো কাছ ঘেঁসে বোস্—নৈলে গান ধরবি কী ক'রে ?"

ছায়া বলে : "আহা। যেন আমি—"

প্রীতি বলে : "আর কথা কোস নি মেয়ে ? ভাঙব হাটে হাঁড়ি—সে খেল না ব'লে কী কাণ্ড করলি তুই আজ ?"

ছায়া ওর মুখ চেপে ধরে।

মনে পড়ে আরো কত কথাই যে। কত তুচ্ছ স্মৃতিও আজ উজ্জ্বল হ'য়ে ওঠে চোখের সামনে এরই নাম কি উচ্ছ্বাসপনা—সেন্টীমেণ্টালিটি ?

হবে। কিন্তু যে-আবেগ তার সামান্যতম স্পন্দনেও ওর রক্তকে আজো দুলিয়ে তোলে তারে মন উচ্ছ্বাস ব'লে নামঞ্জুর করলেও ওর হৃদয়জগতে তার মূল্য কি এক বিন্দুও কমবে? ছায়া যে সেদিন ওর না-খাওয়ার ন্যে খায় নি—এ তো বাস্তবিকই বড় তুচ্ছ ঘটনা—প্রায়ই ঘটে ঘরকন্নায়। কিন্তু তাই ব'লে কি ওর কাছে এ-স্মৃতি তুচ্ছ? মনে পড়ে আজো ওর সেই উপবাসক্লিষ্ট ম্লান মুখখানি স্নেহে সজল অথচ সত্যপরতায় কঠিন। একবারও ও বলে নি যে ও সেদিন অন্যায় করেছিল—অথচ অসিতের 'পরে অভিযোগও তো করে নি। দৃঢ়তার সঙ্গে আত্মবিলোপের এ সমন্বয় ও কী ক'রে করত এত সহজে—যা আশ্রমে গিয়ে কত চেষ্টা ক'রেও অসিত পারে নি আজ পর্যন্ত? যে ধরণের প্রত্যাশা অসিত কাটাতে পারে নি সেধরণের প্রত্যাশা তো ছায়ার মনেও ছিল—না থেকে পারে? অথচ তবু এ-প্রত্যাশার য ন পূরণ হ'ত না তখন দুঃখ পেলেও সে তো ক্ষুব্ধ হ'ত না কোনোদিনই।

সত্যি কী সুন্দর বিকাশের মুখেই চলেছিল এ আশ্চর্য চরিত্রটি! আজ অসিত বোঝে—(সে কথা আহা সেদিন যদি বুঝত!)—যে আন্তরিকতার দীপ্তিকে যে তার পথচলার পাথেয় করে সে আসলে নাস্তিক হ'তে পারেন না। নাস্তিক বলি তাকে যে অন্তরের এই আলোয় আস্থা হারিয়েছে। এ-আলো যার সম্বল সে প্রতি অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে সেই অস্তির অস্তিকেই অনুভব করবে—নাড়ীতে তারই রস টানবে প্রতি বিদ্রোহে। "ক্যা জানে কৌন ভেখসে নারায়ণ মিল্ যায়—" কথাটি মরমিয়াদের একটি গভীর বাণী। ছায়া বুঝি তার নাস্তিবাদের মধ্যে দিয়েই অস্তিরূপী নারায়ণের দিকে এগুচ্ছিল। ভগবান তো সব সময়ে সোজাপথে দেখা দেন না—কত সময়েই অস্বীকারের মধ্যে দিয়েই অঙ্গীকার করিয়ে নেন কেউ কি জানে?

কিন্তু তবু দুঃখ ওর যায় না একটা কথা ভেবে। দেবদার অমন

শোচনীয় মৃত্যু হ'ল কেন ? এমন একটা পরিবার, অন্তত এজন্মে, ভগবানের কাজে এল না কেন—বিশেষ আসবার মুখে ? দেবদা সবে ঝুঁকছিল যে-সময়ে সে-সময়েই তার আয়ু ফুরোলো। আর কী ভাবে ? যেন চারদিকের সব শক্তি চক্রান্ত করেছিল যাতে ঐ সদাশয় উদার বন্ধুবৎসল মানুষটির অকালমৃত্যু হয়। মনে পড়ে—যখন শিলঙ থেকে ওরা সিলেটে নামে মোটরে তখন দেবদা ওপথে এসেছিল অসিতেরই জন্যে—নৈলে সে গৌহাটি দিয়েই কলকাতা ফিরত। শৈলেশ্বরকেও দেবদা ধরেছিল এই দিক দিয়েই ঘুরে যেতে। শৈলেশ্বর যেত না সিলেট হ'য়ে ঘুরে যদি না দেবদা ধরত। সে রাজি না হ'লে দেবদাও গৌহাটি হয়েই ফিরত।

তারপর সিলেটে দেবদারই এক আত্মীয়ের বাড়ি উঠল ওরা। তার পরদিন ভোরে ওদের সিলচর যাবার কথা ট্রেনে। সিলচরে অসিত এক সঙ্গীত সভার সভাপতি। সে-সভা দেবদাদেরও নিমন্ত্রণ করেছিল বিশেষ ক'রে ছায়ার জন্যে। ছায়ার ট্রেনভাড়া অবধি তারা দেবে কথা ছিল। মেয়ের এ-খ্যাতির জন্যেও দেবদা আরো সগৌরবে চলেছিল সিলচর।

কিন্তু হঠাৎ ভোরে এসে সিলচরের প্রতিনিধি বলল যে ট্রেনের সময় বদলে গেছে। তখন আর মোটর ছাড়া উপায় নেই। দেবদার আত্মীয়টি বললেন প্রাইভেট মোটর নিতে, দেবদা বলল—না বাসেই যাবে বেশ একসঙ্গে আনন্দ করতে করতে : "It will be fun." বাসে না গেলে এ দুর্ঘটনা তো হ'ত না।

ছবি তো হ বাস যে চালায় সচরাচর সে কি ঠিক সেই দিনই নিরুদ্দেশ !—কেন কেউ বলতে পারল না। কাজেই তার বদলি এক সারথি চালালো বৃহৎ লরিটাকে। সে তখনো মোটরের শিক্ষানবিশ, নতুন লোক—পথঘাটও ভালো চেনে না। বেগের মাথায় মোড় নিল—অত বেগে মোড় নেওয়া যে চলে না একথা যে কোনো অভিজ্ঞ সারথি

জানে। সে অভিজ্ঞ ছিল না তাই গতি শ্লথ করে নি। নৈলে কি গাড়ি উল্টে যায়?

আজও মনে পড়ে—স্নায়ুর মধ্যে সে-পতনের উন্মাদনা। অথচ, বেশ মনে পড়ে, একটুও ভয় হয় নি তার। ও একটা মন্ত্রজপ করছিল যখন বাস চলে ছিল দুধারে ধান ক্ষেতের মাঠের মধ্যে সোজা সুন্দর লাল রাস্তায়। সামনে গতিবেগের ঘড়িতে কাঁটা দুলছিল চল্লিশ থেকে পঁয়তাল্লিশ মাইলের মধ্যে।

হঠাৎ মোটর বেঁক নিল ডান দিকে। বোধ হয় একটা চাকা পিছলেও গেল—বর্ষাকাল তো, শ্রাবণ মাস উপর আসামের রাস্তা। চারদিক ভিজে শপ শপ করছে। না পিছলোনোই আশ্চর্য।

তার পরেই শোনা গেল পিছনে সেই কান্না। মোটরে দেবদারা ছাড়া ছিল শৈলেশ্বর সুহাসিনী অজয় কান্তি ও সুনাল ব'সে সারথির পাশে। অসিত পড়ল বাঁ কাঁধের উপর একেবারে একটা পগারে। মোটরটাও পড়ল সেই জলভরা পগারে ঘুরপাক খেয়ে। এমন ঘুরে গেল যে দেখা গেল ভাঙা মোটরটার মুখ ঘুরে গেছে একেবারে উল্টো দিকে!

কাজেই চোটটা লেগেছিল সবাইকেই। কিন্তু সবাই বেঁচে গেল— ঐ একটি মানুষ বাদ। আর কী যন্ত্রণায়! পূর্ণজ্ঞান ছিল দেবদার শেষ পর্যন্ত। না—সে-চিত্র ভাবতে ভালো লাগে না। সবচেয়ে বেশি কানে বাজে ছায়ার কাতর ক্রন্দন:

"বাপী নেই? সে কি হ'তে পারে?"

আর চোখের সামনে ভেসে ওঠে রাস্তার কাদায় দেবদা শুয়ে প্রতিমার কোলে মাথা রেখে। কোনো উপন্যাসেও এর চেয়ে করুণ মরণচিত্র কল্পিত হয়েছে কি? সন্দেহ!

মনে পড়ে শেষে মুহূর্তে দেবদার অসিতকে ডেকে বলা কানে কানে:

"ভাই তুমি সাধু—ছায়াকে দেখো। ওর সবচেয়ে বড় নির্ভর এখন থেকে তুমিই তো ?"

*　　*　　*

তবু ওকে চ'লে আসতে হ'ল। সুরেশ্বরের কাছে ছায়ার হিন্দুস্থানি গানে হাতে-খড়ি হয়েছিল আগেই —অসিতেরই আগ্রহে। দেবদার মৃত্যুর পরে ছায়া যেন আরো আঁকড়ে ধরল গানকে। আহা! মনে পড়ে অতুলপ্রসাদের একটি গান যা ছায়ার ছিল অতিপ্রিয় :

ওগো দুঃখ সুখের সাথী
সঙ্গী দিন রাতি
সঙ্গীত মোর!

সবে ও শোক ভুলছিল বাপীর। এমন সময়ে পরের বছরেই রাজুর টাইফয়েড। তখন অসিত আশ্রমে। যে-দিন টেলিগ্রাম পেল সেদিনই রাজু মারা যায়। গুরুদেবকে ওরা আগে তার করেছিল—তিনি আশীর্বাদী ফুলও পাঠিয়েছিলেন, কিন্তু বৃথা। 'ভবিতব্য' ছাড়া আর কী বলবে একে —তা কথাটার মানে যা-ই হোক।

দীর্ঘনিশ্বাস আসে বুক ছেয়ে : মহামায়ার মায়া কে বুঝবে? পরমহংসদেবের একটি প্রিয় গান মনে পড়ে :

পঙ্কে বদ্ধ করো করী　　পঙ্গুরে লঙ্ঘাও গিরি
কারে দাও মা রাজ্যপদ　　কারে করো অধোগামী

*　　*　　*

অসিত ছায়াকে বরাবরই চিঠি লিখত নিয়মিত। কিন্তু সেখানেও আঘাত পেত বারবারই। ছায়া ওর চিঠি বার বার পড়ত—প্রীতিও ওকে লিখত হেসে। কিন্তু কী ফল ফলত তাতে? চিঠিতে ও ভগবানের কথা লিখত গুরুদেবের কথা গানের কথা আরও কত কী। ছায়া সব তাতেই সাড়া দিত কেবল ভগবানের কথায় নয়। ও সম্বন্ধে কখনো

উচ্চবাচ্য করত না। কিন্তু গুরুদেবের কথায় ও সাড়া দিত। লিখত তাঁকে দেখতে কী যে ইচ্ছা হয়! দর্শনে আসার ইচ্ছা ওর খুবই ছিল।

কিন্তু রাজু মারা যাবার পর থেকে ও গুরুদেবের কথাও আর লিখত না। অসিতের প্রতি ওর কোমলতা একটুও কমে নি, কিন্তু গুরুদেবকে দর্শন করতে আর চাইত না। পরে অসিত টের পায় এই সময়েই ছায়ার সন্দেহ এসেছিল সব চেয়ে গাঢ় হ'য়ে—বিশেষ ক'রে যখন তার কাছে কেউ বলত ভগবানের করুণার কথা তার শান্ত চোখেও যেন একটা বিদ্রোহের আলো উঠত জ্ব'লে। কিন্তু মুখে সে বড় কিছু বলত না—পাছে কানা-ঘুষোয় অসিতের কাছে সে খবর পৌছয় ব'লে। আহা! এত দরদ সে বোধ করত অসিতের জন্যে—গভীর সংশয়ের মুহূর্তেও সে চাইত না সংশয় প্রকাশ করতে পাছে সেকথা অসিতের কানে গেলে সে দুঃখ পায়। সুখের লগ্নে বুঝে চলা সহজ, কিন্তু গভীর দুঃখেও যে ভোলে না তার স্নেহের কর্তব্য তার সে-জাগ্রত কোমলতার মূল্য কষবে কি দিয়ে? তাই তো আরো দুঃখ ছায় এহেন স্নেহশীলতাকেও সে দুঃখ দিত থেকে থেকে—বিশেষ ক'রে এই ধর্মবিশ্বাসের এলাকায়। কেন দিত? কেন ধর্মের বেলায়ই মানুষ সব চেয়ে স্পর্শকাতর হ'য়ে ওঠে? যে-ছায়াকে দেখতে দেবদা-মৃত্যু শয্যায় ওকে অনুরোধ ক'রে গিয়েছিল তাকে সে তেমন ক'রে দেখতে পারে নি তো এই জন্যেই। নৈলে রাজুর মৃত্যুর পরেও কি ও ছায়ার কাছে না গিয়ে থাকতে পারত? মনে ওর অভিমান আসত—এত দুঃখেও কেন ছায়া বুঝছে না যে ভগবানের দিকে না ফিরলে দুর্গতি অবশ্যম্ভাবী। কেন ও বুঝত না কী কারণে ছায়ার মন রুখে উঠেছিল ভগবানের বিরুদ্ধে?

অথচ তবু ও খবর পেত প্রায়ই কী সুন্দর ও গাইছে ভক্তির গান। এর ওর তার কাছে খবর পেত ওর গানের দ্রুত উন্নতি সম্বন্ধে, ওর আশ্চর্য

প্রতিভার তারিফ পেত নানা সমজদারের কাছ থেকে আর আনন্দে গর্বে বুক অসিতের দশ হাত হ'য়ে উঠত। যারা বলত অসিত ওর সম্বন্ধে বেশি উচ্ছ্বসিত হ'য়ে স্নেহের ভ্রান্তিবিলাসকেই প্রশ্রয় দিয়েছে তারা বুঝুক এবার। গীতিপ্রতিভার জহর যখন প্রত্যক্ষ করার সৌভাগ্য হয় তখন কি জহুরির ভুল হয় তাকে সনাক্ত করতে? তাই সুরেশ্বর যখন ওকে লিখত ছায়ার আশ্চর্য মেধা ও কণ্ঠসম্পদের কথা তখন অসিতের আনন্দ হ'য়ে উঠত যেন ছেলেমানুষি জয়ধ্বনি।

ইচ্ছা হ'ত তখন ছুটে যায় ছায়ার কাছে। কিন্তু ফের সেই অন্তর্দ্বন্দ্ব দাঁড়াত পথ আগলে। ভগবানকে যদি ও না-ই চায় তবে গানের মধ্যে দিয়ে এ-বন্ধনকে বরণ করা কেন আর? যা ছাড়তেই হবে তাকে পরিহার্য ব'লে চিহ্নিত করাই ভালো নয় কি?

তাই সে যায় নি। তবে চিঠি লিখত ছড়ায়। স্বরলিপি পাঠাত গানের। বই পাঠাত উপহার। ছবি পাঠাত নানা রকমের। ওর মেমের কাছে পড়াশুনো যাতে বন্ধ না হয় সে সম্বন্ধেও যথাসাধ্য চেষ্টা করত। কারণ ছায়াকে স্কুলের পড়া থেকে ছিনিয়ে নিয়ে মেমের জিম্মায় দিয়েছিল অসিতই। দেবদা মারা যাবার পর সে নিজেকে আরো দায়িক মনে করত ছায়ার শিক্ষার জন্যে। অথচ এত দূরে থেকে ও কীই বা করতে পারে—দুটো উপদেশ পাঠানো ছাড়া? সেই সঙ্গে অবশ্য গানের সম্বন্ধে উৎসাহও প্রকাশ করত—কিন্তু সেখানেও একটা দুরন্ত ভয় ছিল ওর বরাবরই—পাছে ছায়া খেয়াল ঠুংরি শিখতে শিখতে ভজন কীর্তনে বীতস্পৃহ হ'য়ে উঠে। তবু অসিত ওকে যথাসাধ্য উৎসাহ দিত যখন ছায়া লিখত ও হিন্দুস্থানি গানকে ভালোবেসেছে। অজয়ও লিখত এ-সম্বন্ধে উচ্ছ্বসিত ভাষায়। লিখত এরকম হিন্দুস্থানি খেয়াল কোনো বাঙালি মেয়ের মুখে কেউ শোনে নি কখনো। অসিতের কী যে আনন্দ হ'ত শুনে!

এই সময়ে সুরেশ্বর ফের আশ্রমে এল। এসে আর তার ফিরবার য় নেই। সে আর এক ইতিহাস।

ছায়া মর্মাহত হ'য়ে প্রতিজ্ঞা করল আর কারুর কাছেই ও গান শিখবে —না, না, না। সুরেশ্বর ব'লে এসেছিল ওকে অন্য ওস্তাদের কাছে ঃতে কিন্তু ও কিছুতে রাজি হয় নি।

প্রীতিও অসিতকে চিঠি লিখত প্রায়ই, ও-ও উত্তর দিত। কিন্তু ন উত্তর আর পাঁচজনকে দেয় তেমনি। ছায়াকে যে সুরে লিখত -সুরে নয়। কী দরকার আর বন্ধন বাড়িয়ে? একটা বন্ধনই থষ্ট।

এ সেই বৈরাগ্যের ফের যে-বৈরাগ্য বিলেত থেকে ফিরে এসে অবধি চেপে ধরেছিল। দেবদার মৃত্যুর পরে যখন ও খবর পেল যে ছায়া কাশ্য নাস্তিকতার দিকেই ক্রমশ ঝুঁকছে তখন এ-বৈরাগ্য আরো গভীর য়ছিল। কিন্তু এখানেও ঘটল এক আশ্চর্য স্বতোবিরোধ!

দুঃখ ও জীবনে আগেও পেয়েছে, কিন্তু দেবদার মরণের দুঃখ ওর ছে মর্মান্তিক হ'য়েই এসেছিল। পরিণত বয়সে এরকম গভীর বন্ধুত্ব র আর হয় নি—হয়ত হবেও না আর কখনো। তাছাড়া দেবদার তি ওর কৃতজ্ঞতা গভীর হ'য়ে উঠেছিল আরো এইজন্যে যে তার বলিষ্ঠ নুকম্প্য বিনা ছায়াকে ও এমন ক'রে কাছে পেতে কিছুতেই না।

হেন বন্ধুর এমন শোচনীয় মৃত্যু ওকে বেজেছিল খুবই বেশি। ফলে র মধ্যে সেই বৈরাগ্যই ফের মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। কী হবে মানবিক ন্ধে যখন তার কোনোই স্থায়ী বনেদ খুঁজে পাওয়া সম্ভব নয়—যখন কটা স্ফুলিঙ্গে স্বর্ণলংকা পুড়ে ছাই হ'য়ে যেতে পারে। ওর মনে হ'ত রো বেশি ক'রে যে পারমার্থিক জ্ঞান ও উপলব্ধি বিনা এসব আক- কতার হাত থেকে নিস্তার পাওয়া অসম্ভব—আর এ-সিদ্ধি বিনা অন্য

সব স্থখভোগই খতিয়ে হ'য়ে দাঁড়ায় পরাধীনদের পুতুল নাচ অদৃশ্য শক্তিদের টানাটানিতে। এ পুতুলনাচে যে আনন্দে অধীর হয় হোক অসিত জানত সে এতে দুঃখই পাবে চিরদিন কারণ প্রতিপদে পরবশে তুষ্ট থাকবার মনোবৃত্তিকে তার চিরদিনই মনে হ'ত হেয়। মানুষের মনুষ্যত্ব চাইবে আত্মসিদ্ধি—পরবশ্যতা নয়।

কিন্তু বৈরাগ্যই কি এ-সিদ্ধির পথ?

জীবনকে গ্রহণ করতে হবে তো।

যাকে কিনতে পারি না তাকে কি চিনতে পারি কখনো?

অথচ চেনার উপায় কী যদি জিৎ না-ই হয় জীবন যুদ্ধে? না জিৎ চাই-ই চাই। তার জন্যে জীবনের আখড়া থেকে অজ্ঞাতবাস যদি প্রয়োজন হয় তো তাই সই। কিন্তু অন্ধ প্রবৃত্তিকে নিজের সব মহার্ঘ শক্তির রাজকর দিয়ে বসবাসের মধ্যে যে অনুক্ত স্বীকৃতি সে-দাসখতে সে কোনো-মতেই সই করবে না।

তাই সে যেত না ছুটে ছায়ার কাছে। যাবার ইচ্ছা বেশি প্রবল হ'ত ব'লেই আরো দমন করত নিজের আসক্তিকে। না। আসক্তি হ'ল পরবশ্যতা। আগে চাই নিজের পরে পূর্ণ প্রভুত্ব—নিজের মনের স্বরাজ্য "জিতং জগৎ কেন?—মনো হি যেন।"

তবু ওর মনে কোথায় একটা দ্বন্দ্ব ছিল কেটেও কাটত না। এ-ও যে ওর স্বভাব: সব কিছুই ও খুঁটিয়ে দেখতে চায়। হায় রে, দেখতে চাইলেই কি পারা যায়? তবু ও চাইত বুঝতে, খুঁটিনাটির মধ্যে দিয়ে যাচাই করতে। তাই ওর মনে বাজত দেবদার অন্তিম অনুরোধ "ছায়াকে দেখো।"

কিন্তু কী-ই বা দেখবে? দেখতে চাইত ও সত্যিই—দেবদার তিরোধানের পরে আরো বেশি ক'রেই চাইত, কিন্তু চাওয়াই তো আর সব নয়—পারা ব'লেও একটা কথা নেই কি? কোন্ পথে ছায়া

সর্বাঙ্গীন মঙ্গল হবে অসিত কি সত্যি জানে? বাস্তবিক মানুষ কি এসব ভেবে চিন্তে কিছু করে? ও ছায়ার কাছে যেত ছুটে ছুটে, তাকে শেখাত গান, স্নেহ করত, প্রতিদানে স্নেহ পেত অজস্র' আনন্দ দিত সে আনন্দ ফিরে পেত অঞ্জলি ভ'রে—এমনি ক'রে ওদের মধ্যে আদানপ্রদানের একটা লীলাবৃত্ত গ'ড়ে উঠেছিল। মানুষের জীবন চলে এই বৃত্তেই ঘুরে ঘুরে নিজের আবেগ উচ্ছ্বাস চাহিদাকে কেন্দ্র ক'রেই সে ঘুরতে চায়। কিন্তু ঘোরে অন্ধভাবে। এই অন্ধতার কথা ভাবতে ও ক্লেশ বোধ করত আগেও—দেবদার মৃত্যুর পরে এ-ক্লেশ হ'য়ে উঠেছিল দুঃসহ। তখন ও বুঝতে শিখল যেন নতুন ক'রে যে এ অন্ধতা অজ্ঞানকে মেনে নিয়ে শুধু অবোধ আসক্তির স্রোতে গা ভাসিয়ে চললে বড় জোর একটু ক্ষণিক আনন্দ লাভ হতে পারে কিন্তু সে-আনন্দের পরে আস্থা রাখা যায় না। একটা বাইরের সামান্য ফুঁয়ে অনেক দিনের জ্বালা সাধের দেওয়ালি নিভে যেতে পারে—যেমন ওদের গেল! এসব কথা থিওরিতে আগেও জানত। কিন্তু থিওরিতে জানা এক—উপলব্ধিতে জানা আর। দেবদার মৃত্যু ওকে এবিষয়ে খুব তীব্রভাবেই সচেতন ক'রে দিয়েছিল কেননা দেবদাকে ও গভীরভাবে ভালোবেসেছিল। প্রথমে দেবদাকে ও গণ্য করেছিল ছায়ার জন্যেই বটে—কিন্তু পরে সে-মানুষটি তার নিজেরই গুণে ওর হৃদয় অধিকার করেছিল। দেবদার ব্যক্তিরূপের মধ্যে যে একটা আশ্চর্য বলিষ্ঠ দীপশিখা উজ্জ্বল হ'য়ে জ্বলেছিল ও আকৃষ্ট হয়েছিল তার দীপ্তিতে। স্বভাবে ও বলিষ্ঠ তাই বলীয়ানেরা ওকে টানত। দেবদা ব্যবহারে কোমল ছিল কিন্তু বিশ্বাসে শ্রদ্ধায় আন্তরিকতায় ছিল খাঁটি তেজস্বী। তাই তো ওদের পরিবারে ও এত স্বচ্ছন্দে নিজের ঠাঁই ক'রে নিতে পেরেছিল।

অথচ সেই দেবদা একদিনে কী ভাবে বিদায় নিল আদরিণী কন্যার ভার ওর হাতেই খানিকটা সঁপে দিয়ে। এজন্যে কুণ্ঠার ওর অন্ত ছিল না। কিন্তু দায়িত্ব? হায় রে। গুরুদেবের—জ্ঞানগভীর সংস্পর্শে এসে ও কি

বোঝে নি যে মানুষের দায়িত্ববোধের ভিতের কতখানি অজ্ঞানে ভর ক'রে দাঁড়িয়ে? সত্যি কি আমরা চালাই সংসার—নিয়ন্ত্রিত করি দেশের দশের ভাগ্য? যারা ভাবে করে তারা জানেও না কতরকম অলক্ষ্য শক্তির হাতের খেলার পুতুল তারা। যে-মানুষ পাঁচ মিনিট পরে কী হবে জানে না—এতটুকু আঘাতে মরণান্তিক দুঃখ পায়—দুর্দৈবে জখম হয় চিরদিনের মত—আশাভঙ্গে বিশ্বাসের বনেদ হারিয়ে বসে—বহুদিনের স্বপ্নসৌধ যার মাত্র একটা দম্‌কা হাওয়ায় ধূলিসাৎ হয় তাসের ঘরের ম'ত—সে-মানুষের এ কী মোহ যার ফেরে প'ড়ে সে নিজেকে ভাবে নিজের ভাগ্যবিধাতা? তবে নিয়তি না কি কুহকিনী তাই তার হাতে কিছুদিন একটু আধটু সফলতার রঙিন খেলনা দিয়ে বোঝায়—এরই নাম জীবনযুদ্ধে জয়ী হওয়া। কিন্তু কদিন চলে এ ছায়াবাজি?—যতদিন না কোনো

নেশার ঘোর, সে দেখে কোথাও কিছু নেই -যাত্রাপথে কোনো ধ্রুবদিশার চিহ্ন পর্যন্ত নেই। ছায়াদের কথা ভেবে এ সত্য যেন ও আরো গভীর ভাবে উপলব্ধি করে -বিশেষ দেবদার অপঘাতের পর থেকে।

তাই ও আরো চায় না দায়িত্বের কথায় কান দিতে। সত্যিকার দায়িত্বের প্রশ্ন ওঠে যখন জ্ঞান নির্দেশ দেয় দায়ের। নৈলে অন্ধকারের নির্দেশে মনে করা যে আলোর অমুক অমুক দায়—এর চেয়ে হসনীয় আর কী হ'তে পারে?

তাই ও মন দৃঢ় করেছিল এবার। না, আগে ওকে জ্ঞান অর্জন করতে হবে তার পর নেবে কর্মের ভার। যতদিন না আসে জ্ঞানের আলো ততদিন কী করবে? করবে ওর মঙ্গলচিন্তা—যতটুকু পারে মানে, অনাসক্ত হ'য়ে—কিন্তু নিজের কোনো কর্তৃত্ববোধকে আর প্রশ্রয় দেবে না দেবে না দেবে না। অবশ্য প্রার্থনা করবে ছায়ার জন্যে! যে যাই বলুক ও জানে প্রার্থনা কী বস্তু। সংসারে যাই মরীচিকা হোক না

কেন প্রার্থনা যে আলোকস্তম্ভ এ বিষয়ে ওর প্রত্যক্ষ উপলব্ধির বহু জোরালো সাক্ষ্য ছিল। ও দেখেছে বার বার প্রার্থনায় বিফলতার মধ্যে দিয়েও সফলতা আসে যদি বাসনার খাদ মিশেল না থাকে, স্বার্থবুদ্ধি প্রবল না হয়। সর্ববিধ বাসনার ছোঁয়াচ থেকে নিজের প্রার্থনাকে মুক্ত রাখা দুরূহ—সে-ও একটা মস্ত সাধনা—কিন্তু তবু নিরভিমান হবার চেষ্টা করলে পারা যায় খানিকটা নিঃস্বার্থ হতে এও ও দেখেছে বার বার। তাই ও জানত যে ছায়ার যাতে অমঙ্গল তা ও কখনো চাইবে না—কোনো সূত্রেই না। এই জন্যেই ওর জন্যে প্রার্থনায় অসিতের এত আনন্দ ছিল বরাবরই। হ্যাঁ—ওর জন্যে ও প্রার্থনা করবে নিষ্কামভাবে, ওর ঐকান্তিক কল্যাণ কামনায়। নাই বা দেখা হ'ল বেশি—বললই বা লোকে ওকে পলাতক! কী যায় আসে—যখন ও জানে কেন ও ছায়ার কাছ থেকে দূরে দূরে থাকতে চাইছে। ছায়া তো ভুল বুঝবে না ওকে। সেটাই কি একটা কম সান্ত্বনা।

তবু দুঃখের তলানি কিছু না কিছু চুমুক দিতেই হয় সুখের পেয়ালায়। তাই ও ব্যথিত হয় যখন ছায়ার 'পরে ওর প্রভাব প্রবল হওয়ার তৃপ্তি অতৃপ্তিতে পরিণত হ'ত যখন দেখত ওর হাজার প্রার্থনায়ও ছায়া ঝুঁকত না আর আশ্রমের দিকে। এতে ওর অভিমান ঘা খেত; ও কতবার গেছে ছায়ার জন্যে কিন্তু সে তো কই আসে না! না-ই এল। এ-প্রত্যাশাই বা কেন থাকবে? শুদ্ধি চাই। সব প্রত্যাশাই তো অশুদ্ধির প্রসূতি। তাছাড়া কে জানে হয়ত সময় হয় নি ব'লেই ও আসে না। বুঝিয়ে ফলও হয় না হয়ত এই জন্যেই। লগ্ন ব'লে একটি কথা আছে না? বড় মিষ্টি কথাটি। কিন্তু যত মিষ্টি—তার চেয়েও যেন গভীর। হাজার চেষ্টা করো না—সময়ের ফুল অসময়ে ফোটে না, বীজ বুনলেই রাতারাতি বনস্পতি গজিয়ে ওঠে না। ব্যাসমুনির কথা মনে বেজে ওঠে মহাভারতের শান্তিপর্বে:

পর্যায় যোগাদ্বিহিতং বিধাত্রা
কালেন সর্বং লভতে মনুষ্যঃ।

বিধাতা দেন কিন্তু অসময়ে নয়—সময়ের আনুকূল্য চাই—অন্তত খানিকটা তো বটেই।

ও ধৈর্য ধরে। শান্তির আভাস পায় সঙ্গে সঙ্গে।

* * * *

কিন্তু মনের মধ্যে ওর একটা অনামা আশঙ্কা উঠত ঘনিয়ে। ও আশ্রমে ওর দুই একজন বন্ধু বান্ধবীকে বলেওছিল এ আশঙ্কার কথা। ওর মনে হ'ত ছায়া নিজের মনের দুঃখ যেভাবে চেপে বসে আছে তার ফল ভালো হবে না। শুধু তাই নয়—ও যেন নিজের পরে শোধ তুলছে—কিছুতে আসতে চাইছে না সেই জন্যেই। কেন একথা মনে হ'ত কে জানে? তবে অনেকদিন থেকেই যখনই এ ধরণের কথা মনে হ'ত ও কল্পনা ব'লে এ-জাতের চিন্তাকে নিরস্ত করবার প্রয়াস পেত। কিন্তু যখন সুরেশ্বর আশ্রমে চলে এল দ্বিতীয়বার তখন এ-আশঙ্কার ছায়ামূর্তি স্পষ্ট শরীরী হ'য়ে উঠল। তখন নানা সময়ে মানসনেত্রে এত স্পষ্ট দেখতে পেত ছায়ার বিষণ্ণ মুখখানি যে সে আর এক আশ্চর্য। আহা, কার কাছে এখন ও গান শিখবে? আর গান না শিখতে পেলে কী অবলম্ব ধ'রে দাঁড়াবে? বেচারি। ওর খুব ইচ্ছা হ'ত সময়ে সময়ে ওকে গিয়ে কিছুদিনের জন্যে নিয়ে আসে এখানে। একটা চেঞ্জও তো হবে। কিন্তু না—বিষণ্ণ সুরে বলত ওর মন—ছায়া আসবে না—কিছুতে আসবে না নিরুপায়। থেকে থেকে মনটা ওর ব্যথিয়ে উঠত স্নেহময়ী শোকাতুর মেয়েটির জন্যে। ও জানত সে কী ভাবে চায় অসিতের সঙ্গ। তবু—হায়রে তবু!

* * * *

এমন সময়ে এল টেলিগ্রাম্ ছায়ার খুব খারাপ ধরণের বাত হয়েছে

ধ্যাশায়ী। ওর বুক কেঁপে উঠল। গুরুদেবের ফুল পাঠাল। মাস নেক ভুগে সেরে উঠল। ওরা ভাবল ঔষধে সারল। ভাবুক। কী আসে ? ও তো জানে গুরুদেব রোজ ওর জন্যে কতখানি ধ্যানশক্তি য়োগ করতেন। কে কী ভাবে তার মূল্য কতটুকুই বা ? আসল কথা ওঠা নিয়ে। কত প্রার্থনা যে ও করত ছায়ার রোগমুক্তির জন্যে। ার্থনায় সাড়াও পেত। তাই জানত যে প্রার্থনা ঠিক ঠিক হলে সাড়া াসেই আসে।

কিন্তু ওকে বাজল তখন ছায়া সেরে উঠে গেল হাজারিবাগ। ও বড় াশা করেছিল—এবার আসবে ওরা আশ্রমে—অন্তত কিছুদিনের জন্যে। ারো এইজন্যে যে সুরেশ্বরও রয়েছে। ওর মন ভালো থাকত নিশ্চয়ই।

প্রথমটায় পণ করেছিল ওদের আসতে লিখবে না—ওদের উপরেই ছেড়ে দেবে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত পণ রাখতে পারে নি—প্রতিমাকে লিখেছিল ায়া সেরে উঠলেই যেন চ'লে আসে আশ্রমে। মাসখানেক থাকলে ওর স্বাস্থ্য ভালোই হবে এ হাওয়া-বদলে। কিন্তু ওরা গা করল না। অসিত ফের আঘাত পেল। আরো এই জন্যে যে, হাজারিবাগ থেকে প্রীতি ওকে লিখল ছায়ার রক্ত ক'মে গেছে তাই রক্ত হওয়ার ইঞ্জেকশন লেছে নিয়মিত কিন্তু মুস্কিল হয়েছে ছায়ার মনটাকে প্রফুল্ল রাখা—আরো সুরেশ্বরের বানপ্রস্থের পরে। কিন্তু ওদিকে কারুর কারুর পত্রে খবর গল ছায়া বাইরে থেকে দেখতে বেশ প্রফুল্ল, হাসি গল্প গান বাজনা সবই করে সহজ মানুষের ম'ত। কিন্তু আর কেউ না বুঝুক অসিত বুঝত এ সহজ অবস্থার ছদ্মবেশ বজায় রাখতে ছায়াকে কতখানি বেগ পেতে হচ্ছে। তাই অসিতের আশঙ্কা আরো ঘনিয়ে উঠল। লক্ষণ কোনোদিক দিয়েই শুভ নয়। ওরা বুঝতে পারছে না আসন্ন ফাঁড়া ওর কত বড়। তাই ও প্রবল অনিচ্ছা সত্ত্বেও জোর ক'রেই লিখল ছায়াকে যে শুধু রক্ত হওয়ার ইঞ্জেকশনে কাজ হবে না যদি যে জন্যে রক্তাল্পতার সূত্রপাত তার চিকিৎসা

না হয়। চাই কোন বড় বিশ্বাসের খুঁটি। এই জন্যেই ও চেয়েছিল ও ভগবানের দিকে ফিরুক—এখানে ওর কোনো স্বার্থ ছিল না। ছায়া লিখল একটি ছোট্ট পোস্টকার্ড: "অসিদা, একথা তুমি লিখতে পারলে কী ক'রে যে আমার মঙ্গল তুমি চাও নিঃস্বার্থ ভাবেই! যে যত বড়ই অবিশ্বাসী হোক না তোমাকে অবিশ্বাস করার কথা কি ভাবা যায়?"

সে-ই ছায়া। ও মেয়ে কি বদ্‌লায় সহজে? কেবল মুস্কিল এই যে বলিষ্ঠতা হ'ল শাঁকের করাত, যেতে কাটলে আসতেও কাটে। স্নেহে আস্থায় যে-মেয়েকে টলানো কঠিন, অসিতের হাজারো দুর্নাম নিন্দার অপযশে যে কর্ণপাতও করে নি, নিজের সুনামের জন্যে এতটুকু ভাবে নি কোনোদিন—তার নাস্তিক্যে আস্থাই বা সহজে টলবে কেন? বলতে কি, ও মুখে সংকল্প সম্বন্ধে উচ্চবাচ্য বড় একটা করত না বটে কিন্তু মনে মনে যে পণই নিক না একবার নেওয়ার পরে সহজে তাকে বিসর্জন দি না। সামাজিক দিক দিয়ে ও সবদিক দিয়েই ছিল যাকে বলে অন্-কনভেনশনাল। অসিতের মনে পড়ে দেবদার মৃত্যুর পরে ও বাইরে গান করত না—কিন্তু শিখত সমানই অসিতের কাছে। এতে ওর অনে আত্মীয়ই রাগ করত কিন্তু ও ভ্রূক্ষেপও করত না। এমন কি অজয় ও সঙ্গে তবলা-সঙ্গত করত ব'লে ওদের হরিশ মুখার্জির রোডের বাড়িতে কেউ কেউ আপত্তি করলেও ও কান দেয় নি, বলেছিল—যা অন্যায় নয় তাকে অন্যায় ব'লে মেনে নেওয়া চলে না, তখন গানের সঙ্গে তবলা-সঙ্গত য অশোভন হয় তবে সব সময়েই অশোভন—আর যদি তা না হয় তবে নিয়ে পাঁচজনের আপত্তি অগ্রাহ্য: কে কী বলছে না বলছে কী যায় আসে—দেখতে হবে মনের উচিতবুদ্ধি কী বলে? ওর দিদিমা তখন বিপন্ন হ'য়ে অসিতকে ধরেন মেয়েকে বোঝাতে।

অসিত ওকে অনেক ক'রে বুঝিয়ে সুঝিয়ে বলাতে শেষটায় এই রফা হয় যে গান শেখা হবে হরিশ মুখার্জির রোডের বাড়িতে নয় ল্যান্সডাউন

রোডে প্রীতিদের ওখানে। কিন্তু এই সামান্ত ব্যাপারেও অসিত টের পেয়েছিল যে ব্যথা ওকে যেখানে বাজে সেখানে ও গভীর ভাবেই পর্দানসীন হ'লেও সমাজ যেখানে বাইরের দিকে তর্জন করে "thou shalt not" ব'লে—সেখানে ও ঠাট বজায় রাখবার জন্তে এতটুকুও আপোষ করতে নারাজ। এই সূত্রে অসিত এ স্বভাব-বিদ্রোহিনীকে শুধু শ্রদ্ধা নয়, একটু সমীহ না ক'রেও পারে নি। এ ছাড়া ওর গানে গভীর নিষ্ঠার খবরও পেত অসিত প্রায়ই। দেবদার মৃত্যু ওকে কী রকম বেজেছিল অসিত জানত—কিন্তু তা সত্ত্বেও ছায়া গান শেখায় এতটুকু ঢিল দেয় নি। বরং আরো যেন উঠে প'ড়ে লেগেছিল। অজয় সুরেশ্বর প্রীতি আরো অনেকেই লিখত হিন্দুস্থানি গানে ওর অভাবনীয় উন্নতির কথা। অতি কঠিন খেয়ালের ঢঙ, লয়, তান, মিড় সবই ও শুনতে না শুনতে গলায় তুলে নিত। আর কী অবস্থায়? যখন বাইরের জীবনে চারদিকে শুধু শোকের নিঃসম্বল অন্ধকার। অজয় ওকে ঠিকই লিখেছিল —প্রতিভার সঙ্গে ঐকান্তিক নিষ্ঠার এ মণিকাঞ্চন যোগ জীবনে দুর্লভ। সুরেশ্বরের মনে বরাবরই একটু নিহিত অবজ্ঞা ছিল মেয়েদের সঙ্গীত চর্চা সম্বন্ধে কিন্তু সে-ও মানতে বাধ্য হয়েছিল যে ছায়া মেয়েদের মধ্যে এক আশ্চর্য ব্যতিক্রম। হিন্দুস্থানী গানকে ও সত্যি ভালোবাসতে পেরেছিল —তাই এ অসম্ভব সম্ভব হয়েছিল।

কিন্তু কেমন ক'রে এ-ভালোবাসা ওর এল সে-রহস্যের কথা এক অসিত জানত। অসিতকে ও লিখেছিল গানকে ও অবলম্বন করেছে শুধু তার সৌন্দর্যের জন্তে নয়—গানকে ও বরণ করেছে ওর রিক্ত স্বপ্ন জীবনের উপজীব্য হিসেবে! সংসারের কাছ থেকে যে বিশেষ কিছুরই প্রত্যাশী নয় —যে জেনেছে মানুষের সুখের দেয়ালির তেল কত সহজে ফুরিয়ে যায়— যে দিনে দিনে নানান্ আশাভঙ্গের মধ্যে দিয়ে পৌঁছিয়েছে এক লক্ষ্যহীন জীবনের নির্বেদলোকে তার কী অবলম্বন আছে গান ছাড়া? এই কথাই

ও মাঝে মাঝে লিখত—একমাত্র অসিতকেই। একবার লিখেছিল: "অসিদা তোমার সেই দিনের গাওয়া একটি গান আজকাল আমার প্রায়ই প্রাণে বাজে—যদিও সে-সময়ে বেজেছিল শুধু কানে তোমার সেই ইমনটি:

আমি বেঁচে আছি নাহি জানি কী কারণ
জীবন শুধুই জীবন-ধারণ।...

আজও অসিতের বুকের মধ্যে ব্যথিয়ে ওঠে সুখের দুলালীর এ-দুঃখের কথা ভেবে। ওরা লেখে ছায়া বেশ আছে, খায়, দায় হাসে গান করে—বাইরে থেকে কোনো কিছুরই অভাব নেই। দেবদা যা রেখে গেছেন তা ওদের সুখে স্বচ্ছন্দে থাকার পক্ষে পর্যাপ্ত।

কিসের ওর অভাব তা বাইরে থেকে দেখে যারা বিচার করে তারা কি বুঝবে? মানুষের গভীরতম ব্যথার কতটুকু বোঝে বহির্মুখী মানুষ—এক ব্যথার ব্যথী যে সে কিছু বোঝে তার স্নেহের স্পন্দনে, কিন্তু সে-ই বা কতটুকু বোঝে? তাই অসিত জানত যা আর কেউ জানত না—যদিও সে-ই বা কতটুকু বুঝত ওর ব্যথার রহস্য? তবু একমাত্র অসিতই জানত যে ভাবসঙ্গীত ও সুরসঙ্গীতকে ও গ্রহণ করেছিল বটে ভালোবেসে কিন্তু বরণ করেনি সমান আগ্রহে। সুর সঙ্গীতকে ও গ্রহণ করেছিল ওর রুচির ইঙ্গিতে,সৌন্দর্যবোধ দিয়ে—ভাবসঙ্গীতকে বরণ করেছিল ওর প্রাণের অতল বেদনা দিয়ে। একথা অন্তরে উপলব্ধি ক'রে তবুও কেন যে অসিত ওকে থেকে থেকে ভুল বুঝত, অকারণ ভরিয়ে উঠত—পাছে ওস্তাদপন্থী-দের সঙ্গে ক্রমাগত মিশে মিশে ওর দৃষ্টি-বিভ্রম হয়—পাছে ওস্তাদপন্থী হ'য়ে ভাবের গান ছেড়ে নিছক সুরের তানে মজে—সে আর এক অমের রহস্য—আরো এইজন্যে যে এ ধরণের ভিত্তিহীন কল্পনায় অসিতের ব্যথায় ছায়ার পরিতাপের অবধি ছিল না। এ পরিতাপের কথা ও সহজে মুখ ফুটে বলত না বটে—তবু একবার অসিতকে লিখেছিল দুঃখ ক'রে:

"আমি ওস্তাদ ব'নে যাব অসিদা? আমার সম্বন্ধে এত বড় ভুল ধারণা তুমি করতে পারলে শেষমেশ?—কিন্তু যাক্, আর আমি তোমাকে বোঝাতে চেষ্টা করব না। কী হবে ক'রে? হয়ত ভুল বুঝে মানুষ এমন কোনো আনন্দ পায় যাকে রোধ করা অসম্ভব। ঠেকে এত শিখেছি অসিদা যে আজকাল মনে হয় এ-ধরণের কথা প্রায়ই, কেন—জানি না।"

অসিত অনুতপ্ত হয়েছিল খুবই। আদর ক'রে একটি দীর্ঘ ছড়ায় লিখল অনেক কিছু। তার মধ্যে কয়েকটি চরণ আজও মনে পড়ে:

শ্রদ্ধা তোমার চিত্তসখী, তাই তুমি বোন্ পাবেই পাবে:
কেবল, চাওয়ার সুরটি সেধো আরাধনার অনুভাবে।
এই চাওয়ারই জ্বালতে প্রদীপ সল্‌তে হ'য়ে জীবন জ্বলে,
মরণ-জ্বালায় শুদ্ধি দিয়ে চিরোজ্জ্বলের স্বপ্ন ফলে
জাগরণের ধূসর ধুলায়—তুফান রোলেই ডাকে তারা
সর্বমিলন সে-ই পায় যে চায় হ'তে তাই সর্বহারা।

ও খুব খুসি হয়েছিল এই ছড়াটি পেয়ে। কেন এত খুসি হ'ত ছড়ার চিঠিতে গভীর কোনো সুর পেলে? ভাবে অসিত। আশ্চর্য, উপদেশে ও খুসি হ'ত না, কিন্তু গানে-বা কবিতায় ভক্তির সুর শুনতে না শুনতে দিত সাড়া—এ অসিত কতবারই যে দেখেছে। ওকে ও অন্তত শতাধিক ছড়ার চিঠি লিখেছিল সবশুদ্ধ—এক একটা বেশ লম্বা ছড়া। সেগুলি ও কতবারই যে পড়ত নানা সময়ে—লিখত প্রীতি ওকে মাঝে মাঝে। এ আর এক আশ্চর্য—কারণ ছড়ায় অসিত প্রায়ই লিখত ভগবানের কথা, বৈরাগ্যের কথা, ভাবসঙ্গীতের কথা। কয়েকটা চরণ আজও মনে আছে:

"বলতে তবু হবেই হবে: 'কাছে এলেই যায় না দেখা,
প্রখর কুরূপ হয় সুকোমল ফুটলে সাঁঝের ইন্দুলেখা।

অক্ষতি কী জানতে হ'লেও সইতে হবে ক্ষত ক্ষতি
মিলনমণি চিনতে হ'লে চাই বিরহের ব্যথারতি।"

"তবে কিনা বাদল যখন ঘনায়—গগনমণির মালা
হয় মনে কল্পনা যেন—চন্দনেও যে আনে জ্বালা।
সেই সময়েই দেবদিশারির দীক্ষাদীপের মন্ত্রবাণী
প্রেমের দেবালয়ে জ্বেলে চাই রাখা তাঁর শরণ মানি'।
বেদনা নয় বিরহিনী—মিলনে সে-ই ধরে বাতি,
একলা তিনি করেন—দিতে চিনিয়ে পথের চিরসাথী।"

অসিতের ছড়ায় ওর মন দুলে উঠত কেন? অসিত পুরোপুরি বুঝতে পারে না। কারণ অসিত ছড়ায় কত সময়ে কত কী-ই যে লিখত একটা আবছা ব্যথার আবেশে তার তল কি ও নিজেই পেত? ছায়া প্রায়ই ধোয়াটে কথায় আপত্তি করত। অথচ ধরো অসিত যখন ওকে একবার লিখেছিল একটি ছড়ায় ছায়ার একটি মৃদু শঙ্কার উত্তরে:

একলা পথে টুকরো হাওয়ায় ছিন্ন ছায়া-আলোর তৃপ্তি খানি
কত দিন যে বিছিয়ে গেছে শ্রান্ত হিয়ায় স্নিগ্ধ পরশ বাণী!
আধেক ফোটা স্বপ্নকলি ঝরলে, মনে হ'ত—যেন জাগে
সে-বিদায়ের সুরেও কী এক সান্ত্বনা—কোন্ অচিন অনুরাগে!
ক্ষুধাও তো নয় শুধুই ক্ষুধা—যখনি বোন্ মনটি কেমন করে
স্নেহময়ীর স্মৃতির সুধা ঢেউয়ে ঢেউয়ে বিছায় বালুচরে।
আনমনারা যায় ভুলে? না, মিথ্যে ছায়ারাণী, তোমার ভয়।
বিস্মরণের গহন তলেও অবিস্মরণ রস রাজে অক্ষয়।

তখন ছায়ার সে উচ্ছ্বসিত আনন্দ কি ভুলবার? অথচ সে-আনন্দের তলেই মাথা খুঁড়ত ওর সেই অন্তঃশীলা বেদনা, ও লিখেছিল:

"অসিদা ভাই, তোমার উদাস-সুরের ছোঁয়াচ কেমন করে যে আমার

নাস্তিক মনের 'বালুচরেও ঢেউয়ে ঢেউয়ে' এসে লাগে—তোমার মন কেমন করার কথায় আমারো মনে কী যে হয় বুঝি না। মনে হয় কোথায় গভীরে একটা মিল আছে তোমার আমার মধ্যে—যদিও তুমি একথা নিশ্চয়ই বিশ্বাস করবে না। কারণ তোমার নয়নতারা তো শুধু নাস্তিকই নন—তার ওপর আবার তাঁর ওস্তাদ ব'নে যাবার ভয়ও রয়েছে…"

অসিত এ-ধরণের ইঙ্গিতেও দুঃখ পেত। কিন্তু ভাবত—কাজ কী, যখন যেতেই পারছি না কলকাতায় কেন ওকে লিখতে যাই ওস্তাদির বিপক্ষে। ও যদি ওস্তাদই হয় "শেষ মেশ"—বেশ তো যদি তাতে ও সুখী হয় সত্যি সত্যি।

কিন্তু বললে হবে কী—অসিত যে জানত এ-সান্ত্বনার গলদ কোথায়। এ তো ওর থিওরি নয়—ও যে ভুক্তভোগী। বেশ মনে পড়ে আজও ওর গীতবানের কথা যে "বাবুজি ওস্তাদি গানের চরম বিকাশও যে সে শিখরের নাগাল পায় না যে শিখরে বাস করেন আমাদের ভজন তোমাদের কীর্তন।"

কত সত্য কথা। তবে এ নিয়ে তর্ক ক'রে লাভ কী? তাই ইদানীং ও এমন কি অজয় সুরেশ্বরের সঙ্গেও ভাবসঙ্গীত বনাম সুরসঙ্গীত নিয়ে তর্কাতর্কি ছেড়ে দিয়েছিল—আরো এই জন্যে যে ওরা দুজনেই ছিল খুব আন্তরিক। ওদের আন্তরিক শ্রদ্ধা বিশ্বাসকে কেন ও বাণ হানবে?

এ ঔদার্য নয়—এ ছিল খানিকটা ওর স্বভাব। অসহিষ্ণুতার দোষ অসিতের ছিল সত্য—কিন্তু ও সত্যিই চাইত অপরকে একটু বুঝতে তারই ছন্দে। তাই তো ও ছায়ার ওস্তাদ ব'নে যাওয়ার কল্পনায় একটু ভয় পেলেও ছায়াকে উৎসাহই দিত ওস্তাদি গানকে পরম শ্রদ্ধার সঙ্গে বরণ করতে। তবে এ-ও ও পেয়েছিল খানিকটা ছায়ার স্বভাবের গুণে। ও যে জানত ছায়া সে প্রকৃতির মেয়ে নয় যারা চটকে ভোলে। তাই অসিতের সন্দেহ ছিল না যে ও সুরের ওস্তাদি সুরধুনী ঝংকারে যদি

প্রথমে একটু বেশি মুগ্ধ হয়ও, ফিরে ওকে আসতেই হবে ভজন কীর্ত্তনের গভীর রত্নাকরে। আর সেই সময়েই আসবে ওর পরম লগ্ন—মোড় নেবে ও সেই গানের দিকে যে-গান অন্তরকে সহজেই বাঁধে তার দুরাশার শিখরসুরে—করে তাকে ভগবৎমুখী। এ না হ'য়েই পারে না। তবে এখন না কি ওর খোঁজার পর্ব, শেখার অধ্যায়, পরীক্ষার ঋতু। এখন ও খুঁজুক, শুনুক, শিখুক—আহরণ করুক গানে নানা অভিজ্ঞতা: "পর্যায়যোগেন লভতে মনুষ্যঃ।"

এই ভেবেই অসিত খানিকটা স্বস্তি পেত বিশেষ যখন শুনত রাম শ্যাম যদু হরি সমজদাররা এসে ছায়ার হিন্দুস্থানি গানের উচ্ছ্বসিত সুখ্যাতি করতে বাধ্য হচ্ছে। আহা! এতে পায় যদি ও গভীর আনন্দ ধরুক না ওস্তাদি গানকেই আঁকড়ে।

কিন্তু সুরেশ্বর যখন চ'লে এল আশ্রমে তখন যে ওর হিন্দুস্থানি গান শেখার পথও বন্ধ হ'য়ে গেল—এইতেই অসিত ভারি ভাবিত হ'য়ে উঠল। আর কারুর কাছে তালিম নিলে হয় না? উহুঁ শক্ত মেয়ে, রুখে উঠেছে আর কারুর কাছেই শিখবে না গান: বাংলা গান শিখতে হ'লে অসিদা, ওস্তাদি গান শিখতে হ'লে সুরেশ্বর বাবু। এত লোকে ওকে বলল বোঝাল—সুরেশ্বর নিজে ওকে লিখল শিখতে আর কারুক কাছে কিন্তু মেয়ে অচল অটল—ঐ এক কথা।

এতে ভয় না পেয়ে কেউ পারে—যে ওকে একটুও জানে? গান যে-মেয়ের প্রাণ সে মেয়ে যখন বলে আর গান শিখবে না তখন সে কত দুঃখেই যে বলে একথা কল্পনা করা কি খুব কঠিন? অসিত কত প্রার্থনা করত ছায়া যেন এবার আসে আশ্রমে—সুরেশ্বরের কলকাতা ফেরার আশু সম্ভাবনা নেই এজন্যেও বটে। কে জানে? হয়ত এই ধরণের টানেই ওর জীবন প্রথম বেঁকবে ভগবানের দিকে—হয়ত অন্য কোনো উপায়েই ওকে আশ্রমে আনা যেত না ব'লেই এই ধরণের

যোগাযোগ ঘটল! ভাবতেও অসিতের ভালো লাগে—এখানে যদি সে এসে কিছুদিন থাকে নিশ্চয় যাবে বদ্‌লে—যাবেই—যাবেই—অসিত যেন জপ করে। আর তাহ'লেই বেঁচে যাবে মুমূর্ষু মেয়ে।

কিন্তু ঠিক এই সময়েই ওরা লিখল অসিতকে যে হাজারিবাগে গিয়ে ছায়ার শরীর বেশ সেরে উঠেছে। মহামায়া! একদিন রাতে দেখল ও দুঃস্বপ্ন—ছায়ার দুরারোগ্য ব্যাধি।

তারপরেই এল মর্ম্মান্তিক খবর—কমলার কাছ থেকে।

কমলা আশ্রমে এসেছিল দু-তিন বার। কলকাতায়ও সে প্রায়ই থাকত। তার স্বামী ছিলেন দার্শনিক, পশ্চিমের এক কলেজের খ্যাতনামা অধ্যাপক—যেমন উদার তেমনি বিদ্বান্। তিনি ছায়াকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন। ছায়া, প্রীতি ও অসিত একবার তাঁর ওখানে ছিল যে কী আনন্দে! কমলা শুধু যে ছায়ার গানের ভক্ত ছিল তাই নয় ওর চরিত্রের মধ্যে তেজস্বিতা ও কোমলতার সমন্বয়ের জন্যে গভীর ভাবে আকৃষ্ট হয়েছিল।

হঠাৎ তার কাছ থেকেই এল তার! ছায়ার ডবল নিউমোনিয়া। এই দুঃস্বপ্নই ও দেখেছিল।

তবু স্বপ্ন সত্য হ'লে ধাক্কা লাগেই। তাই অসিতের ইচ্ছা হ'ল তৎক্ষণাৎ রওনা হয়। কিন্তু ছায়ারা ওকে তার করে নি, তাই ভুল বুঝল। ভাবল হয়ত ছায়ার অভিভাবকরা চায় না। দূর থেকে ভুলবুঝার আড়াল সহজেই পুরু হ'য়ে ওঠে। আরো এই জন্যে যে প্রতিমাকে যখন লিখেছিল একবার আশ্রমে আসতে তখন সে গা করে নি।

কমলাকে ও লিখল ছায়ার অসুখের খবর নিয়মিত দিতে। কমলা রাজি হ'ল সানন্দেই—আর সে রোজই ছায়াকে দেখতে যেত ব'লে ওর

অসুখের সব খবর খুঁটিয়ে দেওয়া ওর পক্ষে সহজও ছিল। অসিত কমলার কাছেই রোজ গুরুদেবের আশীর্বাদী ফুল পাঠাত।

কমলা লিখল রোগ ক্রমশই সঙিন হ'য়ে দাঁড়াচ্ছে। কিন্তু সে-ও অসিতকে আসতে অনুরোধ করল না—শুধু লিখল ছায়া গানের কথা এত বলে! অসিতের কত যে ইচ্ছা করত কলকাতা ছুটে গিয়ে ওকে গান শোনায়—সে জানে গান শুনলে ওর মন এত ভালো থাকে যে হয়ত সেরে ওঠা সহজ হ'তেও পারে। কিন্তু কমলাও যে ওকে যেতে লেখে না। কমলার সূক্ষ্মবোধ সৌকুমার্য নিখুঁৎ বললেই হয়—সে হয়ত কিছু আঁচ পেয়েছে—তাই অসিতকে জানাচ্ছে না। পাছে অসিত দুঃখ পায় বেশি রকম। প্রার্থনায় কমলার শ্রদ্ধা ছিল গভীর—অসিতকে লিখত ছায়ার জন্যে প্রার্থনা করতে।

অসিত ভাবল ছায়ার বাড়ির লোকেরা নিশ্চয়ই চায় না অসিত এখন আসে। আশ্চর্য তো নয়। ওর সঙ্গ নিতে গিয়েই না দেবদার অকালমৃত্যু। হয়ত ওরা মনে মনে অসিতের প্রতি আর প্রসন্ন হ'তে পারছে না। না পারলে অসিত ওদের দোষ দেবেই বা কী ক'রে! ওর নিজের মনেই যে এজন্যে একটা গভীর ব্যথা ছিল যে দেবদার মৃত্যু হ'ল ওরই সভায় যেতে গিয়ে। তাই ও ভাবল কলকাতায় না যাওয়াই ভালো—এখান থেকেই যা পারে করবে—অর্থাৎ প্রার্থনায় যতদূর হয়। প্রার্থনার ফল তো চাক্ষুষ করেছে অগুন্তিবার!

কিন্তু ক্রমশ শঙ্কার কারণ বেড়ে উঠল। নিউমোনিয়া বেঁক নিল প্লুরিসির দিকে। রাতে অসিত ঘুমতে পারত না। স্বপ্নে দেখত ওর মৃত্যুমলিন কোমল মুখখানি—ওর ডাগর চোখদুটি ওকে ভৎর্সনা করত—"আসছ না তবু? সাধনার ক্ষতি হবে?"

হায় রে! অসিত কখনো এ ছন্দে ভাবে নি। সংসার ভালো লাগত না তাই ও সংসার-ত্যাগী—কিন্তু প্রতিপদে "আমার সাধনা—

আমার সাধনা" বলত যে-সব সাধক সাধিকা তাদের সঙ্গে ওর আদৌ বনত না। ওর সাধনার ছন্দই ছিল আলাদা। চিরজীবন ও বেপরোয়া স্বভাববিদ্রোহী—সাধনার কর্তব্যবুদ্ধি ওকে রুখবে!

কিন্তু কী করে ও? যাবে? যাওয়া কি চলে? যদি ছায়ার সঙ্গে ওর দেখশোনা না হয়। না হ'তেও তো পারে। ও নিজেকে ভারি নিঃসহায় মনে করল। এখন তো দেবদা নেই—যদি ছায়ার মামারা ওর বিরুদ্ধে হয় এখন। ভাবল একেবার কমলাকে খোলাখুলি জিজ্ঞাসা করে। কিন্তু সেখানেও যে কুণ্ঠা আসে। এ বিষয়ের কথা কি জিজ্ঞাসা করা চলে?

কিন্তু শেষে একদিন কমলা লিখল ছায়ার কাশির কথা। কাশতে কাশতে ওর নাড়ী ছেড়ে যায় আর কি। প্রায় দেড় ঘণ্টা ধ'রে। সবাই আশা ছেড়ে দিয়েছিল ··কমলা গুরুদেবকে ডাকছিল এক মনে। তার ক'রেও ফল নেই প্রায় touch and go অবস্থা।

অসিত আর পারল না। গুরুদেবকে জানাল সব কথা। বলল ছায়ার যদি মঙ্গল হয় ও গেলে তবে ও যাবে—ছায়ার কাছেই থাকবে অন্তত কিছুদিন—অবশ্য যদি গুরুদেব অনুমোদন করেন। এখানে ওর মনে দ্বিধা ছিল না। গুরুদেব নিষেধ করলে ও কখনই যাবে না—কিন্তু ও প্রার্থনা করল মনে মনে যেন গুরুদেব অনুমতি দেন।

গুরুদেব সবই জানতেন। প্রসন্ন মনেই দিলেন অনুমতি। তাঁর আশীর্বাদ নিয়ে অসিত রওনা হ'ল সেই দিনই।

* * * *

ট্রেণ ছোটে হু হু ক'রে কলকতার দিকে। কত কথাই মনে হয়!··· সেই ছায়া! কত বড় হয়েছে এই দুতিন বছরে। ছায়ার চিঠিতেও ও পরিচয় পেত যে ওর মধ্যেকার সে-শিশুটি আর নেই—মন ওর বেশ একটু ভাবতে শিখেছে। ওর চিঠির ভাষায়ও রাঁধুনি এসেছে অনেকখানি।

এত অধীর মনে হয়। ট্রেণ এত আস্তে চলে কেন? যদি গিয়ে শোনে ছায়া আর নেই এ-জগতে? না—এ-ধরণের চিন্তাও না। না না না। ছায়ার সঙ্গে তার শেষ দেখাটাও হবে না? এ কি হ'তে পারে কখনো? ভুল বোঝার বোঝা গুরুতর হ'য়ে উঠেছে দূরত্বের মায়ায়। কত অঘটনই না ঘটে পথকে দুর্গম করতে। অঘটন? তা ছাড়া আর কী! — হঠাৎ মনে প'ড়ে যায় এমনি একটা ঘটনা—একটি মাত্র মুখ-ফসকে-বলা কথা! অথচ তার কী অনপনেয় পরিণাম! ব্যাপারটা ঘটেছিল এলাহাবাদে। চলতি ট্রেণের পরিবেশে মন আরো উদাস হ'য়ে যায়—স্মৃতির ছবি হ'য়ে ওঠে আরো করুণ।

* * * *

ছায়া কলকাতা বড় ভালোবাসত। দুদিনও বাইরে থাকতে না থাকতে ফিরে আসবার জন্যে উঠত ব্যস্ত হয়ে। Home, sweet home গানটিও ও অসিতের কাছে পরমানন্দে শিখেছিল।

সেবার অসিত কলকাতা রওনা হবে হবে করছে, এমন সময়ে খবর পেল আনন্দ আলমোড়া থেকে এলাহাবাদে নেমে এসেছে মাসখানেকের জন্যে। আনন্দের কাছে ও ছিল গভীর ভাবে ঋণী! আনন্দ কেম্ব্রিজের নাম করা ছাত্র—কয়েক বছর আগে দর্শনের অধ্যাপক ছিল লক্ষ্ণৌয়ে। তার সাহেবি নাম ছিল মেস্টন। আকৈশোর তার বৈরাগ্য প্রবল। ভারতীয় দর্শনের সঙ্গে সংস্পর্শে আসতে না আসতে সে টের পায় যে নিয়তি তাকে ডাকছেন ভারতেই—সত্যসন্ধানে। তাই সে ভারতে আসে —যোগার্থী হ'য়ে। প্রথমে অদ্বৈত তার পরে বৌদ্ধধর্ম ও সবশেষে বৈষ্ণবধর্ম তাকে আকৃষ্ট করে। লক্ষ্ণৌয়ের চাকরি সে ছেড়ে দেয় বৈষ্ণব ভক্তি-সাধনার প্রেরণায়। আলমোড়ায় গুরুর চরণছায়ায় এক নির্জন কাননে গ'ড়ে উঠল ওদের রমণীয় আশ্রমটি। কয়েকজন গুরুভাই নিয়ে আনন্দ থাকত সেখানে। গুরুসেবা ছিল ওর সাধনার একটি প্রধান অঙ্গ।

অসিত বৈরাগ্যের দিকে ঝুঁকবার আরো জোর পায় মেস্‌টনের দৃষ্টান্তে। তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও পবিত্র চরিত্রের এমন অপূর্ব সমন্বয় ও আর কোনো বন্ধুর মধ্যে দেখে নি। মেস্‌টন ও অসিতের "চারিচক্ষু-মিলনের" সময়ে ওদের হয়েছিল সেই "দোঁহে দোঁহা দরশনে উপজিল প্রেম" অবস্থা। এ-হেন মেস্‌টন যখন এককথায় সন্ন্যাসী হ'য়ে বেরিয়ে যায় মোটা মাইনের চাকরি ছেড়ে, তখন ও খুব একটা ধাক্কা খায়। মেসটন ওকে বড় বড় চিঠি লিখত —অসিত সবিনয়ে শুনত ওর উপদেশ। কারণ অসিত অভিমানী হ'লেও আত্মম্ভরী ছিল না নিজের চেয়ে বড় কাউকে দেখলে বড় ব'লে স্বীকার করতে তার বাধত না—যদিও নিজের চেয়ে ছোটদের কাছে সে অহেতুক বিনয় প্রকাশ করা তার কাছে মনে হত ভণ্ডামিরই সগোত্র। বিনয় গুণটিকে ওর অনেক সময়েই মনে হ'ত অগুণ, বিশেষ যখন সামাজিকতার খাতিরে মানুষ 'অমায়িক' নাম কিনতে ব্যগ্র হ'য়ে ওঠে। কিন্তু শ্রেষ্ঠ যে, বরেণ্য যে তার কাছে নত হ'ত ও গভীর আনন্দে। মেস্‌টন তাই ওকে সময়ে সময়ে তিরস্কার করলেও ও কখনো ক্ষুণ্ণ হ'ত না—কৃতজ্ঞই বোধ করত ওর স্নেহের জন্যে যার জোরে ও স্বচ্ছন্দে অসিতকে তিরস্কার করতে পারত। বাস্তবিক মেস্‌টনের প্রীতি সোহার্দ্য ওর জীবনের এক পরম সম্পদ। আশ্রমের সাধকদের মধ্যে ওর একটিও বন্ধু লাভ হয় নি। তাই সময়ে সময়ে ও আরো তৃষিত হ'য়ে উঠত আনন্দর সান্নিধ্যের জন্যে। কিন্তু ডুমেল থেকে আলমোড়া যাবার সংকল্প অনেকবার করলেও যাওয়া ওর ঘটে ওঠে নি নানা কারণে। কলকাতা যাবার পথে এলাহাবাদ— সেখানে হঠাৎ আনন্দর পুনরাবির্ভাব, ও উৎফুল্ল হ'য়ে উঠল বৈ কি। প্রেম ও জ্ঞানের এমন সমন্বয় ওর কোনো বন্ধুর মধ্যে ও দেখে নি আজ পর্যন্ত। তাই আনন্দ ছিল ওর-পান্থ-জীবনের এক পরম পাথেয়।

আনন্দ ভজন কীর্তন ভালোবাসত। অসিতের খুব ইচ্ছা হ'ল ছায়ার গান ওকে শোনায়। তাছাড়া ওর সংস্পর্শ ছায়া পাক এও অসিত

চাইত। তাই লিখল দেবদাকে সপরিবারে এক সপ্তাহের জন্যে এলাহাবাদে আসতে। কমলার এক ভাই এলাহাবাদে থাকত সুশীল। সুশীলের সঙ্গে অসিতের এক মাসতুত বোন নিভার বিয়ে হয়। কাজেই সেখানেই দেবদারা থাকবে—লিখল অসিত। কমলাও লিখল। কমলাকে দেবদা গভীরভাবে শ্রদ্ধা করত। তাই দেবদা রাজি হ'ল সানন্দেই। কিন্তু সে সময়ে দেবদার নিশ্বাস ফেলবার ফুরসৎ নেই—অনেকগুলি কনট্রাক্ট হাতে—কাজেই ছায়াকে বলল মাসির সঙ্গে যেতে। বোনঝির chaperon হ'তে মাসি কবে নারাজ !

কিন্তু ছায়া তো সাহেব শুনেই ডরিয়ে উঠল। এখানে অসিতের আর এক খেদ ছিল : ছায়া খুব কম অপরিচিতের সঙ্গেই বনিয়ে চলতে পারত। কনভেনশন যাকে বলে তার সঙ্গে ওর সখিত্ব ছিল না। বাংলা ভাষায় যাকে বলে ঝুনো ছায়া ছিল খানিকটা তাই। কলকাতায়ও দুচারজন আত্মীয় আত্মীয়া ছাড়া কারুর সঙ্গেই ছায়ার ঘনিষ্ঠতা ছিল না। আর সে আত্মীয়রাও সংখ্যায় মুষ্টিমেয়। ধরতে গেলে মামাবাড়িই ছিল ওর আত্মীয়তার অদ্বিতীয় নীড়। বন্ধু বান্ধব ছিল না বললেই হয় —বিশেষ এ-সময়ে—অর্থাৎ অসিতের সঙ্গে ওর আলাপের প্রথম বৎসর। ধরতে গেলে ছায়ার পাঁচজনের সঙ্গে যে আলাপ হয়েছিল সে অনেকটা বাধ্য হ'য়েই—গান ভালো গাইতে পারলে আর যা-ই সম্ভব হোক না কেন অজ্ঞাতবাস যে অসম্ভব হ'য়ে ওঠে একথার মার নেই। কিন্তু অসিত প্রথম বৎসর কলকাতা থেকে ফিরে আসার পরেই আনন্দ আলমোড়া থেকে নামে এলাহাবাদ। সে সময়ে সবে ছায়ার নাম হচ্ছিল—তাই ওর 'ঝুনোমি' বেশ অনাহত অবস্থায় বেঁচে বর্তে ছিল।

কাজেই ছায়া ভারি মুশকিলে পড়ে গেল। এদিকে অসিদার কাছে গান শেখার লোভ—এলাহাবাদে হৈ চৈও হবে তো অসিদাকে নিয়ে—সেটা ছায়ার ভালো না লেগে পারে ? ওদিকে ওর ঝুনোমি। তার

উপরে বিদেশে একেবারে অপরিচিতের ওখানে ওঠা—বাড়ি ছেড়ে! তার উপরে সাহেব। ও বাবা! না না—ও পারবে না—ম'রে গেলেও, লিখে দিল ও শেষে পুনশ্চ জুড়ে দিল: এলাহাবাদ হ'য়ে অসিত কলকাতায় এলে তখনই গান শেখা সুরু হবে। একটু দেরি হ'য়ে যাবে কলকাতা পৌঁছতে, কিন্তু তার আর উপায় কি?

অসিত ওকে অনেক বুঝিয়ে সুঝিয়ে লিখল যে সে-রকম বাবা সাহেব নয়—একেবারে নিরামিষ সাহেব, বৈষ্ণব 'গোবিন্দ গোবিন্দ' বলতে যার চোখে ধারা বয়। তার উপরে বাংলা জানে তার উপরে ওর গুরু এক সন্ন্যাসিনী, মস্ত ঘরের মহিলা, ওকে গোপাল ডাকেন। কী যে চমৎকার লোক তিনি!

ছায়া একটু আশ্বস্ত হ'ল বটে, কিন্তু তবু যে-ই এলাহাবাদ যাওয়া স্থির হ'ল হঠাৎ বেঁকে বসল। বলল—ভয় করে, পারবে না। অসিত লিখল হেসে "ছায়া আমার এক স্কুলের বন্ধুকে মনে পড়ে। এমেচার থিয়েটারে অভিনয়ের খুব সখ। মিষ্টি গলা। ঠিক হ'ল সাজবে মীরাবাই। কিন্তু যেদিন অভিনয় হবে সেদিন বলে কি, গোঁফ কামায় কী ক'রে—বড় ভয় করে—পারবে না। 'তোমার হ'ল সেই অবস্থা। সব ঠিক, এখন পারবে না কি?"

ছায়া হেসে কুটি কুটি। হাসতে পেলে ও বল পেত অনেকখানি—তাই অসিত ওকে খুব হাসাত প্রায়ই মজার মজার গল্প ব'লে, রসাল ছড়া কেটে, কমিক গান শুনিয়ে—কত কী।

কিন্তু শেষ মুহূর্তে ছায়ার ভয়ের পুনরভ্যুদয় হ'ল, বলল: "বাপী, তুমিও চলো। নৈলে আমি পারব না যেতে।" বাপী খুব ধমকে দিতে একটু শেয়ানা হ'ল মেয়ে। কিন্তু চোখের জলও ফেলল। দেবনা অসিতকে সে-সব কথা বর্ণনা ক'রে শেষটায় লিখল: "তোমার ছাত্রীটিকে তো জানো না ভাই—ওকে বাগ মানানো শক্ত। ক্ষণে ক্ষণে ওর মেজাজ

বদ্‌লায়—ওর নাম হওয়া উচিত ছিল 'শারদা' বলতে না তুমি! ঠিকই বলতে। কিন্তু তবু উনি সোজা শারদা নন—essence of শরৎ যাকে বলে। কী যে মুস্কিল হয় ওকে নিয়ে। টিকিট কিনে বার্থ রিজার্ভ করার পরে বলে কি না—'পারব না বাপী, তোমার দুটি পায়ে পড়ি, একেবারে অচেনাদের বাড়ি – ভাবো তো—ভয়!'—অনেক তুতিয়ে পাতিয়ে বুঝিয়ে তবে মেয়ে রাজি হয়েছে। বললাম—ওরে সাধুসঙ্গ যে কত ভালো জিনিষ তোর অসিদার সঙ্গ পেয়েও কি বুঝলি নি? বলে কি জানো! বলে —ঈশ্‌ অসিদার মতন সাধু না কি আবার ঝাঁকে ঝাঁকে মেলে। আমি ওকে বলি তখন আনন্দ আরো মস্ত সাধু। অবিশ্যি সে কথা ও কানেই তুলল না – তবে ত্যাগী শুনে ওর মন একটু ভিজেছে যেন। এ আর এক আশ্চয্যি কাণ্ড অসিত। ভগবানকে ও ভাবতে চায় না, বলে—পারি না। অথচ ত্যাগী পুরুষ শুনলেই মন ওর টস টস ক'রে ওঠে যেন। যাই হোক পাঠাচ্ছি ভাই ওকে ওর মাসির সঙ্গে—কিন্তু ওকে নিয়ে যদি তোমাকে বিপন্ন হ'তে হয় তাহ'লে আমায় দুষো না। প্রীতি বলে জানো তো— 'সাধ ক'রে খেয়েছ কচু—তেঁতুল কোথায় পাবে বলো?" ছায়াকে ভালোবাসলে ভুগতে হবেই—নিস্তার নেই। বলে এ-ও ঠিক যে ও কখনই এলাহাবাদে যেত না যদি তুমি না নাছোড়বন্দ হ'তে। একা আমার ধমকে কাজ হ'ত না।"

ট্রেণে ওর কেবলই মনে হয় দেবদার কথা। কী অপরূপ কোমলে কঠিন ছিল যে মানুষটি! ওর ঋণ কি অসিত শুধতে পারবে কোনোদিন! দুদিনের আলাপে এভাবে আদরিণী কুমারী মেয়েকে যে পাঠায় একেবারে অপরিচিতের বাড়ি—শুধু আলাপীর অনুরোধে? সত্যি, আজ যেন ও নতুন ক'রে বোঝে দেবদার মর্ম। দেবদা থাকলে ওকে এতটা কিন্তু কিন্তু ভাব নিয়ে কলকাতা যেতে হ'ত না আজ। দেবদা ওকে তার করত প্রথমেই চলে আসতে। সে জানত বুঝত।

কী নরমই ওর মনটি ছিল স্নেহের ক্ষেত্রে, অথচ আবার সেই সঙ্গে কী দৃঢ় সংকল্পের আখড়ায়! মনে পড়ে ওর কত কথা। একবার শিলঙে এক গানের সভায় দেবদা তার শালের আভরণে ওর জন্যে এক পেয়ালা গরম চা রেখেছিল কত যত্নে—গানের পর অসিত খুব গরম চায়ে চুমুক দিতে ভালোবাসত কি না। মনে পড়ে, প্রতি আসরে দেবদা থাকত সবার পিছনে—ওর ভার ছিল তবলা পাখোয়াজ তানপুরো মোটর এই সব দেখা শুনো। অর্থাৎ গানের আসরের আর্ত গন্ধময় দিকটার ভার ও-ই নিত—আর হয়ত সারাদিন দারুণ খেটে আসার পরে। মনে পড়ে ওর অবারিত আতিথেয়তা। অসিত দেবদার ওখানে যখন তখন ডেকে আনতে পারত ওর যে কোনো বন্ধুবান্ধবীকে—এমন কি সিনেমার তারকাকেও। মনে পড়ে অসিতের একটি কথায় দেবদা পাঠিয়ে দিয়েছিল ছায়াকে ওর সঙ্গে এম্‌নি একটি তারকার বাড়ি গান গাইতে। অথচ নিজে ও মোটেই বোহিমিয়ান ছিল না। সংযত, স্বল্পবাক্‌, স্বল্পহারী, ভদ্র মানুষটি—কোনো কিছুতেই বাড়াবাড়ি করতে ভালোবাসত না। চোখে ওর জল আসে। আজ দেবদার যদি দেখা পেত একটিবারও! হাসিও পায়। কী সেন্টিমেন্টাল হ'য়ে উঠছে ও! হঠাৎ তন্দ্রা আসে। ঘুমিয়ে প'ড়েই দেখে দেবদা। সাগ্রহে আলিঙ্গন করল অসিতকে। অসিত বলল: "দেবদা ভাই, মাপ কোরো।"

"কেন?"

"ছায়াকে তুমি দেখতে বলেছিলে—আমি পারি নি।"

দেবদা বলল ম্লান হেসে: "ভুল করেছ অসিত—ছায়ার অসুখে অনেক আগেই তোমার যাওয়া উচিত ছিল। ও তোমাকে কী ভাবে চাইছে বুঝতে পারো না—বিশেষ যখন আমি নেই?"

ঘুম ভেঙে গেল হঠাৎ। এ কী? গুরুদেবের কাছে ও শুনেছিল সব

স্বপ্নই স্বপ্ন নয়। ওর কাছে কি দেবদার অশরীরী আত্মা এসেছিল আজ সত্যিই ওর ডাকে?

ক্রমাগত বেজে ওঠে ওর কানে—"বিশেষ যখন আমি নেই……"

ছায়া বলেছিল এলাহাবাদে আনন্দকে দেখবামাত্র উচ্ছ্বসিত হ'য়ে: "হাঁ মাসিমা, সাধুর মতন চেহারা বটে—গেরুয়া যাকে মানায়।"

অসিত বলেছিল: "মানে আমাকে মানায় না এই তো?"

প্রীতি বলল: "তা ভাই ও মিথ্যে কথা কী ক'রে বলব? গেরুয়া তোমার বেশ নয়। তোমার বেশ আদ্দির পাঞ্জাবি।"

ছায়া অসিতকে একথায় একটু ক্ষুণ্ণ দেখে টপ ক'রে বলল: "না অসিদা—আমি মানানো বলতে এ বুঝি নি শুধু দেখতে ভালো লাগা। তুমি যাই পরো না কেন মানাবে তোমাকে। কিন্তু তাই ব'লে কি বলবে তুমি যে ত্যাগ যে করে নি এক ক্রান্তিও গেরুয়া পরার তার অধিকার আছে? যে কোনো একটা সাজ কি ধরলেই হ'ল? কার সাজ ধরছি সেটা বুঝতে হবে না? উনি বা তুমি গেরুয়া পরতে পারো ব'লে সবাই গেরুয়া পরবে বা রে!"

"মেয়েটা চম্‌কে দেয় থেকে থেকে!" ভাবে অসিত, কিন্তু মুখে এ প্রসঙ্গটা এড়িয়ে গেল, বলল আদর করে: "তবে যে তুই বলিস তোর ভক্তি নেই?"

কথাটা ও আনন্দকে বলেছিল। আনন্দ খুব খুসি হয়েছিল শুনে। ওর গান শুনে ছায়াকে আরো আশীর্বাদ করে। ভীরু কুনো মেয়েটির 'পরে স্নেহ ছিল তার অকৃত্রিম—কিন্তু পাছে ইংরেজি কথা বলতে হয় এই ভয়ে ছায়া আনন্দর আনাচে কানাচে ঘুরবে তবু কাছে আসবে না। দেবদা মিথ্যে বলে নি, ওকে বাগ মানানো সোজা নয়। থেকে থেকে

ওর কান্না কান্না মিড় দিয়ে বলবে: "আর নয় ভাই—এবার চলো ফিরি কলকাতায়।"

কিন্তু ফেরে কী ক'রে? এলাহাবাদে তখন যা গাইতে হচ্ছে ওদের দুজনকে! শুধু প্রাইভেট বাড়িতেই তো নয়—প্রকাশ্য সভায়ও অভিনন্দনের পুনরাবির্ভাব, উপায় কি?

ছায়া খুব খুসি অসিদার এ সম্মানে। তাছাড়া গানও শেখে রোজই সকালে—শোনেও নানা আসরে। কিন্তু রাত হ'লেই কলকাতার জন্যে মন কেমন করে। তাই অসিতকে না ব'লেও পারে না—"এবার ফিরি চলো ভাই!"

এতেও অসিত দুঃখ পায়। আরো এই জন্যে যে আনন্দকে ছায়া খুব ভক্তি করলেও ওর সুন্দর সুন্দর কথা শুনতে চায় না। বলে: "ওসব তত্ত্বকথার আমি কী বুঝি ভাই?"

সত্যিই বুঝত না—আরো ভাষার জন্যে। কারণ—সে সময়ে—ইংরেজি জানত ও সামান্যই। পরে অবশ্য ও ইংরাজিতে দ্রুত উন্নতি করেছিল বইকেও ভালোবেসেছিল—বিশেষ বাতের প্রকোপে শয্যাগত থাকার সময়ে—কিন্তু এ সময়ে ওর সমস্ত মনটা যে গানেই খরচ হ'য়ে যেত, আর কোন কিছুর সময় বেচারি পায়ই বা কখন?

কিন্তু সব বুঝেও তবু অসিত এতে দুঃখ পেত। ও চাইত ছায়ার পড়াশুনোও ভালো হয়।

আজ আক্ষেপ হয় কেন ও চাইত ছায়াকে ওর মনের মতনটি করে গ'ড়ে তুলতে? এর নামও কি প্রত্যাশা নয়? তবে? অথচ মজা এই যে এধরনের কোনো প্রত্যাশাই থাকবে না একথা ভাবতেও বাজে। নড়তে চড়তে প্রতি সংঘাতেই বাজে। আর বাজে ব'লেই ওর চোখ ফোটে প্রত্যাশা কী ভাবে নিজের ঠাঁই ক'রে নেয় স্নেহের লেনদেনে।

অন্যত্র হ'লে ব্যাপারটা হয়ত এভাবে ওর চোখে পড়ত না, কিন্তু

প্রত্যাশা-বর্জনের আকাঙ্ক্ষা যেখানে নিবিড় সেখানে একটু প্রত্যাশার আবির্ভাবেও দুঃখটা বাজে বেশি, যেমন মোটরের উজ্জ্বল হেডলাইটের পরিধির মধ্যে প্রতি বন্ধুরতারই রূপরেখা হ'য়ে ওঠে বেশি জাজ্জ্বল্যমান। নইলে হয়ত ঘটনাটা ঘটত না এমন অকস্মাৎ, আজ পর্যন্ত ওকে যার জের টানতে হচ্ছে। খেদ হয় না কি আর? খুবই হয়। কিন্তু এখনও আর কী হবে এ নিয়ে আক্ষেপ ক'রে - যদিও অবুঝ মন ওর তবু আক্ষেপ করে যদি কথাটা মুখ ফস্কে ওভাবে বেরিয়ে না যেত সেদিন! হায় রে 'যদি'!

ছায়া জানত যে অসিতের কলকাতা ভালো লাগে না। সত্যিই লাগত না। কলকাতায় ওর আত্মীয় ছিল এত বেশি যে ও শান্তি পেত না। তারা ওকে স্নেহ করত না এমন নয়—কিন্তু তার মধ্যে ছিল বেশ একটু পৃষ্ঠপোষকী সুর। তাছাড়া মানুষ যে বদ্‌লায় একথা সবাই বোঝে বোঝে না কেবল আত্মীয়—বিশেষ তারা যারা শৈশবে করেছে আধিপত্য। তারা ওকে চাইত নিজেদের মতন ক'রে। বুঝেও বুঝতে চাইত না যে যে-অসিতকে তারা একদিন চেয়েছে প'ড়ে-পাওয়া আত্মীয়তার লেনদেনের মধ্যে সে-অসিতকে আজ আর চাইলেই ফিরে-পাওয়া যায় না-যেতে পারে না। অথচ একথাও তাদেরকে মুখের উপর বলা যায় না—তাই তারা আরো সুবিধে পায়—চায় ওকে সেই মামুলি আত্মীয়তার জালে গুটিয়ে সামাজিকতার ডাঙায় তুলতে। অসিত এতে দারুণ অস্বস্তি বোধ করত ব'লেই যেন একটু বেশি স্বস্তি পেত দেবদার বাড়িতে—যেখানে অজ্ঞ আত্মীয়দের বেষ্টনী থেকে মিলত খানিকটা অব্যাহতি। কিন্তু এজন্যেও আত্মীয়দের নানা টিপ্পনি ওর কানে আসত। অসিত একেবারেই পছন্দ করত না এধরণের মন্তব্য। কলকাতায় না-আসতে পাওয়ারও এ ছিল একটা প্রধান কারণ।

এ-অস্বস্তির কথাও দেবদাদের কাছে বলে নি অবশ্য—কিন্তু দেবদা

টের পেয়েছিল। তাই অসিত দেবদাদের ওখানে আশ্রয় নিলে দেবদা ওকে খানিকটা রক্ষা করত—যাদের সঙ্গে ও চাইত না দেখাসাক্ষাৎ—তাদের দিত ভাগিয়ে। অসিত এজন্যে দেবদার কাছে বড় কৃতজ্ঞ বোধ করত।

ছায়ারা কেউ জানত না অসিতের এই অস্বস্তি ও কৃতজ্ঞতার কথা। শুধু মেয়েরা এসব বড় একটা কল্পনা করতে পারে না ব'লেই নয়—অসিতের মধ্যেও যে এ-ধরণের সূক্ষ্ম বিরাগ থাকতে পারে তা জানবার তাদের উপায় ছিল না। অভিজ্ঞতার মধ্যে খানিকটা নানামুখিতা না থাকলে এধরণের কুণ্ঠা বোঝা একটু কঠিন হয়। তাছাড়া ছায়াদের কারুর কাছে একথা ও মুখ ফুটে বলেই বা কেমন ক'রে যে কোন গণ্ডীর মধ্যে কেউ ওকে বাঁধতে চাইলে আজকাল ওর নিশ্বাস বন্ধ হ'য়ে আসে? মমতার এলাকায়ই যাদের বসবাস তাদের কাছে বলতে যাবে না কি যে সন্ন্যাসীদের পরিব্রাজক হওয়ার একটা কারণ—মমতার হাজারো সূক্ষ্ম দাবিদাওয়ার মধ্যে মুমুক্ষু জীব দুঃখ পায়?

অনেকদিন বাদে আনন্দর সঙ্গে যখন ওর দেখা হ'ল তখন অসিতের বুক দশ হাত হ'য়ে উঠেছিল আরো এইজন্যেই—ব্যথার ব্যথী পেয়ে। আনন্দ ওর কথায় পূর্ণ সায় দিয়ে বলত: "বিলক্ষণ! এতে কুণ্ঠিত হবার কী আছে? এই-ই তো সুলক্ষণ। মুক্তিও চাইব অথচ সমাজ-বন্ধনে দুঃখ পাব না—দুই হয় না—you can't both eat your cake and have it—সন্ন্যাসীরা নামান্তর নেয়ও তো আরো এই জন্যেই: জন্মের সুবাদে পাওয়া যে সব সম্বন্ধ তাকে অস্বীকার করেতে চেয়ে। যে-আত্মীয়তা আত্মার সাধকের ভার তার 'পরেই—রক্তের সম্বন্ধ বলতে মানুষ যা যা মেনে নেয় সন্ন্যাসী সেসব মেনে নিলে স্বধর্মচ্যুত হ'তে বাধ্য।"

কথাটা অসিতও বুঝেছিল—বিশেষ ক'রে প্রথম বার কলকতায় এসে—যখন ও প্রথম দিকে আত্মীয়দের আদর যত্নের আবর্তে প'ড়ে গিয়েছিল।

ও হাঁপিয়ে উঠত তাদের সেই সব আগেকার দাবিদাওয়া দেখে। তখন বুঝত না যে বাইরে দেখতে ও ঠিক তেমনিটি থাকলে কী হয় ভিতরের সে-অসিত ম'রে ভূত হ'য়ে গেছে—বিশেষ ক'রে এই সব আত্মীয়কুটুম্বিতার গলাগলি ব্যাপারে। দেবদাদের আত্মীয়তাহীন স্নেহের পরিবেশে তাই ও অনেকটা হাঁপ ছেড়ে বেঁচেছিল। বিশেষ এই আত্মীয়রক্ত থেকে খানিকটা বেরিয়ে আসতে পেরে।

কিন্তু দেবদাদের স্নেহযত্নও যে বন্ধন একথা ওর মনের অগোচর ছিল না। তবে ছায়ার জন্যে ও মনকে খানিকটা ভুলিয়ে পাতিয়ে নিরস্ত করত যখন সে ওকে বলত—সাবধান! কিন্তু নিরস্ত করা যায় কদিন? আনন্দর উজ্জ্বল নিরাত্মীয় অনিকেত মূর্ত্তি দেখে ওর বুকের মধ্যে নিরাশ্রয় হবার সুপ্ত ক্ষুধা যে ফের উঠল জেগে। এমনি সময়ে প্রীতি ও ছায়া এসে হাজির এলাহাবাদে—অর্থাৎ ঠিক যখন আনন্দর সদানন্দ অথচ নির্লিপ্ত মুক্তগতি দেখে ও বুঝতে সুরু করেছে কী ছন্দ ওর কাম্য অথচ ও হেলায় হারাচ্ছে ফের নতুন বন্ধনে জড়িয়ে। কারণ যতই ও নিজেকে বোঝাক না,মনে মনে বুঝত যে ছায়ার প্রতি ওর যে-স্নেহ তার মধ্যেও একটা সূক্ষ্ম মমতার ভাব লুকিয়ে আছে—যাকে কোনো না কোনো সময়ে ওর কাটাতেই হবে।

ছায়াকে দেখে আনন্দও বুঝেছিল একথা তাই ওকে সাবধান ক'রে দিয়েছিল এই ব'লে যে সাধনার পথে অনেক বাধাই আসে ছদ্মবেশে। আন্তরিকতার দাবী সব চেয়ে নিষ্করুণ হয় সাধনায় কেননা সাধনা চায় আমাদের প্রবৃত্তির ছন্দবলি—যখন সংসার চায় প্রকৃতির তাঁবেদার হওয়ার স্বপক্ষে হাজারো যুক্তি ফেঁদে প্রবৃত্তির সুরেই সুর মিলিয়ে চলার দীক্ষা দিতে। সংসার থেকে খানিকটা বিচ্ছিন্ন হতে না পারলে নিজের স্বরূপকে দেখা যায় না নিস্পৃহ চোখে। নিস্পৃহতা বিনা জ্ঞান অসম্ভব, যেমন জ্ঞান বিনা অসম্ভব মুক্তি।

এসব কথা প্রীতি ও কমলার সাম্‌নেই হ'ত। কমলা বুঝত, কিন্তু প্রীতি বুঝত না। প্রীতির কাছে নির্লিপ্ত কথাটা নির্মমতারই সামিল মনে হ'ত! অসিত ভাষ্য করত না—কেন না বুঝত তাতে ক'রে ওকে ব্যথা দেওয়াই হবে।

ছায়াকে প্রীতি কিছু কিছু বুঝিয়ে দিত আনন্দর কথা। ছায়া কতটা বুঝত কে জানে—তবে মুখখানি যে ওর ম্লান দেখাত এটা সবার চোখেই পড়েছিল। কোনো কিছুই তো ও লুকোতে পারত না।

প্রীতি মাঝে মাঝে অসিতকে একান্তে বলত ছায়ার দুঃখের কথা। আনন্দের মুখে নির্লিপ্তির বাণী শুনে ছায়ার বেদনা পাওয়ার কথায় ওকে বাজত, কিন্তু অসিতকে ওর আত্মীয়রা বোঝে না এজন্য ছায়ার আক্ষেপের কথা শুনেও আবার মন ওর আর্দ্র হ'য়ে উঠত। তখন ও ছায়াকে যেন আরো আদর ক'রে গান শেখাত। আহা, বেচারি মেয়ে, আত্মীয় স্বজন ছেড়ে ওর জন্তে এসেছে ছুটে এত দূরে—ওর কাছে কেনই বা এই সব মোহমুদ্গার আওড়ানো!

ছায়া ওর স্নেহসজলতায় খুবই উৎফুল্ল হয়ে উঠত বৈকি—কিন্তু তবু কিছুতেই ওর মন নিত না যে এভাবে জোড়াতাড়া দিয়ে গরমিলটা মিল হ'য়ে দাঁড়ায়। শুধু তাই নয়, একথাও ও বুঝত যে গরমিলের সঙ্গে রফার নামই গোঁজামিল। ওর সত্যপ্রিয় মন সব সইতে পারত সইতে পারত না শুধু এই গোঁজামিল। তাই থেকে থেকে নির্জন পেলেই অসিতকে জিজ্ঞাসা করত যে স্নেহ ভালোবাসার ধর্মই তো কাছে চাওয়া তাতে দোষের প্রশ্ন ওঠে কেন? অসিত বলত আনন্দকে জিজ্ঞাসা করতে। ছায়া ডরিয়ে উঠত: "ও বাবা। সে আমি ম'রে গেলেও পারব না—অতবড় যোগী!" অসিত ভেবেচিন্তে একদিন আনন্দকে নিমন্ত্রণ করল নিভার ওখানে খেতে।

উদ্দেশ্য ওর সিদ্ধ হ'ল। আনন্দ ছায়ার গান শুনতে চাইল খাওয়া

দাওয়ার পর। ছায়া গাইল "বৃন্দাবনের লীলা অভিরাম সবই…" আনন্দকে অসিত আগে থাকতেই টিপে দিয়েছিল। আনন্দ গান শুনে ছায়াকে বলল: "ভক্তির গান যে এমন গায় সে কী ক'রে ভাবতে পারে তার ভক্তি নেই? জানো আমাদের ভাষায় একটি কথা মুখে মুখে প্রায় শ্লোকের মতনই আবৃত্ত হয় 'He best can point them who shall feel them most."

আনন্দর কাছে এধরণের প্রশংসা পাবে ছায়া ভাবে নি। ওর সংকোচ অনেকটা কেটে গেল। এ কথায় সে কথায় ও বাংলাতেই প্রশ্ন করল আনন্দর বাড়ি ফিরতে ইচ্ছা করে কি না।

আনন্দ হাসল: "তোমরা যাকে 'বাড়ি' ভাব সেটা তো প'ড়ে পাওয়া বাড়ি ছায়া। নিজের বাড়ি নিজেকে গ'ড়ে নিতে হয়।"

ছায়া বলল: "কিন্তু কেমন ক'রে সে-বাড়িকে নিজের বাড়ি মনে করব যে-বাড়িতে আমি জন্মাই নি?"

"আনন্দ হেসে বলল: এ-প্রশ্ন তোমাকে সাজে না ছায়া। তুমি জন্মেছিলে যখন তখন বেসুরেই চিৎকার করেছিলে তো?"

"এ প্রশ্ন কেন?"

"আহা বলোই না।"

"হাঁ। আঁতুড়ঘরে আবার কে সুরে চেঁচায়?"

"ঠিক কথা। কিন্তু কেন চেঁচায় না ভেবে দেখেছ?"

"কেন? সুর না সাধলে গলা সুরে বসে কখনো?"

"পথে এসো" বলল আনন্দ স্নিগ্ধ স্বরে, "কেন না এ থেকে দেখছ কী তুমি বলছ? তুমি জন্মেছিলে বেসুরের বাড়িতে—অর্থাৎ তোমার এমন অপরূপ কণ্ঠও বেসুরের সঙ্গেই ঘর ক'রে এসেছে জন্ম থেকে—এবং বেশির ভাগ সময়েই। কিন্তু আজ বলো তো যে-সুরে তুমি গলা সেধেছ বড়

হয়ে এবং যাকে জন্ম থেকে চেনো নি সেই সুরের মহলেই তোমার আপন বাসা মনে হয় কি না ?"

ছায়া উপমা শুনে মুগ্ধ হ'ল, অসিতের দিকে চেয়ে বলল : "উনি কী সুন্দর কথা বলেন অসিদা ?"

আনন্দ বলল : "কিন্তু ঐখানেও দেখ। সুন্দর কথা হাজার সুন্দর হোক তবু সুন্দর গানের সমান নয়—হ'তে পারে না। শুধু তাই না, সুন্দর কথা হাজার বলো না কেন তার মধ্যে হৃদয় আমাদের সে-আশ্রয় পায় না যে-আশ্রয় পায় সুন্দর গানে। গোপীরা শ্রীকৃষ্ণের সুন্দর কথা ভালোবাসত কিন্তু পাগল হ'য়ে যেত তাঁর গানে, বাঁশিতে—জানো তো ?"

ছায়া বলল : "শুনেছি। আচ্ছা—শ্রীকৃষ্ণ কি সত্যি ছিলেন ?"

আনন্দ বলল : "এ-প্রশ্ন অবান্তর। তবে প্রশ্নটিকে ঘুরিয়ে করতে পারতে : যা চোখে দেখি তা-ই কি সব চেয়ে সত্য – না যা অনুভবে পাই তাই সব চেয়ে বেশি সত্য ? শ্রীকৃষ্ণকে হৃদয়ের মধ্যে ডাকলে সেখানে তিনি বাঁশি বাজান হৃদয় হ'য়ে ওঠে তাঁর লীলাভূমি বৃন্দাবন এই কথাই হ'ল তাঁর থাকার সবচেয়ে বড় সাক্ষ্য। তুমি এইমাত্র 'বৃন্দাবনের লীলা অভিরাম' যে-গানটি গাইলে ওর শেষের লাইন কয়টিতে কী খবর দিলে বলো তো ? না, গুণ গুণ ক'রে গাও তো ফের—অসিতের এ গানটি আমার সবচেয়ে প্রিয়।"

ছায়া খুসি হ'য়ে বলল : "আমারো।"

আনন্দ বলল : "আচ্ছা—তবে গাও শেষের চরণ কয়টি ফের।"

ছায়া গাইল :

"ওরা হাসে সব : 'বলে হায় রে অলীক স্বপন' !
বলে : 'কৃষ্ণকাহিনী কল্পনা—কবি-কথন'

আখর

ওরা হাসে

ওরা জানে না তাই হাসে

ওরা জানে না—তাই মানে না

আমি জানি—তাই মানি

তুমি এসেছিলে—ভালোবেসেছিলে

শুধু এসেছিলে নয়—আছ

বঁধু আজো—প্রতি বুকে বুকে তুমি বাজো

আমি জানি

আমি অন্তরে তব বাঁশরী শুনেছি, তাই বঁধু জানি জানি।"

আনন্দ চোখ বুঁজে শুনছিল, হঠাৎ চোখে ওর ধারা গড়িয়ে পড়ল। ছায়া মুগ্ধ হ'ল দেখে। থেমে গেল।

আনন্দ চোখ খুলল: "থেমে গেলে কেন?"

ছায়া অস্ফুট স্বরে কী যেন বলল।

অসিত বলল: "তোমার ভাবাবস্থা দেখে হে—আর কেন?"

আনন্দ বলল: "আমি শুনছিলাম তাঁর বাঁশি—স্পষ্ট—সত্যি বলছি।"

ছায়া খুব আশ্চর্য হ'ল, কিন্তু কিছু কথা বলল না—শুধু একবার তাকালো অসিতের দিকে।

আনন্দ বলল: "এই যে আমি বৃন্দাবনের গান শুনে বিহ্বল হই ছায়া কেন ভেবে দেখেছ?"

ছায়া একটু ভেবে বলল: "কারণ ভক্তিতে আপনি মুগ্ধ হন।"

আনন্দ হেসে বলল: "কিন্তু কেন মুগ্ধ হই? কারণ অভক্তির মধ্যে সে-আশ্রয় পাই নে যে-আশ্রয় পাই ভক্তির মধ্যে। অথচ যে-দেশে যে-পরিবেশে আমার জন্ম সেখানে বিচার তর্ক বুদ্ধিরই জয়জয়কার। এ

ধরণের উচ্ছ্বাস ভক্তিকে সেখানে লোকে শুধু অবিশ্বাস নয় অশ্রদ্ধার চোখে দেখে।

'অথচ," বলল আনন্দ একটু থেমে, "তবু ভক্তির মধ্যে কেমন ক'রে আমি এমন সহজে আশ্রয় পেলাম—কেন আমার মনে হয় বিলেতে বড় জোর আমি বাসা বেঁধেছিলাম মাত্র – দুটো দিনের জন্যে? কেন মনে হয় তোমাদের দেশে এসে যে এ-ই আমার স্বদেশ?—বৃন্দাবনের গান শুনলে কেন মনে হয় বৃন্দাবনেই আমার চিরকালের ঘর বাড়ি?"

প্রীতি বলল: "কিন্তু এ কি কল্পনা হ'তে পারে না!"

আনন্দ বলল: "সাদা চোখে যা দেখি তা-ই সত্য আর হৃদয়ের চোখে যা দেখি সেটা কল্পনা এই ভুল ধারণাই তো আমাদের পথে বসিয়েছে। তাই আমরা আজো স্বজন চিনতে বেগ পাই—স্বদেশ বলতে বুঝি সেই পান্থশালা যেখানে পথচলার দুদিনের জন্যে দুটো দানা পানি পাই – আপনার জন বলতে বুঝি শুধু সেই সব আত্মীয়দের যাদের জন্ম দেখেছি সব চেয়ে কাছে। কিন্তু অন্তরের সত্যকে পেতে হ'লে সাদাচোখের দৃষ্টি দিয়ে দেখার বদভ্যাসটি ছাড়তে হয়—সুরে যখন গাইতে চাই তখন বেসুরের পিছুটান ভুলতে হয় নৈলে দেখা যায় না সেই গভীর সত্য যা সাদাচোখের নাগালের বাইরে, শোনা যায় না সেই সব ব্যঞ্জনা যারা সুর-না-সাধা কানে ঢুকবার পথ পায় না।" ব'লে ছায়ার দিকে ফের চেয়ে বলল: "না ছায়া, যখন আরো একটু বড় হবে দেখতে পাবে যে যে-চোখ গভীরের দীক্ষা নেয় নি সে যা কিছু দেখে তা দর্শনীয় নয় —অর্থাৎ হাজার দেখলেও মনে হয় না দেখা সার্থক, ঠিক যেমন সুর সাধলে বুঝতে পারো যে সুর-সাধা কণ্ঠে যে-গান বেরোয় শুধু সে-গানেই মন ভরে, বেসুরা গোলমালে না। যা আমাদের সব চেয়ে আপন তাকে চিনতে হ'লে তারই শরণ নিতে হয়। তাহ'লে সেই দেখিয়ে দেয় যে তার

চেয়ে আপন জন আর কেউ নেই। সেদিন তুমি একটা গান গাইলে। জহরলালের সামনে আমার বড় ভালো লেগেছিল দুটি লাইন—

জো নজর আতে হঁয় নহি অপনে

জো হয় আপনা নজর নহি আতা *

এ-ই হ'ল সব চেয়ে বড় সত্য কল্পনা তো আসলে কল্পনা নয় ভাই—গভীর দৃষ্টিতে যা দেখা যায় তাকে অগভীর দৃষ্টিতে দেখা যায় না ব'লেই' এ-সন্দেহ আসে।"

ছায়া মুগ্ধ হ'ল কথাগুলি শুনে, কিন্তু কিছু বলল না। অসিতের ভারি আনন্দ।

প্রীতি বলল : একটা কথা যদি জিজ্ঞাসা করি কিছু মনে করবেন না। সবই তো বুঝলাম, কিন্তু এদেশে এসে আপনি এই যে র'য়ে গেলেন, অসিদার মুখে শুনেছি দেশে আর যেতেও চান না—এটা কিন্তু—" ব'লেই থেমে গেল

আনন্দ হাসল, বলল : "কিন্তু কি ? বলো।"

প্রীতি বলল : "তাঁদের দেখতে আপনার ইচ্ছা করে না সত্যিই ? ভাবতে কেমন কেমন লাগে ?"

"কাদের ?"

"আপনার আপনজনদের—আর কাদের ?"

"কিন্তু আমার আপন জন তো তারা নয়—আমার আপন জন—শ্রীকৃষ্ণ।"

প্রীতি বিব্রত হ'য়ে পড়ল বলল "তবু মানে তাঁদের মধ্যেই তো আপনি মানুষ হয়েছেন ?"

* যা কিছু সব চোখে পড়ে তাহারা নয় আপন। যা আপন তা-ই পড়েনি চোখে।

আনন্দ হাসল : "মাটির প্রদীপে যখন শিখা জ্বলে তখন কি বলবে যে শিখার আত্মীয়তা মাটির সঙ্গে, না সূর্যচন্দ্রতারার সঙ্গে ?"

প্রীতি কী বলতে গিয়ে চুপ ক'রে গেল। আনন্দই ফের কথা বলল : "গীতায় একটা শ্লোক আছে বড় চমৎকার।

যা নিশা সর্বভূতানাং তস্মিন্ জাগর্তি সংযমী
যস্যাং জাগ্রতি ভূতানি সা নিশা পশ্যতো মুনেঃ।

এ কথার নানা টীকা হয় এবং সবগুলিই গভীর সত্য। একটা ভাষ্য হ'ল এই যে, উচ্চ চেতনা থেকে যাকে সত্য মনে হয় নিম্ন চেতনা থেকে তাকে মনে হয় মিথ্যে, কাজেই এর উল্টোটাও সমান সত্যি : অর্থাৎ নিম্ন চেতনা থেকে যাকে মনে হয় অকাট্য, উচ্চচেতনা থেকে তাকে মনে হয় অগ্রাহ্য। সাধারণ ঘরোয়া চেতনায় ঘরকেই মনে হয় সত্যি, শিশুর কাছে লাল চুষিকাঠিটার চেয়ে সত্য কমই আছে। কিন্তু তাই ব'লে কি বলবে শিশুর ধারণাটাই সত্য, আর প্রবীণদের ধারণাটা ভুল—যে চুষিকাঠির মধ্যে অমৃত নেই।" ব'লেই ছায়ার দিকে চেয়ে ফের বলল : "তোমার গানের উপমা দিলে হয়ত একথাটা আরো পরিষ্কার হবে। তোমার ছোট বোন আছে না ? কত বয়স তার ?"

ছায়া বলল : "আট।"

আনন্দ বলল : "আচ্ছা। তাকে যদি জিজ্ঞাসা করো অমুক জায়গায় ভালুক নাচ হচ্ছে দেখতে যাবি, না মহাত্মা গান্ধির সামনে তোর দিদির নতুন শেখা হিন্দি ভজন গাওয়া হবে শুনতে যাবি ? ধরো বললে—যেকথা অসিত আমায় বলছিল—মহাত্মা গান্ধির ওখানে খোলা ছাদে শ্রীমতী ছায়া দেবীর গান যা জমে—উঃ। হাজার বলো না কেন ভবী কি ভুলবে ? সে বলবে—হোক্ গে, আমি ভালুক নাচই দেখতে যাব। কেন বলে ? না, ভালুক নাচের আনন্দ তার কাছে যেভাবে সত্য শ্রীমতী ছায়া

দেবীর নাইটিংগেল ভক্তির গান তার কাছে তার সিকির সিকি সত্য নয়। বটে তো?"

ছায়া বলল: "আপনিও ঠাট্টা ধরলেন?"

আনন্দ হেসে বলল: "না ভাই। তোমার কণ্ঠ অপূর্ব এটা মুখের উপর বলা কঠিন ব'লেই একটু ঘুরিয়ে বলছি আর কি।"

ছায়া বলল: "কিন্তু এ থেকে কী বলতে চাইছেন।"

আনন্দ বলল: "যারা আত্মীয় স্বজন গৃহসুখের মধ্যে বাস করে—ভগবানের জন্যে কিছু ছাড়ে নি তাদের বোঝানো দায় যে আত্মীয় স্বজনের আদর যত্ন বিস্বাদ লাগে ভগবানের স্নেহস্পর্শের একটু স্বাদ পেলে। না—এর চেয়েও বেশি বলা যায়। অসিতকেই জিজ্ঞাসা করো না—কেমন ক'রে দিনে দিনে আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে ওর ছাড়াছাড়ি হয়ে যাচ্ছে। যারা ভগবানকে চায় আর যারা ভগবানকে চায় না তারা হাজার কাছাকাছি বাস করুক না কেন তাদের মধ্যে যে-ব্যবধান তার ওপর দিয়ে এমন কি সেতুও বাঁধা চলে না।—ও কী, কী হ'ল?"

ছায়ার চোখদুটিতে হঠাৎ জল ভ'রে এসেছিল। ও চোখে কী পড়ল ব'লেই উঠে গেল। প্রীতি একটু ব'সে থেকে উঠে গেল "আসছি অসিদা" ব'লে।

আনন্দ একটু অপ্রতিভ সুরে অসিতের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করল: "কী হ'ল হঠাৎ?"

অসিত একটু চুপ ক'রে থেকে বলল: "ও বলে ভগবানকে-পাওয়া কাকে বলে তা ও ঠিক বোঝে না।"

আনন্দ বলল: "ও।" ব'লে একটু থেমে: "কিন্তু ওর ও-কথাটা ভুল অসিত।"

"কোন্?"

"যে ভগবানকে চাওয়া কাকে বলে ও বোঝে না। যদি না চাইত তবে—"

"কী?"

"বলব খোলাখুলি?"

অসিত একটু দুঃখিত কণ্ঠে বলল: "তুমিও ভেবেচিন্তে তবে আমাকে বলবে তোমার মনের কথা?

আনন্দ কোমল কণ্ঠে বলল: "তা নয়, তবে—না, আমি বলতে যাচ্ছিলাম এমন কিছু নয়। শুধু এই কথাটা আমার মনে হয়েছে যে ছায়া তোমাকে যে-ভাবে ভক্তি করে একজন নাস্তিকের মনে সে-ভক্তি আশ্রয়ই পেত না।"

"কেন আনন্দ? নাস্তিকদের মধ্যে কি সত্য মানুষ নেই?"

"তা কে বলছে? তবে ভক্তি নেই—না এখানে আমি ভক্তি বলতে ভক্তিই বুঝছি যাকে ইংরাজিতে বলে reverence সে-বস্তু নয়।"

"কিন্তু ভক্তি "

"শোনো অসিত। তুমি স্বভাবে পূজারী—শৈশব থেকেই কৃষ্ণকে ডেকেছ, তোমার কাছে ভক্তি কী বস্তু বলতে যাওয়া বিড়ম্বনা। কিন্তু তবু আমার মনে হয় যে কালাপানির ওপারে একবার গেলেও যে-ধরণের উদারতার ছোঁয়াচ লাগে সে ধরণের উদারতা—catholicity—থাটি ভক্তির অনুকূল নয়। কারণ সে-দেশে সব থাকতে পারে কিন্তু ভক্তি নেই। অথচ একথা আমরা আজো জানার মতন ক'রে জানি না—তাই য়ুং-এর মতন বিজ্ঞ লোকও ভক্তিকে পরীক্ষা করতে ছোটেন সাইকো-আনালিসিসের মাইক্রোস্কোপে। যেন বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে কোনো গভীর সত্যের হদিশ পাওয়া কখনো সম্ভব! না অসিত তুমি ধোরো না ওদের ব্লীফ্। তোমার ঐ গানেই বলেছ মনে রেখো

ওরা জানে না তাই মানেনা *
হায় আঁখি থেকে যারা অন্ধ
তারা কী জানে দেখার ছন্দ ?
যারা পাবে না সুদূরে কান
তারা কী জানে প্রাণের গান
হায় সুদূরের হাওয়া হৃদয়ে তাদের
মধুরের বাণী আনে না।

এ-আঁখরগুলি ছায়াকে শেখাও নি তো।"

অসিত হাসল : "এগুলি আমি সব সময়ে দিই না।"

"কেন ?"

"মনে হয় 'ওদের' একটু বেশি ধমকানো হ'য়ে যাচ্ছে।"

"একটুও না" বলল আনন্দ হো হো ক'রে হেসে। "না এ আঁখর গুলিও তুমি ছায়ার গলায় তুলে দিও। আহা কী চমৎকার গায় ও। হ্যাঁ—এই জন্যেই আমি বলেছিলাম যে ভক্তি ওর স্বধর্ম। তুমি কেন ওকে বুঝতে পারো না ?"

"বুঝতে পারি না ?"

"না। অসিত, আমাদের নিজের স্বরূপের কতটুকু আমরা জানি বলো তো ? কত কী স্বপ্ন দেখি রোজ ভেবে দেখেছ কী ? কেন আসে এসব স্বপ্ন ? তারা কি নিরর্থক ?"

"কী বলতে চাইছ তুমি ?"

"যে, আমরা নিজেকে যেদিন সত্যি চিনি সেদিন ভগবানকেও চিনি ! আর যতদিন তা না চিনি ততদিন আমরা সবাই কম বেশি নাস্তিক।"

"তাহ'লে ওকথা তুমি বললে কেন যে ভগবানকে যারা চায় আর যারা চায় না তাদের মধ্যে ব্যবধান এত বেশি যে সেতু বাঁধাও অসম্ভব ?"

"কারন সেতু বাঁধে মন ; যত্‌ক্ষণ জ্ঞানের দেউড়ির কাছাকাছিও না

পৌঁছই ততক্ষণই এসব কথার মূল্য। কিন্তু তবু একটু আধটু আভাস আমরা পাই দূর থেকেও। এরই নাম ইনটুইশন। ছায়ার মধ্যে যে অস্বীকারের কথা মনে ক'রে তুমি দুঃখ পাও সেটা নাস্তিকতা নয়—তার নাম পাছে সত্যের নামে অসত্য এসে পড়ে সেই ভয়ে নিজেকে কঠিন করা। এ আমার কোনো মনগড়া থিওরি নয় অসিত। কারণ মনে রেখো নাস্তিকে সব কিছু পারতে পারে কেবল পারে না একটি জিনিস।"

"কী!"

"গানে ভক্তির ঝর্ণা বইয়ে দিতে।"

* * * * *

অসিতের এত অনুতাপ হয়। একথা নানাসময়ে ওরও যে মনে হয় নি তা নয়—ছায়ার গানে যে ভক্তির ঝর্না অঝোরে ঝ'রে পড়ে এ যে দেখেছে সে কেমন ক'রে মানবে ও-মেয়ে আস্তিক নয়? অচ্ছা তবু… কেন এমন হয়? মনটা ওর ব্যথিয়ে ওঠে।

* * * * *

আনন্দ বিদায় নেওয়ার পরে ও বাহিরে একটা ছায়াভরা বীথিকার মধ্যে পায়চারি করে। হঠাৎ দেখে একটা বেদীতে চুপ ক'রে ব'সে ছায়া। অসিত ওর পাশে গিয়ে ব'সে ওর কণ্ঠবেষ্টন ক'রে বলে:

"কী রে? বেড়াতে গেলি নে মোটরে মাসিমার সঙ্গে?"

ছায়া ওকে দেখতে পায় নি। চমকে উঠেই হাসে. কিন্তু নিরুত্তর ম্লান হাসি।

অসিত ওর চিবুক ধ'রে ওর মুখখানি তুলে ধ'রে বলে: "তাকা তো আমার দিকে? এবার বল্ কী হয়েছে?"

ছায়া ওর বুকের মধ্যে মুখ লুকিয়ে থাকে। কথা কয়না তবু।

"কী হ'ল ফের? শোন্?"

"ভয় নেই অসিদা। অত কাঁদুনে আমি নই অ বললে।"

অসিত ইচ্ছে ক'রেই ধরে ঠাট্টার সুর: "আনন্দের সামনে বুঝি মনে ছিল না একথা। —ও কি আবার মুখখানা অমন মেঘলা হ'য়ে গেল কেন?"

"তা-ও কি বলতে হবে অসিদা?"

অসিত আদরের সুরে বলে: "কিন্তু ও তোর সম্বন্ধে কি বলছিল জানিস?"

"কখন?"

"তুই জলভরা চোখে আসার পরে।"

"কী?" ছায়ার কণ্ঠে ঔৎসুক্যের ভাষা লাগে।

"বললে আমাকে বকবি না বল্?"

"কী যে বলো অসিদা! ঠাট্টা ক'রেও অমন কথা বলতে আছে?"

"ঐ—ঐ কথাই বলছিল ও।"

"কী কথা?"

"যে আমাকে তুই যেভাবে ভক্তি করিস সেভাবে ভক্তি করা তোর পক্ষে সম্ভব হ'ত না যদি তুই নাস্তিক মেয়ে হ'তিস।"

"কিন্তু তোমরাই তো বলো যে ভগবানকে যে জানতে চায় না সে-ই নাস্তিক।"

"জানতে চায় না—না মানতে চায় না?"

"একই কথা।"

"না এই কথাই ও বলছিল।"

"কী বলছিল বলবে না. কেবল—"

"বলছিল নাস্তিকের কণ্ঠে আর সবই ঝরতে পারে কেবল ভক্তির ঝর্ণা না।"

"কিন্তু—"

"কী!"

"থাক গে।"

"না। বলবি না তো। বেশ। এবার যদি আমি চোখ ছলছলিয়ে উঠি দুঃখে?"

"পারো?" হেসে ওঠে ও। কিন্তু তার পরেই গম্ভীর হ'য়ে বলে: "শোনো অসিদা। উনি বলছিলেন যে ভগবানের করুণার স্বাদ পেলে আত্মীয় স্বজনের স্নেহ বিস্বাদ লাগে। কই আমার তো লাগে না?"

"একদিন আমারো লাগত না ভাই।"

"এখন লাগে?"

"বিস্বাদ লাগে বললে ভুল বলা হবে—তবে—"

"তবে কী?"

"বললে হয়ত ফের তোর কষ্ট হবে।"

"না হবে না। বলো। দুটি পায়ে পড়ি তোমার।"

অসিত কোমল কণ্ঠে বলে: "কি জানিস দিদি? আত্মীয় স্বজনের স্নেহে যখন আসক্তির ভাবটা জোরালো হ'য়ে ওঠে তখন তার দরুণ একটা টানাটানি হয়।"

"টানাটানি!"

"ভগবানের পথে টানেন যিনি তাঁর টানের সঙ্গে বাধে সংসারের আসক্তির দাবি দাওয়ার টান। কাজেই এমন সময় আসেই যখন মন অতিষ্ঠ হ'য়ে ওঠে দেখে যে, সাংসারিক স্নেহ ভালোবাসা টানে পিছন দিকে তাদের হাজারো দাবি দাওয়ার আঁকশি দিয়ে।"

"ও—" ছায়া একটু ভাবে, পরে ম্লান কণ্ঠে বলে: "কিন্তু সংসারের স্নেহ ভালোবাসা—মানে—ফের একটু থেমে: "আমি বলতে চাইছিলাম—আত্মীয়তা হ'লে যে দাবি দাওয়া আসবেই এমন তো কোনো কথা নেই।"

"থিওরিতে নেই—কিন্তু কার্যক্ষেত্রে হয় এইটেই।"

"কিন্তু না হ'তেও তো পারে অসিদা? ধরো বাণীর কথা। সে কি খুব দাবি করে কারুর কাছে? অথচ ভালো তো বাসে।"

"সংসারে যাকে দাবি মনে হয় না যোগে যে তাকেও দাবি মনে হয় দিদি!"

"এ কেমন কথা?"

"ধর্ প্রত্যাশাকে সংসারে দাবি মনে করে না—যেমন কেউ কিছু দিলে ফিরে পাওয়ার ইচ্ছে।"

ছায়া একটু আশ্চর্য হ'য়ে বলল: "মানে? ধরো যদি তুমি আমাকে ভালোবাসো তাহ'লে আমার ভালোবাসার প্রতিদানও—"

"না যোগে সব রকমের প্রতিদান চাওয়াই মানা।"

"ভালোবাসাও তাহ'লে মানা?"

"না। কিন্তু ভালোবাসতে হবে নিজেকে দিতে, কিছু ফিরে পেতে হয়।"

"নিজেকে তো দিতেই হবে, কিন্তু—"

"তাই তো বলছিলাম দিদি, সত্যের স—ব শুনতে চাসনি—কষ্ট তাতে বাড়ে অনেক সময়েই।"

ছায়া উদ্দীপ্ত কণ্ঠে বলল: এ কেমন কথা অসিদা? কষ্ট হবে বলে সত্য শুনতে চাইব না? কষ্ট কি এতই বড়?"

অসিত ওর মুখখানা বুকের 'পরে টেনে নিয়ে বলল: "এই-ই তো চাই নয়নতারা! আর এইজন্যই বুঝি আনন্দর তোকে আস্তিক মনে হয়—বলে এ তার অব্যর্থ ইনটুইশন।"

"বুঝলাম না ঠিক।"

"ও প্রায়ই বলে অঙ্গীকার যদি নিশ্ছিদ্র হয় তবে সেটা অঙ্গীকারের

নামান্তর। ভগবানকে শত্রুভাবেও ভজনা করা সম্ভব—বলেছে ভাগবত।—কিন্তু যাক এসব কথা।"

"কেন? আমি বুঝতে পারব না ব'লে?"

"না দিদি। আমিই ভালো বুঝি না ব'লে।"

"বিনয় রাখো।"

"বিনয় না।"

"নিশ্চয় বিনয়। তুমি তো ভাই আমরা নও যে অবুঝ ব'লে পার পাবে।"

অসিত আর্দ্রকণ্ঠে বলল: "আমাকে এত ভক্তি করিস নে ছায়া।"

"ভক্তির যোগ্য যে তাকে ভক্তি করব না? বা রে!"

"কী করে জানলি—আমি ভক্তির যোগ্য?"

ছায়া হেসে বলল: "এ আমার অব্যর্থ ইনটুইশন।—না অসিদা, হেসে বলছি বটে একথা কিন্তু তা ব'লে কথাটা মিথ্যে নয়!—কিন্তু শোনো, ভালোবাসার কথাটা আমার কাছে ধাঁধা মতন লাগে যে! আমি বলতে যাচ্ছিলাম—ভালো যখন মানুষ বাসে তখন দিতে চায় এ নিশ্চয়। কিন্তু ভালোবাসার প্রতিদানে যখন ভালোবাসা পাই তখন যে বড্ড ভালো লাগে তার কী করব?"

অসিত হেসে বলল: "কে তোকে কী করতে বলছে শুনি?"

ছায়া অনুযোগের সুর ধরল: "তুমি এড়িয়ে যাচ্ছ। আমি কী বলতে চাইছি বেশ জানো—যদিও গুছিয়ে বলতে আমি পারি না।"

"কে বললে?"

"না ওসব আমি শুনতে চাই না। আমি যে কী তা আমি বেশ জানি। একটা মুখ্যু মেয়ে। তাই তুমি আমার কথায় জবাব দিতে চাও না।"

"চাই না?"

"না ভাই—অন্যায় বলেছি। ওটা আমি বলতে চাই নি। কিন্তু যা আমি জানতে চাইছি তুমি বলবে না কেন ?"

"কী জানতে চাইছিস বল্ দেখি খুলে ?" অসিত হাসে।

"না—এখন হাসি নয়। তোমার মুখে ঐ ধরণের কেমন কেমন হাসি দেখলে আমার বলবার যা অল্প অল্প কথা স—ব ঘুলিয়ে যায়। আমি বলছিলাম : ভালোবাসা আগে দেব এ ঠিক। কিন্তু তার পরে যদি ভালোবাসা ফিরে পাই তবে ক্ষতিটা কোন্ খানে ? পাওয়ার জন্যে তো আর দিচ্ছি না।"

অসিত বলল : "ক্ষতি হ'ত না যদি আমাদের স্বভাবের মধ্যে পাওয়ার তৃষ্ণাটা এত প্রবল না হ'ত। কিন্তু একথা তোকে কী ক'রে বোঝাব বল্ যে আমরা যখন কিছু দিই তখন অনেক সময়েই টের পাই না কেন দিচ্ছি। আর পাই না ব'লেই সত্যি সত্যি নিঃস্বার্থ হওয়া এত কঠিন। কারণ মোটা প্রত্যাশাগুলো ছেড়ে দিলেই তো সত্যিকার নিঃস্বার্থ হওয়া যায় না ভাই—সূক্ষ্ম প্রত্যাশা গুলোকেও ছাড়তে হবে নিষ্করুণ হ'য়ে। তা যতদিন না হচ্ছে ততদিন যতই কেন না ভালোবাসি প্রত্যাশার দাবি থাকবেই থাকবে।"

"ও।"

মুখখানি ওর আরো ম্লান হ'য়ে গেল। অসিতের ভারি দুঃখ হ'ল। এসেছিল ওকে আদর ক'রে ওর মনের বিষণ্ণতা কাটাতে অথচ কথায় কথায় কী যে সব ব'লে বসল ? বেচারি আত্মীয় স্বজন ছেড়ে এসেছে এতদূরে—কেন মিছে এসব বলা ওর কাছে ? গীতার নিষেধ মনে পড়ল : "ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদজ্ঞানাং কর্মসঙ্গিনাম্।" যে-সব ভাব নিয়ে কেউ একটা আশ্রয় রচেছে সে-আশ্রয় থেকে তাকে বঞ্চিত করতে নেই ততক্ষণ যতক্ষণ না তার চেয়ে বড় কোনো আশ্রয় সে পায়। না এ ধরণের ভুল আর না। এখন থেকে খুব সাবধানে কথা কইবে। আনন্দর তিরস্কারও

ওকে যেন আরো অনুতপ্ত ক'রে তোলে : ছায়াকে ও কেন বার বার ভুল বুঝে কষ্ট দেয়। এর নাম কি জ্ঞান, না ভালোবাসা?

কিন্তু কী ভাবে মানুষ আর কী যে হয়··অসিত ভাবে আজ সুদূর কাশ্মীরে। যদি তারপরদিনই মুখ ফস্কে না ব'লে ফেলত সেই কথাটা··· কিন্তু তখন কি ও বুঝেছিল যে কথাটার ফল অমন হবে?

বেশ মনে আছে তার পরদিন বিকেলে ছায়া যখন ওর কাছে এল তখন ওর মুখের বিষণ্ণতা প্রায় কেটে গেছে যদিও কী একটা কথা ও বলি বলি ক'রেও যেন মনস্থির করতে পারছে না বলবে কিনা।

"কী রে?" বলে অসিত ওর চিঠিলেখা রেখে। ও লিখছিল গুরুদেবকে একটি চিঠি এসব কথা জানিয়ে। মনে অস্বস্তি ঘনিয়ে এলে ও সব তাঁকে খুলে না লিখে থাকতে পারত না।

"কাকে লিখছ?"

"যাকেই লিখি না। কী হয়েছে বল্ না।"

ছায়া মুখ নিচু ক'রে থাকে।

"বলবি নে?"

"এমন কিছু না—তবে—"

"তবে—কী?"

"মন কেমন করছে—বাড়ি ফিরতে।

অসিত কোথায় যেন ঘা খেল। দুদিন আগেও ছায়া কথা দিয়েছিল, নিজে থেকেই যে আরো পাঁচ ছয় দিন থাকবে। অসিত অবশ্য জানত যে ও থাকবে বলেছিল অসিতের কথা ভেবেই—আনন্দের সাহচর্যে অসিত গভীর তৃপ্তি পাচ্ছে দেখে। এ-ও ও টের পেয়েছিল যে আনন্দকে ছায়া শ্রদ্ধা করলেও কেমন যেন ভয় করত। শুধু ভয়ই না ওর মুখে মুক্তিটুক্তির কথা শুনে কোথায় যেন ঘা খেত। অসিতের এমন কথাও সেদিনই সকালে মনে হয়েছিল যে ছায়াকে আর ধ'রে রাখবে না—দরকার

হয় তো কলকাতায় পৌঁছে ফিরে আনন্দের সঙ্গেই থাকবে আট দশ দিন লক্ষ্ণৌয়ে—কারণ আনন্দরা আর তিন চারদিন বাদে লক্ষ্ণৌ গিয়ে সেখানে পাঁচ ছয় দিন থেকে আলমোরা ফিরবে কথা ছিল। কিন্তু হঠাৎ ছায়ার মুখে 'বাড়ির জন্যে মন কেমন করছে' শুনেই ওর মনের একটা খুব নরম জায়গা উঠল ব্যথিয়ে। ও ব'লে বসল শুষ্ক কণ্ঠে: আচ্ছা চলো আজই রাতে তোমাদের কলকাতা পৌঁছে দিয়ে আসি।"

"আসবে? কোথায়?" ছায়ার মুখ বিবর্ণ হ'য়ে গেল।

"এখানেই। তারপর যাব লক্ষ্ণৌয়ে।"

"কেন?"

"অত কথায় তোমার দরকার কি ছায়া? --না শোনো, ওকথাটা আমি ফিরিয়ে নিচ্ছি। শোন্—কাছে আয়।"

ছায়া এল না।

অসিত ইচ্ছা সত্ত্বেও ওকে ডাকতে পারল না। এত অভিমান কিসের? সব ব্যথাটা কি ওর একার? অসিতের ব্যথাটা কি কিছুই নয়! ও বলল শান্ত শুষ্ক কণ্ঠে: "আমি এখানে ফিরে আসতে চাই কেন তা কি তুমি জানো না? আনন্দর সঙ্গে কত দিন বাদে দেখা। —কিন্তু তা ব'লে তোমাদের আটকে রাখা আমার অন্যায় এ আমি স্বীকার করছি।"

"কী অন্যায় অসিদা? কিছু অন্যায় নয়। বাড়ি দুদিন বাদে যাব তাতে কী হয়েছে। আমি থাকব। তোমার যতদিন ইচ্ছে থাকো। আমি বলব না—'বাড়ির জন্যে মন কেমন করছে'।" ব'লে ও হাসবার চেষ্টা করে: "কেমন খুসি এবার?"

"না।"

ছায়ার মুখে এবার ভয় ছেয়ে আসে: "কেন ভাই? কিছু কি অন্যায় বলেছি।"

অসিতের মায়া হয় কিন্তু তবু ও মন খুলে কথা বলতে পারে না, বলে: বাড়ির জন্যে মন কেমন করাটাও অন্যায় এমন কথা আমি ভাবতে পারি ?"

"তবে কেন তুমি অমন মুখ করছ ভাই ?"

অসিত জোর ক'রে সব মনের গ্লানি ঝেড়ে ফেলতে চেয়ে সহজ সুরে বলতে চেষ্টা করে বলে হাসি টেনে এনে: "আমার মুখই অমনি যে রে। —না শোন্ ছায়া, আমি বলি কি—আনন্দর এক ছাত্রী যাচ্ছে কাল কলকাতা—ও বলছিল আমাকে আজই সকালে। তোরা তার সঙ্গেই যা ফিরে। সে খুব ভালো মেয়ে।"

ছায়া চুপ ক'রে ওর মুখের দিকে চেয়ে রইল, পরে বলল: "ঠিক বলছ তার সঙ্গে আমরা চ'লে গেলে তুমি মনে দুঃখ পাবে না ?"

অসিত হেসে উড়িয়ে দেওয়া সুরে বলল: "পাগল !"

"আচ্ছা তাহ'লে আমরা কালই ফিরব। কেবল তোমাকে কথা দিতে হবে যে এখান থেকেই তুমি ফিরবে কলকাতায়—আলমোড়া যাবে না।"

অসিত মুখ ফ'স্কে ব'লে ফেলল হেসে: "দেখলে তো ছায়ারাণী ! আত্মীয়তা হ'লে কেমন ক'রে দাবি আসে ?"

ছায়ার মুখে আঁধার এল ছেয়ে। ও মুখ ফিরিয়ে দাঁড়াল।

"ও কী রে ? শোন্—কাছে আয় লক্ষ্মীটি—"

"আসছি" ব'লেই ছায়া ছুটে চ'লে গেল। শুনতে পেল ওর ঘরে খিল দেওয়ার শব্দ।

অসিত গেল ওর পেছনে পেছনে। কিন্তু ওর ঘরের পাশেই প্রীতির ঘর সে একটা চিঠি লিখছিল। দোরে টোকা দিতে পারল না। ফিরে এল।

কিন্তু এ-ব্যাপারটা কিছুতেই গুরুদেবকে লিখতে পারল না।

দুপুর বেলা ছায়া এলনা খাওয়ার ঘরে। প্রীতি বলল: "বড় মাথা ধরেছে ওর বলল। ঘুমচ্ছে এখন।"

অসিতের কী যে মন কেমন করতে থাকে…কেন অমন কথা ব'লে ফেলল আচম্‌কা!

* * * *

সেদিন সন্ধ্যাবেলা গান ছিল আনন্দদেরই ওখানে। গেল ওরা। ছায়ার মাথাধরা ছাড়ে নি। অসিত ওকে বারণ করল যেতে, বলল: "অসুখ, কাজ কি?" ও বলল জোর ক'রে হেসে: "একটু মাথা ধরা না কি আবার অসুখ!"

গান করতে অনুরোধ করল আনন্দ।

ছায়া বলল: "আমাকে আজ গাইতে বলবেন না?"

আনন্দ অসিতকে জিজ্ঞাসা করল: "শরীর খারাপ?"

অসিত উত্তর দেবার আগেই ছায়া বলল: "না, শরীর বেশ আছে। এমনি—গাইতে আজ তেমন ইচ্ছে করছে না।"

"একটাও গাইবে না?" আনন্দ একটু নিরাশ মতন হ'ল।

ছায়া বলল: "আচ্ছা গাইব। কোন্ গানটা শুনতে চান?"

আনন্দ বলল: "কবি নিশিকান্তের ঐ বাউলটা গাও না: বুঝিস না কি বুঝবি নে রে?"

ছায়া গাইল:

"বুঝিস না কি বুঝবি নে রে?
ওরে পাগল হাটের মেলায়
বেলা যে বিফল গেছে রে!
ফুরায় না তোর বেচাকেনা
বাড়ে শুধুই লেনা দেনা
যা পাস্ রে তোর লাভের কড়ি
লোকসানে তা হারাস নে রে!

আজও মনে পড়ে অসিতের—কী অপরূপ বেজে উঠেছিল ওর কণ্ঠ সেদিন! এমন আশ্চর্য বিষাদ! আজও মনটা ব্যথিয়ে ওঠে ওর ভাবতে। সত্যি কেমন ক'রে এমন মেয়েকে ও ভাবতে পারত নাস্তিক। আজও কানে বাজে ওর সেই লাইন কটির সেই আশ্চর্য মিড়:

কত দিন যে গেল চ'লে…
কত সকাল সন্ধে হ'য়ে
অন্ধকারে পড়ল ঢ'লে!
ক্লান্ত হ'য়ে কত রাতি
ঘুম গেলি তুই নিভিয়ে বাতি
সেই ফাঁকে চোরে করল চুরি
সেই ফাঁকে দোর ভেঙেছে রে!

মনে পড়ে গানের শেষে প্রীতির চোখে জল, আনন্দের চোখে জল, আরও তিন চার জনের চোখে জল। এমন গান ও খুব কমই গেয়েছে। অথচ…কেবল অসিতই জানত কোন্ বেদনার আরোপে এ গানে সেদিন অমন প্রাণ জেগে উঠেছিল।

আজ মনে প্রশ্ন জাগে যেন ফের নতুন ক'রে: সব বেদনারই মূলে কি সেই একই আনন্দ নয়? নৈলে গভীর বেদনার মূলে এ আশ্চর্য আনন্দের রস জোগায় কোত্থেকে!

অথচ তবু অসিতের বুকের মধ্যে যেন সেদিন কী একটা পাষাণ চেপে ছিল। কেন ওকে অমন ব্যথা দিল? প্রত্যাশা থাকা ভালো নয় ব'লে ওকে এ কী দৃষ্টান্ত দিল নিজের জীবন্মুক্ত অবস্থার! ছি! কোন্ অধিকারে ওকে অসিত লেকচার দিতো প্রত্যাশা নিয়ে—নিজের প্রত্যাশা যার এখনো এমন টনটনে!

মনে পড়ে সেদিন রাতে বাড়ি ফিরে যখন ছায়া ওর মশারি খাটিয়ে দিচ্ছিল তখন ও ক্রমাগত কী ভাবে ওর দৃষ্টি এড়িয়ে মশারি গুঁজছিল।

কোনো রাতে এ কাজটির ভার কাউকে দিত না। অসিত জানত ছায়া আজ লুকিয়ে থাকতেই চাইছিল কিন্তু তবু ও দিনান্তে নিজের এ আনন্দময় কর্তব্যটুকু ছাড়তে চায় নি। অসিত তখন বিছানায় শুয়ে।

"ছায়া!"

ছায়া ভালো ক'রে তাকালো না।

"শোন।"

"কী?" ও মুখ ফিরিয়ে মশারি নিয়েই ব্যস্ত।

"মশারি থাক্ কাছে আয়।"

"আজ না অসিদা, লক্ষ্মীটি ভাই। এখুনি শুতে যাব।"

"ঘুম পেয়েছে?"

ছায়া ইচ্ছে করলেই মিথ্যে বলতে পারত, কিন্তু বলল: "না।"

"তবে?"

ছায়া চুপ।

"শোন দিদি। বোস আমার কাছে। লক্ষ্মীটি ভাই! মশারি তুলে দে।"

ছায়া মশারি তুলে না দিয়েই ভিতরে এসে বসল সন্তর্পণে।

"কী হয়েছে বল্ তো? কাছে আসবি না?"

ছায়া প্রশ্নের কোনো উত্তর না দিয়ে সোজা তাকালো ওর চোখের দিকে! চোখে জল টল টল করছে কিন্তু প্রাণপণে সাম্‌লে রইল আর বলল: "অসিদা!"

অসিত ওকে কাছে টানল।

ও শক্ত হ'য়ে ব'সে রইল তবু, বলল: "আর কখনো···কখনো এমন...হবে না ··কথা দিচ্ছি।"

অসিত উঠে ব'সেই ওকে টেনে নিল। "কেমন?" প্রশ্নটা করবারও সময় পেল না: কোলের উপর লুটিয়ে প'ড়ে সে কী কান্না মেয়ের!

*　　*　　*　　*

ছায়ারা থেকে গেল আরো ছয় সাত দিন—যতদিন আনন্দ এলাহাবাদে ছিল। একটিবারও আর বাড়ি ফেরার নাম করে নি। যেখানে গেছে মিষ্টিমুখ ক'রে গেছে। কোনো গানের আসরে বলে নি আর: "গাইতে ইচ্ছে নেই।"

ট্রেনের দুপাশের গাছগুলো ঝাপসা হ'য়ে আরো দীর্ঘ দেখাচ্ছে। একটি দুটি ক'রে তারারা দেখা দিচ্ছে দূর আকাশে! অসিত চেয়ে চেয়ে দেখে।.. এই তারাদের দিকে চেয়েও এক সময়ে ছায়াকে ব'লে ব'লে দিত কোনটা তারা, কোনটা গ্রহ—কার কী নাম কোন তারাটা কত বড় কত দূরে ইত্যাদি! ছায়া অবাক্ হ'য়ে ওর বড় বড় চোখ দুটো আরো বড় ক'রে শুনত তারাদের লীলাখেলার অবিশ্বাস্য কাহিনী।...

মনে পড়ে ওর একটা চিঠি যেটি হাজারিবাগ থেকে কলকাতা ফেরার পরই ছায়া লিখেছিল।

রাজুর মৃত্যুর পরে ওরা যখন হাজারিবাগ যায় তখন অসিত খুব আশা করেছিল ছায়া ওকে ডাক দেবে। দুবেলে রোজই ডাক আসত ও ছায়ার চিঠি খুঁজত সব আগে। যেদিন পেত খুলে তাড়াতাড়ি পড়ত যেতে লিখেছে কি না! হায় রে অভিমান! না ডাকলে কি অসিত যেতে পারত না?

মনে হ'ত ছুটে যায়। কিন্তু কেন ছায়া দুবেলে না এসে গেল হাজারিবাগ? ও যখন এল না তখন অসিতই বা কেন যাবে? প্রত্যাশার মূল কোথায় লুকিয়ে থাকে কোন সূক্ষ্ম রূপ নিয়ে·· ভাবে ও আজও।

একদিন ও অজয়কে কলকাতায় লিখেছিল অনেক পরে—তখন

ছায়ারা হাজারিবাগ থেকে কলকাতায় ফিরে গিয়েছিল—যে ছায়ারা ওকেই ডাকলে ও হাজারিবাগে যেত।

কথাটা ছায়ার কাণে পৌঁছায় যথাসময়ে।

ছায়া তাতেই লিখেছিল চিঠিখানি।

হু হু ক'রে ছুটেছে ট্রেণ।...

আবছা আলোতে বাক্স থেকে বের ক'রে অসিত পড়ে আবার কতদিনের আগে-লেখা চিঠিটি:

"অসিদা ভাই,

ডাকলে তুমি না এসে পারতে না এ আমি জানতাম। লোভও যে হয় নি ডাকতে এমন মিথ্যেই বা উচ্চারণ করব কেমন ক'রে? হাজারিবাগে ছিলাম আমরা একটা বাংলোয়—তার চার দিকে ধূ ধূ করছে মাঠ। কী যে নির্জন কী বলব! মনে আছে—এক সময়ে তুমি কত দুঃখ পেতে নির্জনতার মধ্যে আমি রস পেতাম না ব'লে? তখন সত্যিই পেতাম না—কলকাতার বাইরে দুদিনের বেশি থাকলেও বাড়ির জন্যে মন কেমন করত। কিন্তু মানুষের মন বদলায়—এত বদলায় যে সময়ে সময়ে চেনা যায় না একই মানুষের মন ব'লে, নয়? অন্তত আমি তো চিনতে পারতাম না নিজের মনকে—হাজারিবাগের সেই নিখুঁৎ নির্জনতার মাঝখানে। সত্যি, কলকাতায় ফিরে আসতে ইচ্ছেই হ'ত না—ভাবতে পারো? আর একদিকে কিন্তু মনটি আমার একটুও বদলায় নি—কেবলই মনে হ'ত আহা, যদি এ-নির্জনতার মধ্যে তোমার সঙ্গ পেতাম, গান শুনতাম, তোমার কাছে ঘণ্টার পর ঘণ্টা গান শিখতাম! কিন্তু তবু তোমাকে আসতে লিখি নি কেন এ অনুযোগ আজ কেন, অসিদা? ভুলে গেছ কি সেই একদিনের কথা—এক রাতের—যখন আমি তোমার মশারি খাটাচ্ছিলাম—সেই এলাহাবাদে? কী কথা দিয়েছিলাম মনে আছে?

হয়ত মনে নেই তোমার—কিন্তু আমি সে কথা ভুলব কেমন ক'রে বলো?"

হু হু ক'রে ট্রেণ ছুটেছে।...

চিঠিটা আর পড়া যায় না। অসিত চেয়ে দেখে জানালা দিয়ে বাইরের চাঁদের চারিদিকে একটি নীলাভ মণ্ডল।...

সত্যি, ঐ একটিবারই ও দাবি করেছিল। আর কখনো করে নি—ভুলেও। কথা দিলে ও জানত কথা রাখতে।

প্রথম খণ্ড সমাপ্ত

দ্বিজেন্দ্রলাল রায় প্রণীত

১। দুর্গাদাস (মিনার্ভায় অভিনীত) ২৲
২। তারাবাই (মিনার্ভা, ক্লাসিক ও ইউনিকে অভিনীত) ১৲
৩। নুরজাহান (মিনার্ভায় অভিনীত) ১৲
৪। মেবার পতন (মিনার্ভা ও ষ্টারে অভিনীত) ১৷০
৫। সাজাহান (মিনার্ভা, ষ্টার, মনোমোহন ও নাট্যমন্দিরে অভিনীত) ১৷০
৬। বিরহ (নাটিকা) (ষ্টারে অভিনীত) ৷০
৭। প্রায়শ্চিত্ত (প্রহসন) (ক্লাসিকে অভিনীত) ৷০
৮। পাষাণী (গীতি নাটিকা) (নাট্যমন্দিরে অভিনীত) ৸০
৯। কল্কি অবতার (প্রহসন) ৷০
১০। সোরাব-রুস্তম (নাট্য রঙ্গ) (মিনার্ভায় অভিনীত) ৷০
১১। সীতা (নাট্যকাব্য) (নাট্যমন্দিরে ও মনোমোহনে অভিনীত) ১৲
১২। মন্দ্র ও ত্রিবেণী (কবিতা) ১৷০
১৩। আলেখ্য (কবিতা) ১৲
১৪। আষাঢ়ে (হাস্য কবিতা) ৷০
১৫। হাসির গান ১৲
১৬। একঘরে (বিলাতফের্ত্তাদের একঘরে করা বিষয়ে মতামত) ।০
১৭। চন্দ্রগুপ্ত (মিনার্ভা, মনোমোহন, ষ্টার ও নাট্যমন্দিরে অভিনীত) ১৷০
১৮। পুনর্জ্জন্ম (প্রহসন) (ঐ ঐ অভিনীত) ৷০
১৯। পরপারে (ষ্টারে অভিনীত) ১৷০
২০। ভীষ্ম (নাটক) ১৷০
২১। ত্র্যহস্পর্শ (প্রহসন) ।৵০
২২। ত্রিবেণী (কবিতা) ১৲
২৩। কালিদাস ও ভবভূতি (সমালোচনা) ১৲
২৪। গান ২৲
২৫। সিংহল বিজয় (মিনার্ভায় অভিনীত) ১৷০
২৬। বঙ্গনারী (ঐ) ১৲
২৭। রাণাপ্রতাপ (ষ্টার ও মিনার্ভায় অভিনীত) ১৷

হাসির গানের স্বরলিপি— শ্রীদিলীপকুমার রায় ২৲
দ্বিজেন্দ্র-গীতি স্বরলিপি—প্রথম খণ্ড ১৷০ দ্বিতীয় খণ্ড „ ১৷

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, ২০৩।১।১ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা

দিলীপকুমারের অন্যান্য বই

তীর্থঙ্কর (দ্বিতীয় সংস্করণ)
শ্রীঅরবিন্দ প্রসঙ্গে
প্রতিদিনের তীরে (কবিতা)
সাদা কালো (ছায়াচিত্র নাটক)
এদেশে ওদেশে (প্রবন্ধ)
অনামী (দ্বিতীয় সংস্করণ)
মনের পরশ (উপন্যাস)
দোলা (উপন্যাস)
তরঙ্গ রোধিবে কে (উপন্যাস)
বহুবল্লভ ও দুধারা (উপন্যাস)
আপদ (নাটক)
ভূস্বর্গ চঞ্চল (ভ্রমণ)
রঙের পরশ (উপন্যাস)
গীতশ্রী (স্বরলিপি)
সুরগীতিমঞ্জরী
সূর্য্যমুখী (কবিতা)
ভ্রাম্যমানের দিনপঞ্জিকা (গানের কথা)
সাঙ্গীতিকী (গানের ইতিহাস)
ছান্দসিকী (ছন্দের আলোচনা)
উদাসী দ্বিজেন্দ্রলাল (স্মৃতিকথা)
আশ্চর্য (উপন্যাস)
নানারূপী (উপন্যাস)
THE DELIVERENCE
(শরৎচন্দ্রের "নিষ্কৃতির" অনুবাদ)
AMONG THE GREAT
("তীর্থঙ্করের" ইংরাজী সংস্করণ)